



শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২



প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৫৭

দ্বিতীয় সংস্করণ—চৈত্র, ১৩৬১

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স,

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদপট-শিল্পী

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর—শ্রীমুরারিমোহন কুমার

শতাব্দী প্রেস লিমিটেড,

৮০, লোয়ার সার্কুলার রোড,

কলিকাতা—১৪

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ

ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

সাড়ে চার টাকা

তোমাদের উদ্দেশে—

যারা বুঝবে তোমাদের বিদ্বেষে, তোমাদের ভ্রান্তিতে
সৃষ্টির সঙ্কট,
আর সেইজন্যই যারা ক্ষমার তপস্যাকে
নেবে বরণ করে।



এই লেখকের অন্যান্য বই :

নীলাঙ্গুরীয় (৭ম সং)

নব-সন্ন্যাস (২য় নং)

উত্তরায়ণ (২য় সং)

দুয়ার হতে অদূরে (২য় সং)

কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি (২য় সং)

হাতে খড়ি

রূপান্তর (২য় সং)

অতঃকিম (২য় সং)

শ্রেষ্ঠ গল্প (৩য় সং)

হাসি ও অশ্রু

বরযাত্রী

বাসর

স্বর্গাদপি গরীয়সী ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড



১

ঘড়িতে টং টং করিয়া এগারোটা বাজিতেই কুমার উঠিয়া বসিল, নূতন করিয়া যেন আবিষ্কার করিল রাত অনেক হইয়াছে। অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করিবার নাই। সকালেই সে সব জায়গায় টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছে। হাসপাতালের ডাক্তারবাবু আসিয়া দুইবার দেখিয়া গিয়াছেন। সে পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠনগুলিতেও তেল-ভরাইয়া রাখিয়াছে যদি দরকার হয়। শান্তা, মধু, ল্যাংড়া, বোধিয়া এই চারিজন বলিষ্ঠ ভৃত্যকে বাড়ি যাইতে দেয় নাই, তাহারা রাত্রে এখানেই খাইবে এবং থাকিবে। তাছাড়া গঙ্গা তো আছেই। উর্মিলা সকাল হইতে বাবার মাথার শিয়রে বসিয়া আছে। মাঝে শুধু একবার উঠিয়া গিয়া খাইয়া আসিয়াছে। সবই ঠিক আছে, এখানে যাহা করিবার সে করিয়াছে। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করিবার নাই। একবার সে উৎকর্ণ হইয়া স্টেশনের দিকে চাহিল। গাড়ির শব্দ কি? না, হাওয়া। একটা ঝোড়ো হাওয়া উঠিয়াছে। কুমারের মনে হইল একটা ভালো বই পাইলে রাত জাগিবার সুবিধা হইত। যে নূতন বইটা সে স্টেশন হইতে কিনিয়া আনিয়াছিল তাহা ডাক্তারবাবু লইয়া গিয়াছেন। পুরাতন কোন বইয়ের সন্ধানে সে সন্তর্পণে পাশের ঘরে ঢুকিল। হঠাৎ চোখে পড়িল বাবার আলমারির চাবিটা দেওয়ালে টাঙানো রহিয়াছে। চাবিটা লইয়া সে বাবার আলমারিটাই খুলিল। বাবার আলমারিতে অনেক পুরাতন বই আছে। বাবা নিজের আলমারি কাহাকেও খুলিতে দিতেন না। আলমারিটা খুলিয়া কুমার কয়েক মুহূর্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, মনে হইল বাবা যাহা পছন্দ করেন না তাহা করা উচিত হইবে কি? কিন্তু এ সঙ্কোচভাব কাটিয়া যাইতে বেশী

বিলম্ব হইল না, মনে হইল বই পড়িব তাহাতে দোষ কি, নষ্ট না করিলেই হইল। টর্চের সাহায্যে সে বইগুলি কৌতূহলভরে দেখিতে লাগিল। প্রত্যেকটি বই সযত্ন রক্ষিত, মলাট দেওয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রত্যেক বইটিতে বাবার নাম লেখা। কোন তারিখে কেনা হইয়াছিল তাহাও লেখা আছে। কুমার গীতা, রামায়ণ, দাশরথী রায়ের পাঁচালি, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ (যাহা বহুকাল পূর্বে এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হইত), দামোদর গ্রন্থাবলী, গ্যারিবল্‌ডির জীবনচরিত, ফলের বাগান, পশু-পালন প্রভৃতি বইগুলি খুলিয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল। মনোমত একটা বইও নজরে পড়িল না। হঠাৎ এককোণে একটা মোটা খাতা দেখিতে পাইল সে। খাতাটা খুলিয়া দেখিল প্রথম পাতাতেই লেখা—‘স্মৃতিকথা’। উলটাইয়া উলটাইয়া দেখিল বাবারই হস্তাক্ষর। কৌতূহল সহকারে পড়িতে লাগিল।

“আমার জীবন-চরিতে লিখিবার মতো কি-ই বা আছে। আমি অতি সাধারণ মানুষ, দরিদ্রের ঘরেই জন্ম। সারাজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর যুদ্ধ করিয়া মধ্যবিত্ত সমাজে স্থান পাইয়াছি। ইহার বেশী আর কোন কৃতিত্বের দাবী আমার নাই। ইহাও জানি যতটুকু করিয়াছি তাহাও ভগবানের দয়ায়। ভগবান আমার উপর দয়া করিয়াছিলেন এ গর্বটুকু অবশ্য আমি করিতে পারি। আর একটা গর্বও আমার আছে। যে সব মহাপুরুষ বাঙালী জাতির এবং ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, যাঁহারা সমগ্র মানবজাতিরই অলঙ্কার স্বরূপ, স্বাধীনদেশে জন্মগ্রহণ করিলে যাঁহাদের নাম কাব্যে, ইতিহাসে বহুভাবে বহুবার কীর্তিত হইত, আমি তাঁহাদের সম-সাময়িক। তাঁহাদের তুলনায় যদিও আমি নিতান্ত নগণ্য, তবু এই গর্বটুকু আমার আছে যে তাঁহাদের অনেককে আমি দেখিয়াছি, অনেকের কথা শুনিয়াছি।

আমার এ জীবন-চরিত আমি লিখিতাম না। আগাগোড়া জীবনের সব কথা লেখা সম্ভবও নহে। যাহা লিখিতেছি তাহা সামান্য স্মৃতিকথা মাত্র। শৈশবের ঘটনা কিছুই আমার মনে নাই। বড় হইয়া মাতামহীর মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছি তাহাই লিখিতেছি। কিন্তু ইহাও আমি লিখিতাম না, আমার বড় ছেলের অনুরোধে লিখিতেছি। সেই আমাকে এই খাতাখানা কিনিয়া দিয়া গিয়াছে। আমার হাতেও এখন প্রচুর সময়, চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ছাড়া আর কোনও কাজ নাই। তাই অনেকটা সময় কাটাইবার জন্যও নিজের জীবনকথা নিজেই লিপিবদ্ধ করিতেছি। বলা বাহুল্য, অতিশয় সসঙ্কোচেই করিতেছি। ভরসা আছে ইহা বৃহত্তর পাঠক-গোষ্ঠির নয়নগোচর হইবে না, আমার সন্ততিদের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিবে···”

ঊর্মিলা নিঃশব্দপদসঞ্চারে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, কুমার টের পায় নাই। তাহার কথা শুনিয়া চমকাইয়া উঠিল।

“বাবার গলাটা ঘড় ঘড় করছে। তুমি মাথাটা একটু ঠিক করে' দিয়ে যাও। মাথাটা বালিশ থেকে নেমে গেছে একটু”

খাতাটা বাহিরে রাখিয়া কুমার সন্তর্পণে আলমারিটা বন্ধ করিয়া দিল। বাবার মাথাটা সত্যই বালিশ হইতে নামিয়া পড়িয়াছিল। দুইজনে মিলিয়া ঠিক করিয়া দিল।

সূর্যসুন্দর আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। নাড়ানাড়িতে আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া গেল! প্রশ্ন করিলেন, “কে বিরু”

“আমি কুমার। দাদা এখনও আসে নি”

“উশনা?”

সবাইকে খবর দিয়েছি। এই ট্রেনেই হয় তো আসবে”

“হরিবোল, হরিবোল”

সূর্যসুন্দর ধীরে ধীরে আবার চোখ বুজিলেন। ঊর্মিলা আবার

মাথার শিয়রে বসিয়া হাওয়া করিতে লাগিল। গঙ্গা নীরবে বসিয়া পা টিপিতেছিল। কুমার ইঙ্গিতে তাহাকে ডাকিয়া পাশের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

"কি বলছ"

"স্টেশনে তুটো গাড়ি পাঠিয়েছিস তো ?"

"হ্যাঁ। চারজন চাকরও গেছে"

"খেয়েচিস"

"আমার খাবার ইচ্ছে নেই"

"ইচ্ছে না থাকলেও খেতে হবে তো কিছু। তখন আমি হালুয়াটা খাই নি, ওঘরে কোণে ঢাকা দেওয়া আছে, সেইটে খেয়ে নে—"

গঙ্গা কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। হালুয়ার খোঁজে গেল না, পুনরায় সূর্যসুন্দরের পদসেবা করিতে লাগিল।

গঙ্গার সহিত ইহাদের রক্তের সম্পর্ক নাই। গঙ্গা বিহারী বৈশ্য। গঙ্গার বাবা হরিচাঁদ বহুকাল পূর্বে সূর্যসুন্দরের চাকর ছিল। গঙ্গা যখন দশ বছরের বালক তখন সে-ও একবছরের শিশু কুমারের বাহন ছিল। সেজন্য অনেকে তাহাকে ঠাট্টা করিয়া 'ময়ুর' বলিত। গঙ্গা এখন ব্যবসায় করে, অর্থাভাব নাই, তাহার ছেলে আই. এ. পাস করিয়াছে কিন্তু এখনও সে নিজেকে এ বাড়ির চাকর বলিয়াই পরিচয় দেয়। এখন সে কুমারের নির্ভরযোগ্য বন্ধু ; দক্ষিণ হস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গঙ্গার পিছু পিছু কুমার আবার আসিয়া বাবার ঘরে ঢুকিল।

"খেলি না ?"

"বললাম তো খাবার ইচ্ছে নেই"

তাহলে পশ্চিম দিকের বারান্দায় গিয়ে একটু শুয়ে পড়। মধুকে না হয় পা টিপতে বসিয়ে দে"

"দেখি"

গঙ্গা উঠিল না। কুমার তাহার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পর পাশের ঘরে চলিয়া গেল। কোণে টেবিলের ধারে একটা ক্যাম্পচেয়ার ছিল তাহারই উপর বসিয়া পড়িল সে। টেবিলের উপর যে বাতিটা কমানো ছিল তাহা বাড়াইয়া দিয়া জীর্ণ খাতাটি খুলিয়া পুনরায় পড়িতে আরম্ভ করিল।

"বাংলা ১২৭২ সালে পয়লা বৈশাখ মাতুলালয়ে আমার জন্ম হয়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া আমার মাতামহী আমার নাম রাখিয়াছিলেন সূর্যসুন্দর। মাতামহীর সংস্কৃতে বেশ দখল ছিল, মাতামহ ছিলেন টোলের ন্যায়রত্ন। মাতামহীকে তিনি যখন বিবাহ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার বয়স ছিল দশবৎসর মাত্র। মাতামহীর ছিল চার। বিবাহ করা সত্ত্বেও তাঁহাদের পড়াশোনা বিঘ্নিত হয় নাই। এখন এসব গল্পের মতো শোনায় কিন্তু তখন ইহাই প্রচলিত নিয়ম ছিল। আমার মাতামহ আমার মায়ের নাম রাখিয়াছিলেন বারাহী এবং মামার নাম শক্তিনারায়ণ। আমার মাতুলবংশ শাক্ত ছিলেন। বারাহী নামের অর্থ কি তাহা আমি অনেকদিন জানিতাম না। পরে জানিয়াছি ইহা দুর্গার নাম। পঞ্চসাগরে যে পীঠস্থান আছে তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বারাহী। আমার পিতার নাম কেদারনাথ; আমার পিতার বিবাহ সম্বন্ধে একটি কৌতুকজনক গল্প মাতামহীর মুখে শুনিয়াছিলাম। গ্রামের জমিদার তাঁহার পৌত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে নানা স্থান হইতে বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদদের আহ্বান করেন। সেই সময় নিমন্ত্রিত হইয়া আমার পিতাও আসিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে বিখ্যাত একজন সেতারীর আসিবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়াতে নিজে আসিতে পারেন নাই,

তাঁহার প্রিয় শিষ্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমার পিতাই সেই শিষ্য। তাঁহার বয়স তখন কুড়ি বছর। দীর্ঘকান্তি গৌরবর্ণ ছিল তাঁহার। সত্যই রূপবান পুরুষ ছিলেন তিনি। জনতার মধ্যেও তাঁহার চেহারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাঁহার রূপ দেখিয়া এবং বাজনা শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেল। লোকটির পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইল অনেকে। কেহ কেহ গিয়া তাঁহাকে প্রশ্নও করিল। খবরটা মাতামহীর কর্ণগোচর হইতেও বিলম্ব হইল না। মাতামহী যখন শুনিলেন যে তিনি রাঢ়ীশ্রেণীর মুখোপাধ্যায় বংশের, তখন তাঁহার মনে হইল যে সমস্যায় তিনি পীড়িত হইতেছেন মা মঙ্গলচণ্ডী তাহার সমাধান বুঝি করিয়া দিলেন। কন্যা বারাহীর বিবাহের জন্য তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, মনোমত সৎপাত্র কোথাও মিলিতেছিল না, সুন্দর, সুগায়ক, পণ্ডিতবংশের কেদার-নাথকে দেখিয়া তাঁহাকে জামাই করিবার জন্য তিনি মনে মনে ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। অরক্ষণীয়া কন্যা লইয়া তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছিলেন, মায়ের বয়স বারো পার হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কে আগাইয়া গিয়া সম্বন্ধ করিবে? কিছুকাল পূর্বে আমার মাতামহ মারা গিয়াছিলেন, আমার মামার বয়স তখন আট বৎসর মাত্র। আট বৎসরের বালকই শেষে অভিভাবকের কাজ করিল। সেই গিয়া তরুণ সেতারী কেদারনাথকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসিল। দিদিমা নানারকম রান্না করিয়াছিলেন, কিশোরী কন্যা বারাহী সেগুলি পরিবেশন করিল। কথায় কথায় দিদিমা জানিতে পারিলেন যে বাবারও কোনও অভিভাবক নাই। তিনি বাল্যেই পিতৃমাতৃহীন হইয়াছেন! অর্থাৎ বিবাহ ব্যাপারে আর কাহারও অনুমতি বা মতামত লইবার প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে তিনি নিজে যাহা স্থির করিবেন তাহাই হইবে। সুতরাং আহারাদির পর দিদিমা সসঙ্কোচে তাঁহারই নিকট বিবাহের প্রস্তাবটি করিলেন।

বাবা না কি হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "আমার তো একটি বিয়ে হয়ে গেছে। দ্বিতীয়বার বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই"

দিদিমা আকাশ হইতে পড়িলেন।

"বিয়ে হ'য়ে গেছে! কোথায়?"

"আমার সেতারের সঙ্গে"

সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

বাবা বলিলেন, "হাসির কথা হ'তে পারে, কিন্তু মিছে কথা নয়। সেতার নিয়েই দিনরাত থাকি। অন্যদিকে মন দিতে পারি না। রোজকার তো কিচ্ছু নেই।"

দিদিমা ইহাতে দমিলেন না। বলিলেন, "সেজন্য তোমাকে ভাবতে হবে না বাবা। টাকার ভাবনা আমরা ভাবব। আমার কন্যাদায়টি তুমি উদ্ধার করে' দাও"

"কিন্তু পরিবার পালন করবার সামর্থ্য যে আমার নেই"

"পরিবার তোমাকে পালন করতে হবে না, সে ভার আমি নিচ্ছি"

বাবা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ঘরজামাই হ'য়ে থাকাও আমার পোষাবে না। আমি গানের আসরে আসরে ঘুরে বেড়াই। আজ কাশী, কাল মুঙ্গের, পরশু লখনউ—"

"বেশ তো তাতেও আমার আপত্তি নেই। তোমার যখন যেখানে খুশী যেও"

"ছেলেমেয়ে হলে আপনারাই তাদের ভার নেবেন?"

"নেব"

বাবা ক্ষণকাল গম্ভীর থাকিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "আমার মতো ভব-ঘুরেকে আপনি জামাই করতে চাইছেন কেন"

"তুমি বড় বংশের ছেলে বলে'। অধ্যাপকের বংশধর তুমি। এ রকম বংশ আর কোথায় পাব। আমার কন্যাদায়, বড় বিপদে পড়েছি বাবা। মনে হচ্ছে ভগবানের দয়াতেই তোমার মতো

সৎপাত্রের সন্ধান পেয়েছি। আমাকে দায় থেকে উদ্ধার কর তুমি বাবা—"

"আমি সংসারের কোন ভার নিতে পারব না, এ শুনেও আপনার বিয়ে দিতে আপত্তি নেই ?"

"কিছুমাত্র না"

"বেশ, তাহলে আয়োজন করুন।"

কিছুদিন পরেই বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পরই কিন্তু বাবা নিরুদ্দিষ্ট হইলেন। বছরখানেক পরে আবার ফিরিয়া আসিলেন, সপ্তাহখানেক থাকিয়া আবার চলিয়া গেলেন। এইরূপে মাঝে মাঝে তিনি আসিতেন, আবার উধাও হইয়া যাইতেন। তাঁহাকে কেহ কিছু বলিতে সাহস করিত না, কারণ এই সর্তেই তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। এইভাবেই কিছুদিন চলিল।

আমার মাতুল গ্রামের পাঠশালাতেই বাংলা পড়াশোনা করিয়াছিলেন। তখন গ্রামে ইংরেজি পড়াশোনার তত সুবিধা ছিল না। কেহ ইংরেজি পড়িতে চাহিলে তাহাকে কলিকাতা যাইতে হইত। মামার অর্থাভাব, কলিকাতায় যাইবার সঙ্গতি ছিল না। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা এককালে খুব বর্ধিষ্ণু ছিলেন, কিন্তু চঞ্চলা লক্ষ্মী কোথাও অচলা হইয়া থাকেন না। ইংরেজি শাসন বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সকলেই প্রায় দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরিবারে লোকসংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছিল, বিষয়সম্পত্তি বহুভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কলিকাতায় গিয়া ইংরেজি শিখিয়া চাকরি বা ইংরেজের অধীনে ব্যবসা করাই তখন অর্থোপার্জনের উপায় ছিল। গ্রামে যাহাদেরই সঙ্গতি ছিল তাহারাই কলিকাতার সহিত নিজেকে কোন না কোন ভাবে যুক্ত করিয়াছিলেন। মামার সে সঙ্গতি ছিল না। আর একটা বাধাও ছিল, সেটা আর্থিক নয়, মানসিক। তখন অনেক হিন্দুসন্তান খৃষ্টান বা ব্রাহ্ম হইয়া যাইতেছিল।

মাতামহীর ভয় ছিল ছেলে কলিকাতায় গেলে হয় খৃষ্টান, না হয় ব্রাহ্ম হইয়া যাইবে। গ্রামের মধ্যেই উদাহরণও ছিল। ছুলে পাড়ার একটি ছেলে কলিকাতায় গিয়া খৃষ্টান হইয়া এক নীচজাতীয়া খৃষ্টানীকে বিবাহ করিয়া আনে। গ্রামের লোকেরা তাহাকে কুকুরের মতো তাড়াইয়া দিয়াছিল। সুতরাং মামার কলিকাতা যাওয়া হয় নাই। তিনি বাংলা লেখাপড়া গ্রামে বসিয়াই করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি নিকটবর্তী হিজলী গ্রামের শ্রীনাথ ডাক্তারের অধীনে থাকিয়া ডাক্তারি শিখিতে লাগিলেন। শ্রীনাথ ডাক্তার দিদিমার দূর সম্পর্কের আত্মীয় হইতেন। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তারি পাস করেন, ইচ্ছা করিলে শহরে খুব বড় চাকরি করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি গ্রামের মায়া কাটাইতে পারেন নাই। গ্রামেই প্র্যাকটিস করিতেন। তাঁহার মধ্যে তৎকালসুলভ সাহেবিয়ানাও কিছু ছিল না, গলাবন্ধ কোট এবং ধুতি, এই ছিল তাঁহার পোষাক। সাহেবিয়ানার মধ্যে ছিল দাড়িটি, সূচ্যগ্র ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। তাঁহার খুব পশার ছিল। দশটা বারোটা গ্রাম জুড়িয়া তিনি প্র্যাকটিস করিতেন। যান ছিল পাল্‌কি এবং ঘোড়া। পাঠশালার পড়া শেষ করিয়া মামা তাঁহারই অধীনে কম্পাউণ্ডরি করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বাংলা পুস্তকের সহায়তায় ডাক্তারি বিদ্যাটা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি প্রায় বছর দশেক তিনি তাঁহার অধীনে ছিলেন। এই দশবৎসরে তিনি ডাক্তারি বিদ্যাটা যে ভালোভাবেই আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ তাঁহার পরবর্তী জীবন। তাঁহার ভারাক্রান্ত নিমজ্জমান সংসার-তরণীটিকে তিনি টানিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন এই ডাক্তারির প্রভাবেই। শুধু যে টানিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা নয়, কিছুদিনের জন্য তাহাকে ময়ুরপংখীর মর্যাদাও দিয়াছিলেন। দোল, দুর্গোৎসব, শিব-প্রতিষ্ঠা, নিয়মিত ব্রাহ্মণ-অতিথিসেবা, কিছুই তিনি বাদ দেন নাই। ভাগ্যান্বেষণের জন্য

কিন্তু তাঁহাকে গ্রাম ছাড়িতে হইয়াছিল। ডাক্তারি করিয়া অর্থোপার্জন করিতে হইলে গ্রাম না ছাড়িয়া উপায় ছিল না। গ্রামের সকলেই চেনা-শোনা বা আত্মীয়, কাহার নিকট হইতে পয়সা লইবেন? কিন্তু দিদিমা তাঁহাকে কলিকাতা যাইতে দেন নাই। দিদিমার এক মাস্‌তুতো বোনের বিবাহ হইয়াছিল গুস্‌করায়। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া মামা গুস্‌করায় গেলেন। মাসীমার বাড়িতে রহিলেন, তাহার পর ক্রমশ যখন প্র্যাকটিস জমিয়া উঠিল তখন আলাদা বাসা করিলেন। আলাদা বাসা করিয়াও তিনি পরিবার লইয়া যান নাই। সেকালে সহসা বিদেশে পরিবার লইয়া যাওয়ার রেওয়াজ ছিল না। পরিবার গ্রামেই থাকিত, উপার্জ্জনক্ষম পুরুষ বিদেশ হইতে মাসে মাসে বাড়িতে টাকা পাঠাইতেন, তাহার পর ছুটি পাইলে বা কোনও পর্ব উপলক্ষে, বিশেষ করিয়া পূজার সময়, তুই চারিদিনের জন্য গ্রামে আসিয়া কিছুদিনের জন্য পারিবারিক সুখভোগ করিয়া যাইতেন। ইহাই নিয়ম ছিল। মামাও এ নিয়ম পালন করিয়াছিলেন। অবশ্য, তখনও তাঁহার বিবাহ হয় নাই। তাঁহার দিদি (অর্থাৎ আমার মা), তুইটি খুড়তুতো ভাই এবং তাঁহার নিজের মা এই লইয়াই তাঁহার সংসার ছিল। এই সংসারের ভরণপোষণের জন্য তিনি মাসে পঁচিশটি করিয়া টাকা পাঠাইতেন শুনিয়াছি। গ্রামে কিছু ধানের জমি ছিল, পুকুরের অংশ ছিল, ঘরে গাই ছিল। সুখে স্বচ্ছন্দেই সংসার চলিয়া যাইত। গুস্‌করায় থাকিতে থাকিতেই মামার বিবাহ হয়। সেকালে বিবাহের সম্বন্ধ করিতেন ঘটকেরা। তাঁহাদের কাছেই দেশের সম্ভ্রান্ত পরিবারদের সমস্ত সংবাদ সংগৃহীত থাকিত। সেকালের প্রচলিত নিয়ম-অনুসারে মামার বহু পূর্বেই বিবাহ হইয়া যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বাল্যে পিতৃহীন হইয়া পড়াতে তাহা আর সম্ভবপর হয় নাই। মামাও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যতদিন সংসারের অবস্থা সচ্ছল না হয় ততদিন তিনি বিবাহ করিবেন না। গ্রামের পাঠশালায় বাংলা

লেখাপড়া শেষ করিবামাত্রই তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছিল। শ্রীনাথ ডাক্তারও মামাকে উপার্জনক্ষম না হইয়া বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব তখন সমাজের উপর ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের নবমন্ত্রে নব্য বাঙালী তখন সবে দীক্ষা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মামাও সে প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই, পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন। গুসকরায় যখন তাঁহার কিছু কিছু রোজকার হইতে লাগিল, তখন কিন্তু আমার দিদিমা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, পরিচিত শিবু ঘটকের শরণাপন্ন হইলেন। শিবু ঘটক তিনটি পাত্রীর সন্ধান দিয়াছিলেন। দিদিমা যাঁহাকে পছন্দ করিলেন তিনি রূপে অসামান্যা ছিলেন না। তাঁহার বংশ-মর্যাদাও খুব বড় ছিল না। সাধারণ ভদ্রগৃহস্থ ঘরের কন্যা ছিলেন তিনি। দিদিমা তাঁহাকে পছন্দ করিয়াছিলেন সুলক্ষণের জন্য। গ্রামের পুরোহিত ভূতনাথ ভট্টাচার্য কন্যা দেখিতে গিয়াছিলেন। কন্যার কপাল, চুলের ডগা, পায়ের নখ, পায়ের পাতা, হস্তরেখা, গমনভঙ্গী, দাঁতের গড়ন, অঙ্গসৌষ্ঠব প্রভৃতি দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, মেয়েটি সৌভাগ্যবতী হইবে। শুনিয়াছি বরাভরণ ছাড়া মামাকে নগদ একান্ন টাকা বরপণ দেওয়া হইয়াছিল। ঘর করিতে আসিবার সময় বধূ একটি দুগ্ধবতী কৃষ্ণা গাভী এবং একটা চরকা আনিয়াছিলেন। মামার মাছ ধরার সখ ছিল বলিয়া একটি বিলাতী হুইল-সমন্বিত ভালো ছিপও তাঁহাকে তাঁহার শ্বশুর মহাশয় উপহার দেন। শোনা যায় এই ছিপ দিয়া মামা নাকি বহু বড় বড় রুইকাৎলাকে গাঁথিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ভট্টাচার্য মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হয় নাই। বিবাহ করিবার কিছুদিন পরেই মামার ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইয়াছিলেন। বিবাহের পর মামা গুসকরায় বেশীদিন থাকতে পারেন নাই। যে শিবু ঘটক তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন সেই শিবু ঘটকই তাঁহাকে

কিন্তু তাঁহাকে গ্রাম ছাড়িতে হইয়াছিল। ডাক্তারি করিয়া অর্থোপার্জন করিতে হইলে গ্রাম না ছাড়িয়া উপায় ছিল না। গ্রামের সকলেই চেনা-শোনা বা আত্মীয়, কাহার নিকট হইতে পয়সা লইবেন? কিন্তু দিদিমা তাঁহাকে কলিকাতা যাইতে দেন নাই। দিদিমার এক মাস্‌তুতো বোনের বিবাহ হইয়াছিল গুস্‌করায়। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া মামা গুস্‌করায় গেলেন। মাসীমার বাড়িতে রহিলেন, তাহার পর ক্রমশ যখন প্র্যাকটিস জমিয়া উঠিল তখন আলাদা বাসা করিলেন। আলাদা বাসা করিয়াও তিনি পরিবার লইয়া যান নাই। সেকালে সহসা বিদেশে পরিবার লইয়া যাওয়ার রেওয়াজ ছিল না। পরিবার গ্রামেই থাকিত, উপার্জ্জনক্ষম পুরুষ বিদেশ হইতে মাসে মাসে বাড়িতে টাকা পাঠাইতেন, তাহার পর ছুটি পাইলে বা কোনও পর্ব উপলক্ষে, বিশেষ করিয়া পূজার সময়, দুই চারিদিনের জন্য গ্রামে আসিয়া কিছুদিনের জন্য পারিবারিক সুখভোগ করিয়া যাইতেন। ইহাই নিয়ম ছিল। মামাও এ নিয়ম পালন করিয়াছিলেন। অবশ্য, তখনও তাঁহার বিবাহ হয় নাই। তাঁহার দিদি (অর্থাৎ আমার মা), দুইটি খুড়তুতো ভাই এবং তাঁহার নিজের মা এই লইয়াই তাঁহার সংসার ছিল। এই সংসারের ভরণপোষণের জন্য তিনি মাসে পঁচিশটি করিয়া টাকা পাঠাইতেন শুনিয়াছি। গ্রামে কিছু ধানের জমি ছিল, পুকুরের অংশ ছিল, ঘরে গাই ছিল। সুখে স্বচ্ছন্দেই সংসার চলিয়া যাইত। গুস্‌করায় থাকিতে থাকিতেই মামার বিবাহ হয়। সেকালে বিবাহের সম্বন্ধ করিতেন ঘটকেরা। তাঁহাদের কাছেই দেশের সম্ভ্রান্ত পরিবারদের সমস্ত সংবাদ সংগৃহীত থাকিত। সেকালের প্রচলিত নিয়ম-অনুসারে মামার বহু পূর্বেই বিবাহ হইয়া যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বাল্যে পিতৃহীন হইয়া পড়াতে তাহা আর সম্ভবপর হয় নাই। মামাও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যতদিন সংসারের অবস্থা সচ্ছল না হয় ততদিন তিনি বিবাহ করিবেন না। গ্রামের পাঠশালায় বাংলা

লেখাপড়া শেষ করিবামাত্রই তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছিল। শ্রীনাথ ডাক্তারও মামাকে উপার্জনক্ষম না হইয়া বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব তখন সমাজের উপর ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের নবমন্ত্রে নব্য বাঙালী তখন সবে দীক্ষা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মামাও সে প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই, পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন। গুসকরায় যখন তাঁহার কিছু কিছু রোজকার হইতে লাগিল, তখন কিন্তু আমার দিদিমা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, পরিচিত শিবু ঘটকের শরণাপন্ন হইলেন। শিবু ঘটক তিনটি পাত্রীর সন্ধান দিয়াছিলেন। দিদিমা যাঁহাকে পছন্দ করিলেন তিনি রূপে অসামান্যা ছিলেন না। তাঁহার বংশ-মর্যাদাও খুব বড় ছিল না। সাধারণ ভদ্রগৃহস্থ ঘরের কন্যা ছিলেন তিনি। দিদিমা তাঁহাকে পছন্দ করিয়াছিলেন সুলক্ষণের জন্য। গ্রামের পুরোহিত ভূতনাথ ভট্টাচার্য কন্যা দেখিতে গিয়াছিলেন। কন্যার কপাল, চুলের ডগা, পায়ের নখ, পায়ের পাতা, হস্তরেখা, গমনভঙ্গী, দাঁতের গড়ন, অঙ্গসৌষ্ঠব প্রভৃতি দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, মেয়েটি সৌভাগ্যবতী হইবে। শুনিয়াছি বরাভরণ ছাড়া মামাকে নগদ একান্ন টাকা বরপণ দেওয়া হইয়াছিল। ঘর করিতে আসিবার সময় বধূ একটি দুগ্ধবতী কৃষ্ণা গাভী এবং একটা চরকা আনিয়াছিলেন। মামার মাছ ধরার সখ ছিল বলিয়া একটি বিলাতী হুইল-সমন্বিত ভালো ছিপও তাঁহাকে তাঁহার শ্বশুর মহাশয় উপহার দেন। শোনা যায় এই ছিপ দিয়া মামা নাকি বহু বড় বড় রুইকাৎলাকে গাঁথিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ভট্টাচার্য মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হয় নাই। বিবাহ করিবার কিছুদিন পরেই মামার ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইয়াছিলেন। বিবাহের পর মামা গুসকরায় বেশীদিন থাকতে পারেন নাই। যে শিবু ঘটক তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন সেই শিবু ঘটকই তাঁহাকে

পরামর্শ দিলেন—ডাক্তারি ব্যবসায়ের পক্ষে গুসকরা অপেক্ষা সাহেবগঞ্জ প্রশস্ততর ক্ষেত্র। সেখানে অনেক ধনী মাড়োয়ারী আছে, অনেক বাঙালীর বাস, শহরটিও গঙ্গার তীরে, গঙ্গার, দুই পারে বহু বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ডাক্তার হিসাবে এখানে প্রতিষ্ঠালাভ করিলে আয়ের বিপুল সম্ভাবনা। মামার গুস্‌করায় প্র্যাকটিস কিছুটা জমিয়া উঠিয়াছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া প্রথমে সহসা তিনি আসিতে রাজী হন নাই। কিছুদিন পরে যোগাযোগটা অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটিল। নামজাদা সিনেমার ছবি এখন যেমন যুবকযুবতীদের লোলুপ করিয়া তোলে, তখন নামজাদা যাত্রার দল তেমনি সকলকে লোলুপ করিয়া তুলিত। মতি রায়, নীলকণ্ঠ, বউ মাস্টার প্রভৃতি যাত্রার দলের তখন খুব নাম-ডাক ছিল। এই সব দল সাধারণত পূজা-পার্বণ বা বিবাহ উপলক্ষে কোনও বড়লোকের আহ্বানে আসিয়া 'একাদিক্রমে তিনচার রাত্রি পালা-গান গাহিতেন। দশবিশ ক্রোশ দূর হইতে লোকে দল বাঁধিয়া যাত্রা শুনিতে আসিত। আমার মামার যাত্রা শোনার খুব শখ ছিল। তিনি যখন শুনিলেন, সাহেবগঞ্জে মতি রায়ের দল আসিয়াছে তিনি একদিন যাত্রা শুনিবার জন্যই গুসকরা হইতে সাহেবগঞ্জে চলিয়া আসিলেন। হাতে কঠিন রোগী ছিল, একরাত্রির বেশী সেখানে থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু মতি রায়ের যাত্রা তাঁহাকে বড়ই মুগ্ধ করিয়াছিল, গুস্‌করায় ফিরিয়া গিয়া তাই তিনি স্থির করিলেন—গুস্‌করাতেই মতি রায়ের দলকে আনাইতে হইবে। ডাক্তার হিসাবে কয়েকজন ধনী মহাজনের উপর তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি হইয়াছিল, অর্থ সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হইল না। তিনদিন পরেই তিনি যাত্রার বায়না করিবার জন্য পুনরায় সাহেবগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে শিবু ঘটক তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন তাঁহারই এক দাদা মধু ঘটক তখন সাহেবগঞ্জে গোলাদারি করিতেন। নুনের গোলা ছিল তাঁহার। ইহা ছাড়া ধান, চাল, পাট প্রভৃতিরও কারবার করিতেন।

অনেক ব্যাপারী তাঁহার কাছে আসিত। ব্যাপারী এবং অতিথিদের জন্য তাঁহার আলাদা একটি বাসাই ছিল। যাত্রার বায়না করিতে আসিয়া মামা মধু ঘটকের এই বাসায় আসিয়া উঠিলেন। পরিচয় পাইয়া মধু ঘটকও তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। সেদিন দৈবাৎ আর একটি ঘটনাও ঘটিল। ঘটক মহাশয়ের ব্যাপারীদের মধ্যে একজন হঠাৎ পেটের ব্যথায় অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার ডাকিতে হইল। সাহেবগঞ্জে তখন সুরথ বসু নামে এক সাব-অ্যাসিটান্ট সার্জনের বেশ পসার প্রতিপত্তি ছিল। তিনি ঘটক মহাশয়ের গৃহ-চিকিৎসকও ছিলেন। তিনি আসিয়া উক্ত ব্যাপারীটির চিকিৎসার ভার লইলেন। রোগের কিন্তু উপশম হইল না। ব্যথা ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। আমার মামা তখন ঘটক মহাশয়কে বলিলেন, "আপনি যদি অনুমতি দেন, আমি এঁকে একটা ওষুধ দিতে পারি, আমার বিশ্বাস সে ওষুধে ওঁর ব্যথা কমে যাবে"। ঘটক মহাশয়ের সম্মতি পাইয়া মামা ঔষধটি দিলেন, অদ্ভুত ফলও ফলিল। ব্যাপারীটি অল্প সময়ের মধ্যে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। সাহেবগঞ্জ ছোট শহর, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মামার নাম রটিয়া গেল। সকলেই বলিতে লাগিল—সুরথবাবুর মতো ডাক্তার যে রোগকে কায়দা করিতে পারেন নাই এই ছোকরা-ডাক্তার একদাগ ঔষধেই তাহা সারাইয়া দিয়াছে। সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল! একদিনেই মামার অনেক রোগী জুটিয়া গেল। যাত্রার বায়না শেষ করিয়া মামা যখন গুস্‌করায় ফিরিতে উদ্যত হইয়াছেন তখন ঘটক মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন, "এ সুযোগ তুমি ছেড় না। গুস্‌করার চেয়ে সাহেবগঞ্জ অনেক বড় জায়গা। এইখানে এসেই তুমি বসে' পড়। আমি তোমাকে থাকবার জায়গা দেব, যতদিন না তোমার ভালো প্র্যাকটিস জমে আমায় বাসাতেই তুমি খাওয়া-দাওয়া করবে। গুস্‌করা থেকে তুমি এখানেই চলে' এস"।

শিবু ঘটকও এই পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাঁহার দাদাও দিলেন।

তাছাড়া মামা স্বচক্ষেই দেখিলেন যে একদিনের মধ্যেই সাহেবগঞ্জে তাঁহার যেরূপ নাম-ডাক হইয়া গেল তাহা অভাবনীয়। তাঁহার মনে হইল বিধাতার কোনও প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত হয়তো ইহার মধ্যে আছে। এখানে প্র্যাকটিস জমিয়া গেলে তাঁহার ভাগ্য ফিরিয়া যাইবে। সাহেবগঞ্জ ত্যাগ করিবার পূর্বে তিনি আর একটি কাজ করিলেন, ডাক্তার সুরথ বসুর সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। বলিলেন, তাঁহার মতো বিজ্ঞ চিকিৎসক যদি অনুমতি দেন তাহা হইলেই তিনি সাহেবগঞ্জে আসিবেন, নতুবা নয়। তাঁহার মতো কৃতবিদ্য চিকিৎসকের বিরোধিতা করিবার সাহস তাঁহার নাই। ঘটক মহাশয়ের ব্যাপারীটি ঘটনাচক্রে দৈবাৎ সারিয়া গিয়াছে, হয়তো সুরথবাবুর ঔষধই একটু দেরিতে কাজ করিয়াছে। এ বিষয়ে নিজে তিনি কোনও কৃতিত্ব বা চিকিৎসা-নৈপুণ্য দাবী করেন না। ডাক্তার সুরথ বসু উদারহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। মামার কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, আপনি এখানেই প্র্যাকটিস আরম্ভ করুন, আমি আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব। আমি একা সব রোগী সামলাইতে পারি না। মফঃস্বলের অনেক রোগীকে ফিরাইয়া দিতে হয়, আপনি যদি এখানে আসেন ভালই হয়, আমারই অনেক রোগী আপনি পাইবেন—"

কুমার নিবিষ্টচিত্তে পড়িতেছিল।

দ্বারপ্রান্তে পদশব্দ পাইয়া সে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল যে ভৃত্য শান্তা দাঁড়াইয়া আছে। শান্তা চাকরটি ঈষৎ স্থূলকায়, মুখটা থ্যাবড়া গোছের। ভাসা-ভাসা চক্ষু দুইটি ভাবলেশহীন, মনে হয় জীবন্ত নয়, যেন মুখোশের চোখ।

"কি রে—"

খাতা বন্ধ করিয়া কুমার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল। শান্তা আর একটু আগাইয়া আসিয়া চুপি চুপি বলিল, "আলুকা খেত'পর সিহাই আইলোছে।" অর্থাৎ আলুর ক্ষেতে শজারু আসিয়াছে।

কুমার খাতা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরের কোণে বন্দুক ছিল, তাহাতে টোটা পুরিয়া সন্তর্পণে সে পশ্চিম দিকের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। শান্তাও তাহার পিছু পিছু গেল, যাইবার পূর্বে টেবিল হইতে টর্চটি তুলিয়া লইল। একটু পরেই টর্চের প্রয়োজন হইবে তাহা সে জানিত।

মিনিট দশেক পরেই দুম দুম করিয়া বন্দুকের শব্দ হইল। সূর্যসুন্দর আচ্ছন্নের মতো পড়িয়াছিলেন। বন্দুকের শব্দে তাঁহার আচ্ছন্নভাব কাটিল না, তিনি কেবল মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "রায় মশায়, আপনার সিপাহীই বন্দুক চালাচ্ছে না কি"—বলিয়াই চুপ করিয়া গেলেন। গঙ্গা কিছু না বলিয়া একটু মৃদু হাসিল।

ঊর্মিলা হেঁট হইয়া প্রশ্ন করিল, "বাবা, কিছু বলছেন ?" সূর্যসুন্দর কোন উত্তর দিলেন না।

কুমারের লক্ষ্য অব্যর্থ। বেশ বড় একটা শজারু ঘায়েল হইয়াছিল। ওজনে প্রায় দশ বারো সের হইবে। শান্তা মনে মনে খুব আনন্দিত হইয়াছিল, সে জানিত ইহার অর্ধেকটা অন্তত তাহারা পাইবে। কিন্তু তাহার চোখে মুখে সে আনন্দ প্রতিফলিত হইতেছিল না। সে বিস্ফারিত নেত্রে কুমারের আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

কুমার বলিল, "এটাকে পরিষ্কার করে' তৈরি করে ফেল্। ঠাকুরকে বল খানিকটা রেঁধে রাখুক। দাদারা যদি এসে পড়ে খেতে পারবে। এখুনি চড়িয়ে দিতে বল। বাইরের উনুনটায় আঁচ দিয়ে দে—"

উত্তেজিত হইয়াছিল ল্যাংল্যাং এবং ছুঁচ্কি, কুমারের দেশী কুকুর দুইটা। কুমারের দুই পাশে দাঁড়াইয়া তাহারা ঘনঘন ল্যাজ নাড়িতেছিল। মাঝে মাঝে মুখ নীচু এবং কান খাড়া করিয়া ছুঁচকি মৃত রক্তাক্ত শজারুটার দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু বিশেষ ভরসা পাইতেছিল না, একটু আগাইয়াই আবার পিছাইয়া

আসিতেছিল। ওই কণ্টকিত বীভৎস জানোয়ারটার খুব কাছে যাওয়া নিরাপদ কি না তাহাই সে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। ল্যাংল্যাং আগাইবার চেষ্টা করে নাই, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া লালা ঝরিতেছিল। দুই একবার ভেক্ ভেক্ শব্দ করিয়া সে নিজের আগ্রহ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিল, ছুঁচকি কুঁই কুঁই করিতে লাগিল।

আদেশ পাইয়াও শাস্তা নড়ে নাই। কতটা মাংস রান্না করিবার জন্য আলাদা করিয়া দিবে তাহা সে ঠিক করিতে পারিতেছিল না, নিজের দায়িত্বে তাহা ঠিক করা সে সমীচীনও মনে করিতেছিল না। কুমার তাহার মুখের দিকে এক নজর চাহিয়াই সমস্যাটা বুঝিতে পারিল।

বলিল, "সের তিনেক রান্না করতে বল্। বাকীটা তোরা ভাগ করে' নিয়ে নে"—শাস্তা ইহাই প্রত্যাশা করিয়াছিল। মৃত শজারুটাকে সে টানিতে টানিতে লইয়া গেল। ল্যাংল্যাং এবং ছুঁচকিও অনুসরণ করিল। হঠাৎ একযোগে কতকগুলা শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। শৃগালের ডাক থামিতে না থামিতে পাখীদের সম্মিলিত কাকলীও শোনা গেল। কুমার টর্চ ফেলিয়া নিজের হাতঘড়িটা দেখিল, কাঁটায় কাঁটায় বারোটা বাজিয়াছে। হঠাৎ হু হু করিয়া একটা হাওয়া উঠিল, মনে হইল দূর প্রান্তরে কে যেন বিলাপ করিতেছে। কৃষ্ণপক্ষের শীর্ণশশী বকুল গাছের মাথার উপর দেখা দিল। কুমার স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত। বাবার এই অসুখই যে শেষ অসুখ তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল; ডাক্তারবাবুও সে কথা বলিয়া গিয়াছিলেন। বাবার বয়স বিরাশী পার হইয়া গিয়াছে, কিছুদিন হইতে তিনি অসমর্থও হইয়া পড়িয়াছেন, এখন যদি তাঁহার মৃত্যু হয় নালিশ করিবার কিছু নাই, বরং তাহাই কাম্য। কিন্তু তবু সে কেমন যেন অসহায় বোধ করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল দাদারা আসিয়া পড়িলে সে যেন নিশ্চিত হয়। যদিও

সে জানে দাদারা এখানে আসিয়া বেশী কিছুই করিতে পারিবেন না, বিদেশে নিজ নিজ কর্মস্থলে তাঁহারা সক্ষম ব্যক্তি, এখানে যত ঝঞ্ঝাট কুমারকেই পোহাইতে হইবে, তবু তাহার মনে হইতেছিল দাদারা আসিলে সে নিশ্চিন্ত হইবে, অনেকটা বল পাইবে, দায়িত্বের বোঝা কমিয়া যাইবে। খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর আসিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিল।

ঊর্মিলা বাবার বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়াছিল। উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "বন্দুকের আওয়াজ হ'ল কেন, কিছু মারলে না কি"

"একটা শজারু—"

"এখন না মারলেই পারতে! বাবার অসুখ—"

"কিন্তু আলুর ক্ষেত যে শেষ করে' দিলে"

"মা—"

সূর্যসুন্দরের ডাকে ঊর্ম্মিলা তাড়াতাড়ি আবার তাঁহার শয্যা-পার্শ্বে ফিরিয়া গেল। গিয়া দেখিল সূর্যসুন্দর চোখ বুজিয়া যেমন শুইয়াছিলেন তেমনি শুইয়া আছেন। "বাবা, কিছু বলছেন?"

মাথার শিয়রে বসিয়া খুব আস্তে আস্তে প্রশ্নটি করিল। সূর্যসুন্দর কোনও উত্তর দিলেন না। ঊর্মিলা তখন গঙ্গার দিকে চাহিল অর্থাৎ এ অবস্থায় কি করা যায়, আবার ডাকিবে কি? গঙ্গা হাত নাড়িয়া কথা কহিতে বারণ করিল। ঊর্ম্মিলা তখন ধীরে ধীরে হাওয়া করিতে লাগিল, তাহার আর কিছু করিবার ছিল না। শ্বশুরের প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিয়া তাহার নিজের বিবাহের কথাটা সহসা আবার মনে পড়িয়া গেল। তাহার বাবা যখন কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া পাগলের মতো বহুলোকের দ্বারে দ্বারে ছুটিয়া বেড়াইতেছিলেন তখন কেহই তাঁহাকে তেমন আশ্বাস দেন নাই যেমন ইনি দিয়াছিলেন। কেহ চাহিয়াছিলেন রূপ, কেহ পণ, কেহ ডিগ্রি, কেহ সব। ইনিই কেবল বলিয়াছিলেন "আমার ছেলের যদি মেয়ে পছন্দ

হয় আর কিছুরই জন্ম আটকাবে না"। সত্যই আটকায় নাই, নির্ব্বিঘ্নে তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। সূর্যসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত মন আবার কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। বাহিরের অন্ধকারকে বাঙ্ময় করিয়া ঝিল্লী-ধ্বনি চতুর্দিক মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল। ঝোড়ো হাওয়াটার বেগও যেন বাড়িতেছিল ক্রমশ। গঙ্গার মনে হইতেছিল প্রকৃতিও বুঝি হাহাকার করিতেছে। সূর্য-সুন্দরের পদপ্রান্তে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া গঙ্গা নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। তাহার মনে কত কথাই জাগিতেছিল। এই লোকের কি প্রতাপই না ছিল এককালে। বড় বড় দুর্ধর্ষ জমিদারেরা পর্যন্ত ভয়ে তটস্থ হইয়া থাকিত। জজ ম্যাজিস্ট্রেট সিভিল-সার্জনরা খাতির করিত। এ অঞ্চলের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়া কি মহিমাময় জীবনই না উনি যাপন করিয়াছেন। কিন্তু সেই লোকই এখন অসহায় অসমর্থ, দক্ষিণ অঙ্গ পড়িয়া গিয়াছে, পায়ের আঙুলটি পর্যন্ত নড়াইবার শক্তি নাই। হঠাৎ গঙ্গার মনে পড়িয়া গেল সূর্যসুন্দরের হাতে সে কত মারই না খাইয়াছে। কথাটা মনে হওয়াতে তাহার ভারী আনন্দ হইল, মনে হইল এটা যেন তাহার জীবনের পরমলাভ। সহসা অপ্রাসঙ্গিকভাবে আর একটা কথা মনে হওয়াতে সে উঠিয়া পড়িল এবং উর্মিলার কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—"কুমার এত রাত্রে মাংস রাঁধতে বলছে। পেঁয়াজ আছে তো? কাল হাটে পাওয়া যায় নি"

"না পেঁয়াজ নেই"

"দেখি যদি পাই কোথাও"

গঙ্গা নিঃশব্দে উঠিয়া কুমারের ঘরে প্রবেশ করিল।

"তোর বাইকটা নিয়ে আমি বেরুচ্ছি একবার"

"কোথায়"

"পেঁয়াজ নেই, মাংস রান্না হবে কি করে', তুমি তো হুকুম দিয়েই খালাস"

"বিনা পিঁয়াজেই হোক। একটু বেশী করে রসুন আর আদা দিতে বল।"

"দেখি যদি পাই কোথাও"

"এতরাত্রে কোথা পাবি"

"জহিরুদ্দিনের বাড়িতে পাব"

"দেখ তাহলে"

গঙ্গা বারান্দা হইতে বাইকটা লইয়া বাহির হইয়া গেল।

কুমার পুনরায় জীবন-চরিতে মন দিল।

"আমার মামা অবশেষে সাহেবগঞ্জে আসিয়াই বসবাস করিতে লাগিলেন। প্রথমে আসিয়া কয়েকদিনের জন্য তিনি মধু ঘটকের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরে বাজারের কাছে একটি ঘর ভাড়া করিয়া সেইখানেই উঠিয়া গেলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী তখন তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্র্যাক্‌টিস জমিয়া উঠিল। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সাহেবগঞ্জে একটি বাড়িও কিনিতে সমর্থ হইলেন। নিজের গ্রাম হইতে এই সময়ে তাঁহাকে পরিবারবর্গকেও আনিতে হইল, কারণ তাঁহার মা (আমার দিদিমা) ক্রমশ দৃষ্টি-শক্তি হারাইয়া ফেলিতেছিলেন। শুনিয়াছি আমার বাবাই না কি ইহার কারণ! বাবা কিছুতেই সংসার-বন্ধনে ধরা দিতেছিলেন না। বিবাহের পূর্বে যাহা বলিয়াছিলেন কাজেও তাহা করিতেছিলেন। সংসারের কোন দায়িত্বই গ্রহণ করেন নাই। সেতারটি লইয়া কোথায় যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন তাহা নির্ণয় করা সহজ ছিল না। মাঝে মাঝে দুই একখানা পত্র লিখিতেন—কখনও কাশী, কখনও লক্ষ্ণৌ, কখনও বা দিল্লী হইতে। শহরের নাম ছাড়া আর কোনও ঠিকানা তাহাতে থাকিত না। মাঝে মাঝে কিছু কিছু টাকাও পাঠাইতেন শুনিয়াছি, কিন্তু তাহা কচিৎ। নিজে কখনও আসিতেন না। এ দুঃখ দিদিমার পক্ষে মর্মান্তিক হইয়াছিল। যুবতী কন্যার বিরহ

মুখের দিকে চাহিয়া তিনি দিবারাত্রি অশ্রু বিসর্জন করিতেন। এইজন্যই তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। মামা যখন তাঁহাদের সাহেবগঞ্জে লইয়া গেলেন তখন তাঁহার দৃষ্টিশক্তি খুবই ক্ষীণ। মামার পরিবারবর্গের মধ্যে ছিলেন তাঁহার মা, তাঁহার দিদি (আমার মা) এবং তাঁহার সদ্য-বিবাহিতা পত্নী। আমার মামীমার বয়স তখন বারো কিম্বা তেরো। মামীমার পিতামাতা কিছুদিন পূর্বে মারা গিয়াছিলেন। তাই মামীমার শিশু ভ্রাতা নকুলও মামার পরিবারভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

মামা সাহেবগঞ্জে আসিয়া বসবাস করিবার মাস ছয়েক পরেই একদিন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। বাবা হঠাৎ সাহেবগঞ্জে আসিয়া হাজির হইলেন। তিনি স্বেচ্ছায় আসেন নাই, কিন্তু যোগাযোগ এমনই হইল যে তিনি আসিয়া পড়িলেন। মামা যে সাহেবগঞ্জে আছেন এখবরও তিনি জানিতেন না। তিনি মুঙ্গের যাইতেছিলেন একজন ওস্তাদের নিমন্ত্রণ পাইয়া। সাহেবগঞ্জ স্টেশনে আর একজন ওস্তাদ-সেতারী ধূর্জটি বাগচীর সহিত তাঁহার দেখা হইয়া গেল। পূর্ব পরিচয় ছিল, উভয়ে উভয়কে শ্রদ্ধাও করিতেন। বাগচী মহাশয় বাবাকে জোর করিয়া নামাইয়া লইলেন। বাগচী মহাশয়ের বাড়ি মামার বাড়ির কাছেই ছিল, সেখানেই তিনি বাবাকে লইয়া আসিলেন। বাবা যে শক্তিবাবু ডাক্তারের ভগ্নীপতি একথা তিনিও জানিতেন না। কিন্তু জানিতে বিলম্ব হইল না। ধূর্জটিবাবুর অসুস্থ স্ত্রী মামারই চিকিৎসাধীন ছিলেন। একটু পরেই মামা তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন, তখন সব জানাজানি হইয়া গেল।... বাবা সেবার কিছুদিন সাহেবগঞ্জ থাকিয়া গেলেন। সকলের আগ্রহাতিশয্যে এবং দিদিমার চোখের অবস্থা দেখিয়া থাকিয়া গেলেন ইহাই সকলের বিশ্বাস। কিন্তু আমি বাবার সম্বন্ধে যতটুকু জানি তাহা হইতে আমার মনে হয় বাবার প্রধান আকর্ষণ ছিলেন বাগচী মহাশয়। শুনিয়াছি অধিকাংশ সময় তিনি বাগচী মহাশয়ের

বাড়িতেই কাটাইতেন। বাগচী মহাশয় সাহেবগঞ্জের মিউনিসিপালিটিতে চাকুরি করিতেন। তাঁহার পুত্র কন্যা হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও ছিল না। সুতরাং যে বেতন তিনি পাইতেন তাহাতেই সেই শস্তা-গণ্ডার যুগে তাঁহার স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত, আর্থিক উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করিবার তেমন উৎসাহও তাঁহার ছিল না। তাঁহার উৎসাহ ছিল সেতারে। সমস্ত মন পড়িয়া থাকিত সেতারের দিকে। আমার মনে হয় এমন একজন সুর-তপস্বীর সঙ্গলোভেই বাবা কিছুদিন সাহেবগঞ্জে থাকিয়া গিয়াছিলেন। ধূর্জটিবাবুর সেতার-সাধনা একটু অদ্ভুত ধরনের ছিল। তিনি গৎ লইয়া বেশী মাতামাতি করিতেন না। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া নিবিষ্টচিত্তে সেতারটি কেবল বাঁধিতেন। তাঁহার প্রিয় তবলচী সখীচাঁদ পাশে বসিয়া তবলা টুংটাং করিত, বাগচী মহাশয় সেতারের তারগুলিতে মৃদু মৃদু আঘাত করিতে করিতে প্রয়োজন মতো সেগুলি ঢিলা করিতেন বা কষিয়া দিতেন। আমি স্বচক্ষে তাঁহাকে ইহা করিতে দেখিয়াছি, তিনি অনেকদিন বাঁচিয়া ছিলেন। আমরা যখন স্কুলের ছুটির পর মাঠে খেলিতে যাইতাম তখন দেখিতাম তিনি সেতার লইয়া বসিয়াছেন। সন্ধ্যায় যখন ফিরিতাম তখনও দেখিতাম তিনি বসিয়া আছেন, নিবিষ্টচিত্তে সুর মিলাইতেছেন। রাত্রি নটা পর্যন্ত তিনি তন্ময় হইয়া কেবল সুর মিলাইতেন। সুর মিলিয়া গেলেই তাঁহার মুখভাব প্রসন্ন হইয়া উঠিত, সেতারটি রাখিয়া তিনি পুলকিতচিত্তে খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিতেন, তাহার পর সেটি খোলে পুরিয়া তুলিয়া রাখিতেন, যেন সেদিনের মতো তাঁহার কর্তব্য শেষ হইয়া গেল। আমার বাগচী মহাশয়ের স্মৃতির সহিত একটা পবিত্র শুভ্রতার অনুভূতি বিজড়িত হইয়া আছে। তাঁহার গায়ের রং ধপধপে ফরসা ছিল, মাথার চুলও ছিল শাদা, স্কন্ধে শুভ্র উপবীতগুচ্ছ শোভা পাইত। থান পরিতেন, পায়ের চটি জোড়াও ছিল শাদা কট্‌কী চটি। আহার শ্বেতপাথরের থালায় আলো-চালের ভাত, কিছু সিদ্ধ তরকারী এবং

শ্বেতপাথরের বাটিতে একবাটি দুধ। বাগচী গৃহিণী সুরসিকা ছিলেন, বলিতেন "মহাদেব কি না, তাই সব শাদা। বাড়ির সামনে একটা শাদা ষাঁড়ও এসে বসতে আরম্ভ করেছে।" আমার বিশ্বাস এই বাগচী মহাশয়ের জন্যই বাবা কিছুদিন সাহেবগঞ্জে ছিলেন মামার বাড়িতে তিনি কেবল আহার ও শয়ন করিতেন, বাকি সময়টা তাঁহার বাগচী মহাশয়ের বাড়িতেই কাটিত। শুনিয়াছি— দিদিমা যখন মায়ের দুর্ভাগ্যের জন্য বিলাপ করিতেন বাবা চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতেন, কোন জবাব দিতেম না। একদিন কেবল মৃদু হাসিয়া উত্তর দিয় ছিলেন—'আমি তো আগেই বলেছিলাম'। এই সময় বাবার আর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সকলের নিকট প্রকাশ হইয়া সকলকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। বাবা যে একজন তান্ত্রিক শাক্ত ছিলেন—একথা পূর্বে কেহ জানিত না। প্রকাশ হইয়া পড়িল যে তাঁহার নিকট একটি কালীর পট আছে, রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর প্রত্যহ তিনি সেটির পূজা করেন, পূজার সময় 'কারণ' পানও করেন। সাহেবগঞ্জে একটি কালিবাড়ি ছিল। অমাবস্যা-রাত্রে কালিবাড়িতে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া প্রভাতে যখন তিনি বাড়ি ফিরিতেন তখন তাঁহার মূর্তি দেখিয়া সকলে ভীত হইয়া পড়িত। গলায় জবাফুলের মালা, কপালের মাঝখানে সিঁদুরের টিপ, পরিধানে রক্তাম্বর, চোখ দুটি টকটকে লাল। বাবার এই উগ্র শাক্ত-আচরণ কিন্তু বাগচী মহাশয়কে একটুও বিচলিত করে নাই। বরং বাবার প্রতি তাঁহার প্রীতি ও শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বর্ধিতই হইতেছিল। তিনি যতক্ষণ সুর মিলাইতেন বাবা তাঁহার কাছে ততক্ষণ নীরবে চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকিতেন, মনে হইত বুঝি ধ্যান করিতেছেন। বাগচী মহাশয়ের সুর মেলানো শেষ হইয়া গেলে বাহির হইত বাবার সেতার। বাবা তখন আলাপ শুরু করিতেন। অনেক রাত্রি পর্যন্ত আলাপ চলিত। তবলচী লখীচাঁদের নয় বৎসরের মেয়েটি তাহার বাবাকে ডাকিবার

জন্য প্রত্যহ একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন লইয়া আসিত এবং লণ্ঠনটি একধারে কমাইয়া রাখিয়া তন্ময়চিত্তে বাবার আলাপ শুনিত। সখীচাঁদ পাঠকের কন্যা মুনিয়াকে আমি পরে দেখিয়াছি, ডাক্তার হইয়া তাহার নাতি-নাতিনীর চিকিৎসাও করিয়াছি। সেই আমাকে বাবার সেতার বাজানোর গল্প করিত। বলিত, বাবা সেতার বাজাইতে আরম্ভ করিলে এমন একটা গম্ভীর অদ্ভুত পরিবেশ গড়িয়া উঠিত যে তাহার জোরে নিশ্বাস পর্যন্ত ফেলিবার সাহস হইত না। মনে হইত সামান্য শব্দ করিলেই বুঝি সর্বনাশ হইয়া যাইবে, যে সুরের প্রাসাদ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা বুঝি চুরমার হইয়া ভাঙিয়া পড়িবে। তাই যতক্ষণ বাবার আলাপ চলিত সে চুপ করিয়া এককোণে বসিয়া থাকিত। বসিয়া থাকিতে থাকিতে অনেক সময় ঘুমাইয়া পড়িত, ঘুমের মধ্যেও কিন্তু তাহার সমস্ত সত্তা আচ্ছন্ন হইয়া থাকিত সেতারের আলাপে। মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখিত যেন বিচিত্র বর্ণের অপ্সরীরা চতুর্দিকে নৃত্য করিতেছে, তাহাদের পায়ে নুপুর, গায়ে নীল রঙের ওড়না।

আমার যেদিন জন্ম হয় সেদিন বাবা ছিলেন না। তিনি সাহেবগঞ্জে কিছুদিন থাকিয়া আবার সহসা একদিন নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিলেন। কোথায় যাইতেছেন তাহা কাহাকেও বলিয়া যান নাই, এমন কি আমার মাকেও না। দোল উপলক্ষে মামা সপরিবারে দেশে গিয়াছিলেন। আমার মা তখন আসন্ন-প্রসবা। সুতরাং মামা পরিবারবর্গকে দেশের বাড়িতে রাখিয়া একাই সাহেবগঞ্জে ফিরিয়া গেলেন। আমার জন্ম মামার দেশের বাড়িতেই হইয়াছিল।

শুনিয়াছি আমার মা দুইদিন প্রসব-বেদনা ভোগ করিয়াছিলেন। আয়ের একমাত্র আদরিণী কন্যা ছিলেন তিনি, পাড়ার সকলেও তাঁহাকে খুব ভালবাসিত। তাঁহার প্রসব বেদনা তাই অনেকের

কষ্টের এবং চিন্তার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। মামার জ্ঞাতি-ভ্রাতা ক্ষেত্রনাথ (খেতু-মামা) খুব বেশী অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি পালকি পাঠাইয়া হিজলা গ্রামের শ্রীনাথ ডাক্তারকে আনাইয়া ফেলিলেন এবং তাঁহাকে বারবার বলিতে লাগিলেন, "এ কষ্ট আর দেখা যায় না। আপনি যেমন করে হোক ওকে খালাস করে' দিন। অন্তত ওষুদবিষুদ দিয়ে কষ্টটা লাঘব করে' দিন। এর জন্যে যদি কিছু অর্থব্যয় করতে হয় তাতেও আমি প্রস্তুত। হিমু গয়লা আমার বাছুর দুটো নেবার জন্যে ঝুলোঝুলি করছে। পঁচিশ টাকা এখখুনি দিয়ে দেবে—"

প্রবীণ শ্রীনাথ ডাক্তার মৃদু হাসিয়া খেতু মামাকে ধৈর্য অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন. "টাকা খরচ করলেই যদি সব কষ্টের লাঘব হ'ত তাহলে বড়লোকেরা কেউ কষ্ট পেত না। ভয়ের কোনও কারণ নেই, প্রথম পোয়াতি তাই একটু দেরি হচ্ছে, এখনই সব ঠিক হ'য়ে যাবে—"

আমি ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত শ্রীনাথ ডাক্তার অপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং কাল হরণ করিবার জন্য প্রায় আধসের অম্বুরি তামাক পোড়াইয়াছিলেন শুনিতে পাই। আর একটা আশ্চর্য যোগাযোগ সেদিন ঘটিয়াছিল। যে কয়জন লোক আমার ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন তাঁহারাও সকলে সেদিন উপস্থিত ছিলেন মামার বাড়ির উঠানে। উঠানের একধারে গোয়ালঘর ছিল, সেইখানেই আমার জন্ম হয়, আমার জন্ম না হওয়া পর্যন্ত কেহই উঠান ত্যাগ করেন নাই। আমার মামী এবং দিদিমা তো ছিলেনই, খেতু মামাও ছিলেন। তাছাড়া ছিলেন মামার এক জাঠতুতো দাদা (বচ্চু মামা) এবং একজন দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি উমেশ ঘোষাল। আমার মায়ের সই ভবিও (ভবতারিণী দেবী) একধারে দাঁড়াইয়াছিলেন। আমার জন্মের প্রায় বছর খানেক পূর্বে তাঁহার প্রথম সন্তান সন্তোষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এই সন্তোষের সহিত কিছুদিন

আমি গ্রামের পাঠশালায় একসঙ্গে পড়িয়াও ছিলাম। পরে সম্পর্ক ঘনিষ্টতরও হইয়াছিল। সে কথা পরে লিখিব।…”

বাবার গলার স্বর শুনিয়া কুমার খাতা বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

“হরিবোল, হরিবোল—”

ঊর্মিলা মাথার শিয়রে বসিয়াছিল, ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বাবা কিছু বলছেন ?”

“না”

“ঘাড়ের কাছে লাগছে না তো”

“না। বেশ আছি। বিরু আসে নি এখনও”

“না। ট্রেন বোধহয় লেট আসছে। স্টেশন থেকে গাড়ি ফেরেনি এখনও”

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সূর্যসুন্দর জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ কি বার”

“বুধবার”

“আজ নবাবগঞ্জের হাট, না ?”

“হ্যাঁ”

“হাটে কেউ গিয়েছিল ?”

“গিয়েছিল”

“মাছ পেয়েছে ?”

“পেয়েছে, পাকা রুই মাছ”

“ভালই হয়েছে। মাছ মাংস না হলে বিরুর খাওয়া হয় না”

“মাংসও হচ্ছে। উনি শজারু মেরেছেন একটা”

“মেরেছে ? বেশ করেছে। আলুর ক্ষেতটা একেবারে তছনছ করে’ দিচ্ছিল”

কুমার আগাইয়া আসিয়া বলিল, "বেশী কথা বোলো না বাবা, তুর্বল লাগবে"

মৃত্ হাসিয়া সূর্যস্থন্দর চোখ বুজিলেন।

কুমার চুপি চুপি উর্মিলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "গঙ্গা কি বাড়ি গেছে ?"

"না। পশ্চিম বারান্দায় কি করছে যেন"

কুমার গিয়া দেখিল গঙ্গা ছেঁড়া বোরা মেরামত করিতেছে।

কুমারকে দেখিয়া বলিল, "চাকরগুলা সব শজারু নিয়ে মেতেছে। মধুকে বলেছিলাম বোরাগুলো মেরামত করে' রাখতে। কাল লাহুরামকে পঁচিশ বোরা মকাই পাঠাতে হবে। সে নগদ দাম দিয়ে দেবে বলেছে। কথাটা এখন হঠাৎ মনে পড়ল আমার। গুণে দেখি মাত্র ষোলটি ভালো বোরা আছে আমাদের। বাকীগুলো সব ছ্যাঁদা। সেগুলো সেরে রাখছি তাই। বাবা উঠেছেন নাকি। গলা শুনলাম মনে হ'ল—"

"দাদার কথা জিগ্যেস করছিলেন"

"ট্রেনটা খুব 'লেট' আজকে। বাইরে কে ডাকছে যেন—"

গঙ্গা উঠিতে যাইতেছিল, কুমার বাধা দিল।

"তুই যা কচ্ছিস কর্, আমি দেখছি"

কুমার বাহিরে গিয়া দেখিল—মুন্দিপুরের রাধানাথ গোপ আসিয়াছেন।

"আমি সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে এসে খবর পেলাম যে ডাক্তারবাবুর পক্ষাঘাত হয়েছে। তাই আর থাকতে পারলাম না, চলেই এলাম। কি ব্যাপার, কেমন আছেন, কি ব্যবস্থা হয়েছে"

কুমার তাঁহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিল।

"এখন ঘুমুচ্ছেন ?"

"হ্যাঁ"

"আচ্ছা, আমি কাল আবার আসব"

"এত রাত্রে আবার ফিরে যাবেন? তার চেয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে এখানেই শুয়ে পড়ুন"

"আজ আমাকে ফিরতেই হবে। কাল ভোরেই আবার চলে' আসব। এ অঞ্চলের অনেকেই আসবে, আর সেটাও একটা সমস্যা হ'য়ে দাঁড়াবে। কাল এসে তার জন্যেও একটা ব্যবস্থা করতে হবে। করেছ কিছু?"

"না। কি করতে হবে বলুন তো"

"একটু ফাঁকাও করে' বসবার জায়গা, বিশ্রামের জায়গা করতে হবে আর কি। লোক অনেক জুটবে তো। আমি কাল এসে করব সে সব। এখন চলি"

কুমার আগাইয়া গিয়া তাঁহাকে তাঁহার গাড়িতে তুলিয়া দিয়া আসিল। তিনি মহিষের গাড়ি করিয়া আসিয়াছিলেন। রাধানাথ গোপ মুন্দিপুরের একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। প্রায় এক হাজার বিঘা জমি আছে। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, নিষ্ঠাবান কংগ্রেসকর্মী এবং সূর্যসুন্দরের একজন প্রগাঢ় ভক্ত। কুমার ফিরিবার সময় দেখিল গ্রামের আরও দুই চারিজন লোক বৈঠকখানার বারান্দায় সূর্যসুন্দরের খবর লইবার জন্য বসিয়া আছে। কুমারকে দেখিয়া তাহারা আগাইয়া আসিল। সকলেই উৎকণ্ঠিত, ডাক্তারবাবুর খবর জানিবার অন্য সকলেই ব্যগ্র। ইহারাও অনেকদূর হইতে হাঁটিয়া আসিয়াছে এবং অনেকক্ষণ হইতে বসিয়া আছে। গরীব মুসলমান চাষী কয়েকজন। কুমার সহসা অনুভব করিল—সূর্যসুন্দর এ অঞ্চলের সকলেরই পিতৃস্থানীয়, সুতরাং যে কোন সময়ে এ বাড়িতে আসিবার অধিকার সকলেরই আছে। এ বাড়ি কেবল তাহাদেরই নয়, সকলের। এ বাড়িতে তাহাদের অভ্যর্থনার ত্রুটি হইলে অন্যায় হইবে!

"তোমরা খেয়ে এসেছ?"

"না বাবু। বাড়ি গিয়ে খাব"

"এইখানেই খেয়ে নাও। এত রাত্রে বাড়ি ফিরে যাবে? দরকার থাকে যেতে পার, আর তা না থাকলে এইখানেই শুয়ে পড়।"

তাহারা চুপ করিয়া রহিল।

কুমার ভিতরে গিয়া গঙ্গাকে বলিল, "সীতারামপুরের জনকয়েক চাষী বাবার খবর নিতে এসেছে। তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে' দাও"

গঙ্গা হাতের কাজ বন্ধ করিয়া কয়েক মুহূর্ত কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "এখন কত লোক খবর নিতে আসবে তার ঠিক আছে? কত লোককে খাওয়াব আমরা।"

"এদের ব্যবস্থাটা তো কর এখন। পরের কথা পরে ভাবা যাবে।"

গঙ্গা উঠিয়া গেল। মনে হইল চটিয়াছে। চটিলে গঙ্গা নীরব হইয়া যায়।

২

সূর্যসুন্দরের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিরু, ওরফে বৃহস্পতি মুখোপাধ্যায় কিউল প্ল্যাটফর্মে সস্ত্রীক বসিয়া ট্রেনের অপেক্ষা করিতেছিলেন। শুধু ট্রেনের নয়, নিজের ছেলেমেয়েদেরও। তাঁহার দুই পুত্র, দুই কন্যা। বড় ছেলে লক্ষ্ণৌ শহরে ডাক্তারি করে, ছোট ছেলে অধ্যাপক, কাশীতে থাকে। বড় মেয়ের বিবাহ হইয়াছে দ্বারভাঙ্গায়, ছোট মেয়ের কলিকাতায়। ছোট জামাই পুলিসে বড় চাকরি করে। ইহাদের মধ্যে যে কেহ কিম্বা সকলেই যে কোনও ট্রেনে আসিয়া পড়িতে পারে। বৃহস্পতি এবং বৃহস্পতির স্ত্রী পুরসুন্দরী তাই উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়া আছেন। কোনও ট্রেন আসিলেই প্রতি কামরায় উঁকি দিয়া দেখিতেছেন—কেহ আসিল কি না। বৃহস্পতি নিজে আসিয়াছেন দিল্লী হইতে। কিউল হইতে তাঁহাকে লুপ লাইনের ট্রেন ধরিতে হইবে। কিন্তু সে ট্রেনটির এন্‌জিন্ কোন একটা স্টেশনে নাকি খারাপ হইয়া গিয়াছে, ট্রেনটা কখন যে আসিবে তাহার স্থিরতা নাই। ইহার ফলে তাঁহাকে সাহেবগঞ্জে বসিয়া থাকিতে হইবে। কারণ সক্‌রিগলি ঘাটে যাইবার গাড়িটা সম্ভবত পাওয়া যাইবে না। ইহার জন্য বিরু খুব যে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন আপাতদৃষ্টিতে তাহা মনে হয় না। তিনি জানেন, যাহা ঘটিবার যথাসময়ে তাহা ঘটিবে। যদি ধীরে ধীরে ঘটে—তাহাকে দ্রুততর করিবার জন্য চেষ্টা মাত্র করা যাইতে পারে, ব্যস্ত হইয়া লাভ নাই। তিনি অ্যানথ্রপলজির ছাত্র, মানব জাতির অতীত ইতিহাসের সন্ধানে অনেক কবর খুঁড়িয়াছেন, অনেক খনিত কবর পরিদর্শন করিয়াছেন। খৃষ্ট পূর্ব বহু সহস্র বৎসরের হিসাব নিকাশ করিতে করিতে তাঁহার জীবন কাটিয়াছে। তাঁহার মনে অন্তত একটা দার্শনিক প্রশান্তি

থাকা উচিত, এ জ্ঞান তাঁহার আছে। ট্রেনের একটু-আধটু 'লেট' হওয়া বা পিতার অসুখের সংবাদ তাই যাহাতে তাঁহাকে খুব বেশী বিচলিত করিয়া না ফেলে সে বিষয়ে তিনি লক্ষ্য রাখিয়াছেন। কর্তব্য সম্বন্ধে অবশ্য তিনি উদাসীন হন নাই। ট্রেন লেট দেখিয়া কিউল হইতেই তিনি কয়েকটি টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছেন। পত্নী পুরসুন্দরীকেও প্রফুল্ল রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। দিল্লী হইতে আসিবার পথে একটু ঘুরিয়া লক্ষ্ণৌয়ে নামিয়া গগনকে (বড় ছেলেকে) সঙ্গে করিয়া আনিবার চ্ছা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। কিন্তু এ ইচ্ছা অবশেষে তিনি দমন করিয়াছিলেন। এই অসুখই যে বাবার জীবনের শেষ অসুখ তাহাতে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। তাঁহার অন্তিম সময়ে তাঁহাকে বাবার কাছে সশরীরে উপস্থিত থাকিতেই হইবে, পথে কোন কারণেই বিলম্ব করা চলিবে না। তাই তিনি গগনের নামে একটা টেলিগ্রাম করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। ছোট ছেলে দিগন্তকেও টেলিগ্রাম করিয়াছেন, দুই জামাই রমেশ এবং সোমনাথকেও করিয়াছেন। তিনি জানেন কুমারও নিশ্চয়ই সকলকে খবর দিয়াছে। তবু 'অধিকন্তু ন দোষায়' এই নীতি অনুসরণ করিয়া তিনিও প্রায় সকলকেই একটা করিয়া টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছেন! এমন কি তাঁহার দুই বোন উষা এবং সন্ধ্যাকেও। কিরণের বর্তমান ঠিকানা জানা নাই বলিয়া তাহাকে খবর দিতে পারেন নাই। উষার শ্বশুরবাড়ি কলিকাতায়, সন্ধ্যার দেওঘরে। বিরু আশা করিতেছিলেন সন্ধ্যা উষা নিশ্চয়ই এতক্ষণ পৌঁছিয়া গিয়াছেন। চিত্রাও—বিরুর ছোট মেয়ে হয়তো পিসিদের সহিত আসিয়া গিয়াছে। ছুটি পাইলে ছোট জামাই রমেশও নিশ্চয় আসিবে, কিন্তু তাহার ছুটি পাওয়াই মুশকিল।

পুরসুন্দরীর সহিত এই সব আলোচনা করিয়া বিরু পুনরায় স্টেশন মাস্টারের নিকট গিয়াছিলেন ট্রেনের খবরটা লইবার জন্য। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "ট্রেনের এখন অনেক দেরি। কোনও

খবরই নেই। এখন যে ট্রেনটা আসছে—স্বাতী আর সোমনাথ যদি প:লেজা ঘাট পেরিয়ে পাটনা হ'য়ে আ:সে, সেটা ধরতে পারবে। ওরা আসতে পারে এ ট্রেনে। গগন আর দিগন্ত তো পারেই। আসল কথা হচ্ছে ওরা খবরটা পেয়েছে কি না। চারিদিকে যে রকম মিস্‌ম্যানেজমেন্ট, টেলিগ্রাম পৌঁচেছে কি না কে জানে। দ্বারভাঙ্গায় সোমনাথ আছে কি না তা-ও অনিশ্চিত। তাকে টুরে বেরুতে হয় তো। সে না এলে স্বাতীও আসতে পারবে না—"

স্বাতী বিরুর বড় মেয়ে, সোমনাথ বড় জামাই।

মুকুন্দ নামক যে বালক ভৃত্যটি ময়দা বাহির করিয়া লুচি ভাজিবার উদ্যোগ করিতেছিল একথা শুনিয়া সে থামিয়া গেল এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পুরসুন্দরীর দিকে চাহিল।

পুরসুন্দরী বলিলেন, "ট্রেনটা দেখেই তাহলে ময়দা মাখিস। তুমি এখন বিস্কুট দিয়েই চা খাও তাহলে—"

বিরু বলিলেন, "বেশ। ক্ষিধেও পায় নি তেমন—"

"চা খাবে, না, কফি। চা-তো এই একটু আগেই খেলে—"

"বেশ কফিই কর"

বিরুর কিছুতেই আপত্তি নাই। যে সময়টা এখানে অনিবার্য-ভাবে থাকিতেই হইবে সে সময়টা কোনও কিছু করিয়া কাটাইয়া দিতে পারিলেই হইল। মনটা যেন নিযুক্ত থাকে, পিতার অসুখের সংবাদ ফাঁক পাইয়া তাঁহাকে যেন অশোভনভাবে চঞ্চল করিয়া না তোলে। হঠাৎ তিনি একটা বড় তোরঙ্গের উপর বসিয়া হাঁটু নাচাইতে লাগিলেন। পায়ে নূতন জুতা ছিল, কোঁচ-কোঁচ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। ইহাতে বিরক্ত হইয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। জিনিসপত্রগুলা আর একবার গণিয়া গণিয়া দেখিতে লাগিলেন। সব ঠিকই আছে। জিনিসপত্র অনেক। দুইটা বড় ট্রাঙ্ক, চারটি হোল্‌ড-অল্‌, গোটা ছয়েক সুট-কেস, ছোট বিছানা গোটা চারেক, মুখ-বাঁধা ফলের ঝুড়ি গোটা চারেক, মুখ-খোলা একটা, দুইটি

বিরাটকায় টিফিন কেরিয়ার, একটা বড় হট্ কেস, মুখ-বাঁধা সন্দেশের হাঁড়ি গোটা দুই, গোটা দুই 'থারমস্', দুই বড় বড় কেরাসিন কাঠের বাক্সে রন্ধনের সরঞ্জাম, তাছাড়া পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠন একটা। বিরু বাজারের খাবার খাইতে পারেন না, তাই যখনই বাহিরে যান সঙ্গে রন্ধনের সব ব্যবস্থা লইয়া যান, এমন কি বঁটি শিল-নোড়া পর্যন্ত। মুকুন্দ রন্ধন ব্যাপারে সুদক্ষ। পুরসুন্দরীর সহকারিণী পার্বতীও ভাল রাঁধিতে পারে। সে-ও সঙ্গে আসিয়াছে। ভোরেই সে স্নান সারিয়া লইয়া দূরে বসিয়া চুল শুকাইতেছে। মেয়েটা রোগা, কিন্তু একপিঠ চুল। পার্বতী বিরুর বৃদ্ধ চাপরাশি হরদৎ সিংয়ের একমাত্র কন্যা। হরদৎ সিং সপরিবারে বিরুর কাছেই থাকিত। তাহার পত্নী-বিয়োগের পর পুরসুন্দরীই পার্বতীকে লালনপালন করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে হরদৎ সিংও মারা গেল। অনেক খরচ করিয়া বিরু পার্বতীর বিবাহও দিলেন। কিন্তু মেয়েটা দুর্ভাগিনী, বিবাহের ছয়মাস পরেই বিধবা হইয়া গেল। তখন হইতেই সে পুরসুন্দরীর কাছে কাছে। এসব অনেকদিন আগেকার কথা। পার্বতীর বয়স এখন ত্রিশ, কিন্তু এমন রোগা ছিপছিপে চেহারা যে দেখিলে মনে হয় কুড়ি বছরের বেশী নয়। খুব আদুরে। পুরসুন্দরীর দুই কন্যা চিত্রা ও স্বাতীর অপেক্ষাও বেশী প্রতাপ তাহার। হরদৎ সিং ছাপরা জেলার লোক ছিল, কিন্তু পার্বতীকে দেখিয়া সে কথা বুঝিবার উপায় নাই। সে একেবারে বাঙালিনী হইয়া গিয়াছে। পুরসুন্দরী লোকের কাছে তাহাকে চাকরাণী বলিয়া পরিচয়ও দেন না, বলেন ও আমার মেয়ে।

মুকুন্দ কফির সরঞ্জাম বাহির করিয়া কফি প্রস্তুত করিতে লাগিল। বিরু তাহার দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পায়চারি শুরু করিলেন। লম্বা প্ল্যাটফর্ম। দুই হাত পিছনে দিয়া মাথা হেঁট

করিয়া তিনি প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে গিয়া হাজির হইলেন। মুকুন্দ যে কফি করিতেছে সে কথা তিনি ভুলিয়া গেলেন। কোন একটা বইয়ে তিনি ইজিপ্টের এক ফারাওয়ের মমির যে ছবি দেখিয়াছিলেন সেই ছবিটা তাঁহার মানস-পটে সহসা ফুটিয়া উঠিল। তাহার পর মনে হইল বাবাকে তিনি যে খাতাখানা দিয়াছিলেন তাহাতে বাবা কিছু লিখিয়াছেন কি? তিনি ইতিহাসের এবং বিজ্ঞানের ছাত্র, ভাবিতে চেষ্টা করিলেন কি ভাবে লিখিলে জীবন-চরিত ঠিক ভাবে লেখা যায়। হিটাইট্ সিউমেরিয়ান মহেঞ্জোদারো প্রভৃতির ইতিহাস কি কি উপাদানের 'অভাবে অসম্পূর্ণ···চিন্তাধারা বিঘ্নিত হইল, মুকুন্দের ডাক শোনা গেল।

"বাবু, কফি ভিজিয়েছি—"

বিরু ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন পুরসুন্দরী চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতেছেন। দৃশ্যটি দেখিয়া তিনি যেন একটু আরাম পাইলেন। কাঁদা উচিত বই কি। পিতৃতুল্য শ্বশুরের সাংঘাতিক অসুখের সংবাদে বাড়ির বড় বউ যদি না কাঁদে তাহা হইলে···তাহা হইলে ঠিক যে কি হয় তাহা বিরু সহসা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও তাঁহার মনে হইল—শোকে বেসামাল হইয়া পড়াটা কি খুব শোভন? তিনি নিজে তো এখনও একফোঁটা চোখের জল ফেলেন নাই। কফির কাপে এক চুমুক দিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পুরসুন্দরীর দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর দৃষ্টিটা অন্যদিকে ফিরাইয়া লইলেন। রোরুদ্যমানা পুরসুন্দরীর দিকে চাহিয়া থাকাটাও তাঁহার নিকট বিসদৃশ বলিয়া মনে হইল। তিনি একটা ট্রাঙ্কের উপর বসিয়া পড়িলেন, কফিতে আর এক চুমুক দিয়া অন্যদিকে চাহিয়া পুনরায় হাঁটু নাচাইতে লাগিলেন। জুতা পুনরায় কোঁচ্ কোঁচ্ শব্দ করিতে লাগিল। জুতাজোড়ার দিকে একবার চাহিলেন, কিন্তু অস্বস্তিকর শব্দটা পুনরায় তাঁহাকে উঠিতে বাধ্য করিল। পুরসুন্দরীর দিকে আর একবার চকিতদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

মুকুন্দের হাতে কফির কাপটা দিয়া বলিলেন, "চল্ ওই ফলের ঝুড়িগুলোর মুখ খুলে দি। একটু হাওয়া লাগুক, তা না হলে পচে' যাবে হয়তো। ঘণ্টাখানেক পরে আবার শেলাই করে' নিলেই হবে। গুনছুঁচ আছে তো ?"

"আছে"

"চল তবে"

পুরসুন্দরীর দিকে আর একবার ফিরিয়া দেখিলেন, তাহার পর ফলের ঝুড়িগুলির দিকে অগ্রসর হইলেন।

...পুরসুন্দরী কাঁদিতেছিলেন। অশ্রু জলে তাঁহার কাপড়ের আঁচল ভিজিয়া গিয়াছিল, ক্রন্দনাবেগে সমস্ত দেহটাই কাঁপিয়া উঠিতেছিল, কিছুতেই তিনি আত্মসম্বরণ করিতে পারিতেছিলেন না। বৃদ্ধ শ্বশুরের জন্যই এ ক্রন্দন, ইহাতে কৃত্রিমতা বা ভণ্ডামি কিছুই ছিল না, কিন্তু একথাও তিনি অনুভব করিতেছিলেন যে নিজের বাবার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া যে শোকে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন,সমস্ত বুকের ভিতরটা যেমন ভাবে মুচড়াইয়া উঠিয়াছিল এখন ঠিক তেমনটা হইতেছে না। দুই চোখ দিয়া অনর্গল অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে, সূর্যসুন্দরের প্রশান্ত মুখটাও মনের মধ্যে বারবার ফুটিয়া উঠিতেছে, কিন্তু তবু তিনি অনুভব করিতেছেন এ ক্রন্দন যেন স্বতোৎসারিত নয়। বিবাহের পর হইতে যে জীবন তিনি যাপন করিয়াছেন তাহা নিজের জীবন নয়, পরের জীবন। যে সংসার-রঙ্গমঞ্চে ভাগ্যবিধাতা একদা তাঁহাকে স্থাপন করিয়াছিলেন সেই রঙ্গমঞ্চের নির্দেশ অনুসারে সারাজীবন তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা অভিনয় মাত্র। অভিনয় করিতে করিতে ক্রমশ অভিনয়টাকেই সত্য বলিয়া মনে হইয়াছে, অপরের সুখদুঃখ কালক্রমে এমনভাবে নিজের সুখদুঃখে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে যে নিজের সুখদুঃখের কথা আর মনে নাই। বিবাহের আগে কখনও ঠাণ্ডা ভাত খাইতে

পারিতেন না, কিন্তু বিবাহের পর ঠাণ্ডা ভাত খাওয়াটাই দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাড়ির পুরুষদের খাওয়া চুকিয়া গেলে তবে মেয়েদের খাওয়া হয়, ডাক্তার শ্বশুর দিনে বেলা একটা দেড়টা এবং রাত্রে এগারোটার পর বাড়ি ফিরিতেন। তাঁহার আবার থিয়েটারের শখ ছিল, কোনও কোনও দিন আরও বেশী রাত হইয়া যাইত। পুরসুন্দরী প্রায়ই না খাইয়া ঘুমাইতেন। কোন কোনদিন তিনি আড়াল হইতে গানও শুনিতেন। বাহিরের ঘরটায় এক একদিন গানের আসর বসিত। পুরসুন্দরী একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। অশ্রুধারা বন্ধ হইয়া গেল। অর্ধ-বিস্মৃত বধূ জীবনের কথাগুলি মনে পড়িতে লাগিল। উঠানের উপরে স্তূপীকৃত গম, বারান্দার একধারে মকাই, বাড়ির বাহিরের জমিটাতে সবজির বাগান, শাক বেগুন কপি লাউ কুমড়া অফুরন্ত! কত লোক যে লইয়া যাইত। জংলি গাইটার কথা মনে পড়িল। শ্বশুরের কত অদ্ভুত খেয়ালই যে ছিল। জংলি গাই পুষিয়াছিলেন। গাইটা না কি ধরা পড়িয়াছিল নেপালের জঙ্গলে। যে জমিদারের লোকজন উহাকে ধরিয়াছিল শ্বশুর মহাশয় ছিলেন তাঁহার বাড়ির ডাক্তার। জমিদার মহাশয় দুর্দান্ত জংলি গাইটির গল্প শ্বশুর মহাশয়ের নিকট করিয়াছিলেন, শ্বশুর মহাশয় একদিন গিয়া গাইটি দেখিয়াও আসিয়াছিলেন। এসব ব্যাপারে খুব উৎসাহ ছিল তাঁহার। কিছুদিন পরে জমিদারবাবু শ্বশুর মহাশয়কে জানাইলেন ওই বন্য-গাভীকে পোষা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়, সামর্থ্যে কুলাইতেছে না। দুধ দুহিতে গিয়া দুইটি গোয়ালা গুরুতরভাবে জখম হইয়াছে। মোটা মোটা দড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে। যে ঘরের খুঁটায় উহাকে বাঁধা হইয়াছে সে ঘরটির চাল ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং গাইটি তিনি জঙ্গলে ছাড়িয়া দিবেন মনস্থ করিয়াছেন। গাইটি ডাক্তারবাবুর পছন্দ হইয়াছিল, তিনি যদি চান তাহা হইলে অবশ্য গাইটি তাঁহার নিকটই পাঠাইয়া

দিবার ব্যবস্থা করা হইবে। শ্বশুর মহাশয় তাঁহার সানন্দ সম্মতি জানাইয়া পত্র লিখিয়া দিলেন। তাহার দিন কয়েক পরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা মনে পড়িলে এখনও হাসি পায়। কিন্তু সে রাত্রে পুরসুন্দরীকে সভয়ে ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিতে হইয়াছিল। পুরসুন্দরীর তখন সবে বিবাহ হইয়াছে, বয়স খুব কম, বাড়ির চারিদিকে ফাঁকা মাঠ আর জঙ্গল, সন্ধ্যার পরে এমনই গা ছম ছম্ করে। হঠাৎ গভীর রাত্রে 'রে রে রে রে' শব্দে চতুর্দিক কম্পিত হইয়া উঠিল, মনে হইল বুঝি ডাকাত পড়িয়াছে। পরে জানা গেল ডাকাত নয়, জংলি গাই আসিতেছে। তাহার শিঙে নাকে, এবং গলায় শক্ত দড়ি বাঁধা, তবু জন দশেক বলিষ্ঠ লোককে টানিতে টানিতে লইয়া আসিয়াছে। বাছুরটি বেশ বড়, এদেশের ছোট দেশী গরুর মতো, অথচ বয়স মাত্র ছয়মাস। সে রাত্রে, সে কি কাণ্ড। বাড়িসুদ্ধ লোক উঠিয়া পড়িল, যতগুলি লণ্ঠন ছিল সব জ্বালা হইল! বাড়ির সম্মুখে যে আমগাছটা ছিল তাহাতে ভারী লোহার শিকল দিয়া জংলি গাইকে শক্ত করিয়া বাঁধিবার পর শাশুড়ি বলিলেন, "ওর কপালে সিঁদুর আর খুরে জল দিতে হবে, সেটার ব্যবস্থা কর। তা নাহলে গেরস্তর অকল্যাণ হবে যে—"। শ্বশুর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"জল ছুঁড়ে ছুঁড়ে দাও। কিম্বা পিচ্‌কিরি করেও দিতে পার। কিন্তু সিঁদুর দিতে হলে ওই আমগাছে ওঠা ছাড়া উপায় নেই। ওই নীচু গাছটায় যদি উঠতে পার তাহলে ওখান থেকে ওর মাথার উপর সিঁদুর লাগানো শক্ত হবে না। পারবে উঠতে? এককালে তো পারতে—" শাশুড়ি ঝাঁজিয়া বলিলেন, "কি যে বল তার ঠিক নেই। ছেলেবেলায় পাবতাম বলে' এই বুড়ো বয়সেও পারব না কি। পা হড়কে গেলে আর রক্ষে থাকবে না—"

"তাহলে উদিৎ সিং উঠে দিয়ে দিক"

উদিৎ সিং ছিল বাড়ির রক্ষক, সমস্ত চাকরদের কামতি অর্থাৎ সরদার। উদিৎ সিংয়ের চেহারাটা পুরসুন্দরীর মনে পড়িল। রোগা

পাতলা ছোটখাটো মানুষটি। কিন্তু কি প্রতাপ ছিল তাহার। গলার স্বর ছিল তীক্ষ্ণ সরু, চটিয়া গেলে ছোট চক্ষু দুইটি হইতে আগুনের ফুলকি বাহির হইত যেন। রগের শিরাগুলা ফুলিয়া উঠিত। নিষ্ঠাবান ক্ষত্রিয় ছিল সে। কাহারও ছোঁয়া-জলে স্নান পর্যন্ত করিত না। একটি ছোট কুঁড়ে ঘরে সে আলাদা থাকিত, স্বহস্তে রাঁধিয়া খাইত। দিনের বেলা রাঁধিত না। চিঁড়ে দই, ছাতু বা বেলের সময় বেল, আমের সময় আম বা ওই ধরনের কিছু খাইয়া কাটাইয়া দিত। রান্না করিত সন্ধ্যার পর। শাশুড়ি তাহাকে এক ঘটি দুধ রোজ দিতেন। তখন বাড়িতে দশ বার সের দুধ হইত। দুধটাই ছিল উদিৎ সিংয়ের প্রধান আহার। গোয়ালার পিছনে মোতায়েন হইয়া প্রত্যহ সে দুধ দুহাইত। শ্বশুরমহাশয়কে দেবতার মতো ভক্তি করিত সে। তাঁহার আদেশে যে কোনও মুহূর্তে যে কোনও বিপদের সম্মুখীন হইতে আপত্তি ছিল না তাহার। বরং বিপদ যত বেশী হইত তাহার উৎসাহ বাড়িত। জংলি গাইয়ের মাথায় সিঁদুর দিতে হইবে এবং সে গুরু-ভার তাহার উপর অর্পিত হইয়াছে এই আনন্দে সে সগর্বে আগাইয়া আসিল। শাশুড়ি কিন্তু খুঁত খুঁত করিতে লাগিলেন এ পর্যন্ত বাড়ির সমস্ত গাভীকে, এমন কি মহিষকেও তিনি স্বহস্তে সিন্দুর দিয়া বরণ করিয়াছেন; অন্যরূপ করিলে অমঙ্গল হইবে না তো। উদিৎ সিংই শেষ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান করিল। সে বলিল, মাইজি বাঁশের সিঁড়ি দিয়া গাছের উপরে উঠিয়া যান, আমরা সিঁড়িটা শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিতেছি। তাহাই হইল, শাশুড়ি গাছের উপর উঠিয়াই জংলি গাইয়ের মাথায় সিঁদুর দিলেন।

পুরসুন্দরীর হঠাৎ দুর্গাদাস এবং জাম্বুবানের কথা মনে পড়িল। দুর্গাদাস কাকাতুয়া এবং জাম্বুবান অ্যালসেশিয়ান কুকুর। তাহাদের সঙ্গেই লইয়া আসিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বিরু রাজি হইলেন না। পুরসুন্দরীর আর একবার মনে হইল তাঁহার ইচ্ছার কোনও মূল্য কেহ কখনও দেয় না; এমন কি তাঁহার ছেলেমেয়েরাও না।

সকলেই নিজের খুশী অনুসারে সব কিছু করিতে চায়। এই কিছুদিন আগেই গগন কি কাণ্ডটাই না করিল। তরকারিতে ধনে-পাতা দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া তরকারিটা স্পর্শ পর্যন্ত করিল না। অথচ ধনে পাতা তাঁহার নিজের খুব প্রিয়। বিরুও প্রথমে ধনে'পাতা পছন্দ করিতেন না, এখন একটু একটু খান। স্বামীর মনোরঞ্জনার্থে তাঁহাকেও 'চীজ' খাইতে হয়—কি দুর্গন্ধ জিনিসটা, ঠিক পচা সরের মতো। কিন্তু তবু খাইতে হয়, উপায় নাই। উষাকে ভালো একটা পানের বাটা কিনিয়া পাঠাইয়াছিলেন, উষার পছন্দ হয় নাই, অমন সুন্দর মিনার-কাজ-করা জিনিষটা না কি জড়বৎ! সন্ধ্যার পছন্দও ঠিক দিদির মতো। মায়ের যাহা ভালো লাগে তাহার তাহা লাগে না। পূজার সময় অমন দামী বেনারসী শাড়িটা কিনিয়া দিলেন, মেয়ের নাকি পছন্দ হয় নাই। রং নাকি বেশী ঘোরালো। (অমন চমৎকার মেরুন রঙের বেনারসী দেখা যায় না প্রায়), পাড় নাকি বেশী চওড়া (আজকাল সরু পাড়ই না কি ফ্যাসন), তা ছাড়া কাপড়টা নাকি বড় ভারী। শুনিলে হাসি পায়। আসল জরির কাজ করা বেনারসী শাড়ি, হালকা হয় কখনও। তাই আজকাল আর মেয়েদের কিছু কিনিয়া পাঠান না তিনি, টাকা পাঠাইয়া দেন। ছোট-ছেলে দিগন্ত অবশ্য তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ বড় একটা করে না। যাহা খাইতে দেন তাহাই খায়, যাহা পরিতে বলেন তাহাই পরে। কিন্তু পুরসুন্দরীর মনে হয়—খাওয়া পরার দিকে তাহার তেমন লক্ষ্যই নাই, ওসব বড় একটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, যন্ত্রচালিতবৎ করিয়া যায়, করিতে হয় বলিয়া করে। তাহার মন কেবল বইয়ে। যখনই যেখানে থাকে, বই হাতে লইয়া বসিয়া থাকে। কাপড় জামা জুতা কিছুরই শখ নাই, শখ কেবল বই কেনার। ইন্‌শিওরেন্স কোম্পানীর ভালো একটা চাকরি ছাড়িয়া তাই প্রফেসারি করিতেছে। সহসা তাহার জন্য পুরসুন্দরীর মন কেমন করিতে লাগিল। অনেক দিন তাহাকে দেখেন নাই। পূজার ছুটির সময় আসিয়া মাত্র দিন কয়েক

ছিল। এই প্রসঙ্গে ললিতবাবুর মেয়ে নন্দার কথাও মনে পড়িল। নন্দার সহিত দিগন্তের বিবাহ দিবার জন্য ললিতবাবু অনেকদিন হইতেই অনুরোধ করিতেছেন। নন্দা মেয়েটিও ভালো, বি-এ পড়িতেছে, সুশ্রী। কিন্তু দিগন্ত এখন কিছুতেই বিবাহ করিতে চাহিতেছে না। বলিতেছে ডক্‌টরেটের জন্য একটা থীসিস লইয়া সে ব্যস্ত আছে, তাহা শেষ না করিয়া আর কোনদিকে সে মন দিবে না। আজকালকার ছেলেদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা রকমের।···একটা খাবারের ফেরিওলা খাবারের গাড়িটা ঠেলিতে ঠেলিতে তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সদ্য-ভাজা জিলাপিগুলি দেখিয়া তাঁহার স্বাতীর কথা মনে হইল। মেয়েটা গরম গরম জিলাপি খাইতে বড় ভালবাসে। চিত্রাও বাসে। ডালমুটও চিত্রার খুব প্রিয়। অথচ উনি বাজারের জিনিস কেনা পছন্দ করেন না। তাই তাঁহাকে বাড়িতে ময়রা ডাকাইয়া জিলাপি ও ডালমুট তৈরী শিখিতে হইয়াছে। ওঁরও খাওয়ার শখ কম ছিল না। কিন্তু বাজারের বা হোটেলের কোনও জিনিস কখনও খান নাই, সবই তাঁহাকে বাড়িতে প্রস্তুত করিয়া দিতে হইয়াছে। ইহার জন্য কত বই পড়িয়াছেন, কত বাবুর্চি (এমন কি গোয়ানিজ বাবুর্চি পর্যন্ত) রাখিয়াছেন, কত লোকের কাছে কত খোশামোদ করিয়া নূতন নূতন রান্না শিখিয়াছেন। অনেকে আবার শিখাইতে চায় না। মিসেস রায়ের কথা মনে পড়িল। সামান্য ফ্রেঞ্চ কাটলেট শিখাইতে কি বেগই না দিয়াছিলেন ভদ্রমহিলা। শেষ পর্যন্ত শিখানই নাই—ফিরপোর এক রাঁধুনী শেষে তাঁহাকে শেখায়। মনে পড়িল ইদানীং শ্বশুর তাঁহার হাতের নিরামিষ রান্না খুব পছন্দ করিতেন। যখনই শ্বশুরের কাছে থাকিয়াছেন তাঁহাকে প্রত্যহ সুক্তো ও ঘণ্ট রাঁধিতে হইয়াছে। শ্বশুর ইদানীং মাছ-মাংস প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু পুরসুন্দরী প্রথমে যখন বধূ হইয়া আসেন তখন বাড়িতে মাছ-মাংসের খুব ধুম, তাল তাল মশলা বাটা, পেঁয়াজ রসুন গরম মশলার গন্ধে বাড়ি

ভরপুর। শ্বশুর গরগরে মশলা-দেওয়া ঝাল-ঝাল মাংস পছন্দ করিতেন। কোথায় গেল সে সব দিন। পুরসুন্দরীর মনে অতীত-জীবনের নানা ছবি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। স্টেশন ইয়ার্ডের একধারে যে মাল গাড়িটা দাঁড়াইয়াছিল তাহার দিকে একদৃষ্টে তিনি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মালগাড়িটা দেখিতেছিলেন না, ভাবিতেছিলেন গগন কি চম্পাকে লইয়া আসিবে ? সে আসন্নপ্রসবা, বাপের বাড়িতে আছে, এ অবস্থায় তাহাকে না আনাই উচিত, কিন্তু গগন যে রকম গোঁয়ার তাহাকে হয়তো লইয়া আসিবে। ট্রেনে যা ভীড় আজকাল…। কিন্তু এ চিন্তা তিনি বেশীক্ষণ করিতে পাইলেন না। ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। পশ্চিম হইতে একটা গাড়ি আসিতেছে।

বিরু ফলের ঝুড়িগুলি খুলিয়া ফলগুলিতে হাওয়া লাগাইতেছিলেন। ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া তিনি ডিস্ট্যাণ্ট সিগনালের দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিলেন। তাহার পর কোটের বোতামগুলি লাগাইয়া ফেলিলেন। ফলের ঝুড়িগুলি লইয়া টানাটানি করিবার সময় বোতামগুলি নিজেই তিনি খুলিয়া ছিলেন। মুকুন্দের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “তুই ফলগুলার কাছে দাঁড়িয়ে থাক। আমি গাড়িটা দেখি কেউ এল কিনা।” পুরসুন্দরীর দিকে একবার চাহিয়া কিছুদূর তিনি আগাইয়া গেলেন। আবার ফিরিয়া আসিলেন। পুরসুন্দরীর কাছে গিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিলেন, “আমি গাড়িটা দেখি গিয়ে। ওরা যদি কেউ আসে ওদের সামনে কান্নাকাটি কোরো না। কাঁদবার কি আছে এতে। তোমাকে কাঁদতে দেখলে সবাই মুষড়ে পড়বে। বাবার কঠিন অসুখ তো আর একবার হয়েছিল, গিয়ে দেখবে হয়তো সেরে গেছে সব।” গলার বোতামটা আবার তিনি খুলিয়া ফেলিলেন। গলার কাছটায় কেমন যেন আঁট আঁট মনে হইতেছিল। আর কিছু

না বলিয়া তিনি হন হন করিয়া ওদিকের প্ল্যাটফর্মের দিকে চলিয়া গেলেন।

…গাড়িতে অসম্ভব ভীড়। গগন, দিগন্ত, স্বাতী বা সোমনাথ কাহাকেও তিনি দেখিতে পাইলেন না। কেহই আসে নাই। না আসিবার মানে? গগন বৌমাকে আনিবার জন্য পাটনায় নামিয়া পড়িল না কি। দিগন্তও হয়তো তাহার সঙ্গে আছে, দিগন্তকে গগন হয়তো খবর দিয়াছিল। স্বাতী-সোমনাথ হয়তো কাটিহার দিয়া গিয়াছে। কয়েকটা 'হয়তো'র কবলে পড়িয়া বিরু একটু বিব্রত বোধ করিতেছিলেন। ভীড় বাঁচাইয়া হুইলার কোম্পানীর দোকানের কোণে দাঁড়াইয়া তিনি হাত দুইটি মুঠা করিতেছিলেন এবং খুলিতেছিলেন। সারাজীবন তিনি নানা রকম 'হয়তোকে' কেন্দ্র করিয়াই গবেষণা করিয়াছেন। একটা মাথার খুলি বা বাসনের টুকরামাত্র সম্বল করিয়া তিনি প্রাগৈতিহাসিক মানবসমাজের সম্বন্ধে কত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, কখনও বিব্রত বোধ করেন নাই। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারে তিনি বেশ একটু বিচলিত বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ছেলে-মেয়েরা শেষ পর্যন্ত যদি না আসে বড় বিশ্রী ব্যাপার হইবে। আর একবার তাহাদের টেলিগ্রাম করিবেন কিনা একথাও তাঁহার মনে হইল।

"এই যে দাদা এখানে—"

বিরু ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন তাঁহার বোন কিরণ। অবাক হইয়া গেলেন। কিরণের স্বামী মাত্র একমাস আগে বদলি হইয়া গিয়াছিল। তাহার ঠিকানা বিরু জানিতেন না, তাই তাহাকে টেলিগ্রাম করিতে পারেন নাই। অপ্রত্যাশিতভাবে কিরণ আসিয়া গেল। কিরণের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন তিনি খানিকক্ষণ। কিরণের মাথার সামনের দিকে চুলে কি লাগিয়াছে? চুন? পরমুহূর্তেই বুঝিতে পারিলেন। চুল পাকিয়া গিয়াছে। আশ্চর্য,

একধারের চুল অমনভাবে পাকিয়া গেল কেন। অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন। কিরণ যখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অশ্রুসজল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবার খবর কি দাদা?" তখন তিনি আত্মস্থ হইলেন।

"কি জানি। আমি তো এখানে ট্রেনের গোলমালে আটকে পড়েছি। তুই খবর পেলি কি করে'। আমি তো তোদের নূতন ঠিকানা জানতাম না তাই খবর দিতে পারি নি।"

"আমি কুমারের টেলিগ্রাম পেয়ে আসছি। কুমার ঠিকানা জানত"।

"কোথায় বদলি হয়েছিস আজকাল"

"দেরাদুনে"

"কার সঙ্গে এলি? ঘণ্টুর সঙ্গে?"

"না, ঘণ্টু তো মিলিটারিতে জয়েন করেছে শোন নি? তাকে একটা খবর দিয়ে আমরা চলে এসেছি, ওঁর সঙ্গেই এসেছি, উনি ছুটি নিয়েছেন।"

"কেষ্টও এসেছে না কি, কই"

"জিনিসপত্তর নামাচ্ছেন বোধ হয়। ওই যে।"

কুলির সারির পিছনে কিরণের স্বামী কৃষ্ণকান্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সার্থকনামা ব্যক্তি। কুচকুচে কালো রং, মোটাসোটা গোলগাল চেহারা। ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টে চাকুরি করেন। বিরুকে দেখিয়া একটু মৃদু হাসিলেন, তাহার পর হেঁট হইয়া প্রণাম করিলেন। সাহেবী পোষাক পরা ছিল, প্রণাম করিতে গিয়া প্যাণ্টের একটা বোতাম ছিঁড়িয়া গেল।

বিরু বলিলেন, "আমরা ওধারের প্ল্যাটফর্মে আছি। তোমরাও চল। এখন কতক্ষণ পরে যে সাহেবগঞ্জের গাড়ি পাওয়া যাবে তার ঠিক নেই। স্টেশন মাস্টারও কিছু বলতে পারছে না।"

৩

বিরু রাত্রের গাড়িতে তো আসেনই নাই, সকালের গাড়িতেও আসিলেন না। আর কেহও আসিল না। মনে মনে একটু চিন্তিত হইলেও কুমার খুব বেশী দমিয়া যায় নাই, কারণ বাবা আজ সকাল হইতে অনেকটা ভাল আছেন। অনেকটা ফলের রস খাইয়াছেন, বেশ ভালো ভাবে কথা বলিয়াছেন, কথার জড়তা-ভাব অনেকটা কমিয়াছে। পায়ের দুই একটা আঙুলও নাড়াইতে পারিয়াছেন। কুমার বাবাকে ফলের রস খাওয়াইয়া বাহিরের ঘরে বসিয়া চা খাইতেছিল। সম্মুখে উৎসুকদৃষ্টিতে কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল ছুঁচকি ও ল্যাংল্যাং। কুমার মাঝে মাঝে তাহাদের রুটির টুকরা ছুঁড়িয়া দিতেছিল এবং বকিতেছিল।

"এতো লোভী কেন! শজারুর মাংস তো একগাদা খেয়েছ। দাদারা কেউ এল না, দুপুরেও তো অনেক খাবে—"

ছুঁচকি তাহার সূচালো মুখটা আরও সূচালো করিয়া কান দুইটি খাড়া করিয়া কুমারের মুখের দিকে সাগ্রহে তাকাইল। মনে হইল এখনি যেন কথা কহিবে। ল্যাংল্যাং কিন্তু অন্য ভাব প্রকাশ করিল। তাহার সমস্ত মুখটা যেন হাসিতে ভরিয়া গেল, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহর্ষে ল্যাজ নাড়িতে লাগিল, তাহার কোমরটা পর্যন্ত দুলিতে লাগিল। ভাবটা কুমার যেন একটা রসিকতা করিয়াছে এবং সে তাহা সানন্দে উপভোগ করিতেছে। পরমুহূর্তেই কিন্তু দুই জনে ঘেউ ঘেউ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কুমার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল পিওন। লোকটা নূতন আসিয়াছে, ছুঁচকি ল্যাংল্যাং এখনও তাহাকে ভাল করিয়া চেনে না, তাছাড়া লোকটার প্রকাণ্ড গোঁফ থাকাতে চেহারাটাও দুষমনের মতো।

পিওন বলিল, "টেলিগ্রাম—"

কুমার তাড়াতাড়ি উঠিয়া টেলিগ্রামটা খুলিয়া পড়িল। কিউল হইতে বিরু টেলিগ্রাম করিয়াছেন। লিখিয়াছেন, ট্রেনের গোলমালের জন্য এখানে আটকাইয়া পড়িয়াছি, বাবা কেমন আছেন অবিলম্বে জানাও। আরজেন্ট রিপ্লাই-প্রিপেড. টেলিগ্রাম। কাল সন্ধ্যাবেলাই আসিয়াছিল। এত বিলম্বে দিল কেন ?

"টেলিগ্রাম কাল রাত্রে এসেছে, এতক্ষণে দিচ্ছ ?"

পিওন বলিল, "রাত্রে কোনও পিওন থাকে না। কে নিয়ে আসবে।"

কুমারের মনে পড়িল পোস্টাফিসে পোস্টমাস্টারও নূতন লোক আসিয়াছেন। আগের পোস্টমাস্টার থাকিলে নিজেই আসিয়া টেলিগ্রামটি দিয়া যাইতেন। কুমার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সহি করিয়া দিল, কিছু বলিল না। যাহা করিবার সে যথাসময়ে করিবে।

পিওন চলিয়া গেল।

"গঙ্গা, গঙ্গা—"

গঙ্গার সাড়া পাওয়া গেল না।

সামনের ফুলবাগানে মধুর ছোট ছেলে 'এতবারিয়া' গাছের গোড়া খুঁড়িতেছিল। সে ছুটিয়া আসিল।

"গঙ্গা চৌকি নামাচ্ছে"

"চৌকি ! কোথাকার চৌকি ?"

"রাধাবাবু কোথা থেকে আনিয়েছেন, ঠিক জানি না!"

রাধানাথ গোপ নিজের প্রতিশ্রুতি অনুসারে খুব ভোরে আসিয়া কাজে লাগিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা বাড়ির সম্মুখে যে মাঠটা পড়িয়া আছে তাহাতে আট দশটা চালা করিয়া দেওয়া হোক, প্রকাণ্ড একটা সামিয়ানা টাঙাইয়া তাহার নীচে কতকগুলি চৌকিও তিনি পাতিয়া দিতে চান। দূর হইতে বাহিরের লোক যদি আসে, আসিবেই, তাহারা বসিবার শুইবার জায়গা পাইবে।

আত্মীয় স্বজন যাহারা আসিবেন তাহাদের জন্য গোটা দশ বারো তাঁবুর ব্যবস্থা করিতে হইবে, কারণ সকলে আসিলে বাড়িতে কুলাইবে না। বাড়িতে মাত্র পাঁচখানি ঘর। ডাক্তারবাবুর নিজের ছেলে-মেয়েরা আছে, ভাই আছে, ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা আছে, অন্যান্য আত্মীয় স্বজনরা আছে। এ খবর পাইলে সকলেই আসিবে, সকলকে স্থান দিতে হইবে তো। দূরদর্শী রাধানাথ ভোরে আসিয়াই কুমারকে একথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার এই বিরাট পরিকল্পনা শুনিয়া কুমার একটু ভীত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু রাধাবাবু তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন, আমি সব করব। আমারও কর্তব্য এটা—"

সুতরাং কুমারকে বলিতে হইয়াছিল, "বেশ, যা ভাল বোঝেন করুন তাহলে। আমাকে যা বলবেন তাই করব"

"তুমি বাবার কাছে বসে থাক কেবল, তোমাকে আর কিছু করতে হবে না"

তাহার পর নিম্নকণ্ঠে তিনি একটি প্রয়োজনীয় কথা পাড়িলেন।

"এখানকার নতুন ডাক্তারবাবুটির উপর তোমাদের বিশ্বাস আছে তো? না থাকে তো কোলকাতা থেকে কাউকে আনাও। যা হবার অবশ্য তাই হবে, ওঁর আশীর উপর বয়স হয়েছে—এখন যদি উনি যানও আমাদের ক্ষোভের কিছু থাকবে না। কিন্তু আমাদের কর্তব্যে যেন ত্রুটি না হয়"

"না, নতুন ডাক্তারবাবুটিকে তো ভালই মনে হচ্ছে। বারবার এসে দেখে যাচ্ছেন। ওঁর চিকিৎসায় কিছু ফলও হয়েছে, বাবা আজ অনেকটা ভালো আছেন"

"বাঃ, তাই না কি"

রাধানাথ গোপ বাম করতলটি মুখের উপর চাপিয়া ধরিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আমার মনে হয় তবু সিভিল সার্জনকে খবর দাও একবার, তিনি এসে দেখে যান"

"বেশ। দশটার ট্রেনে লোকই পাঠিয়ে দিচ্ছি একটা"

"তাই দাও। আমি গিয়ে ওদিককার কাজে লেগে পড়ি তাহলে"

দ্রুতপদে তিনি চলিয়া গেলেন, কিছুদূর গিয়া ফিরিয়া আসিলেন আবার।

"তোমাদের বাঁশ আছে?"

"আছে কিছু"

"কিছু আছে তো? আমিও দু'গাড়ি বাঁশ আর কিছু খড় পাঠিয়ে দিয়েছি। এখুনি এসে পড়বে। দরকার হয় যদি তোমার কাছ থেকেও কিছু বাঁশ নেব। জনমজুর এসে গেছে, আমি ততক্ষণ জায়গাটা সাফ করিয়ে ফেলি"

রাধানাথ গোপ তখন হইতেই জনমজুর লইয়া ব্যস্ত আছেন। কুমার আর ওদিকে যায় নাই, বাবার মুখ-ধোয়ানো প্রভৃতি লইয়া ব্যস্ত ছিল। গঙ্গা চৌকি নামাইতেছে শুনিয়া কুমার উঠিয়া পড়িল। গঙ্গাকে এখনি পোস্টাফিসে পাঠাইতে হইবে। চাকর দিয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলে রাধানাথবাবু যদি কিছু মনে করেন তাই নিজেই সে গেল।

রাধানাথ প্রায় জন কুড়ি মজুর, প্রচুর বাঁশ-খড়, কোদাল-শাবল, কাটারি-দড়ি প্রভৃতি লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। কুমার গিয়া দেখিল গোটাচারেক গরুর গাড়িতে চৌকি আসিয়াছে, গঙ্গা চাকরদের সহায়তায় সেগুলি নামাইতেছে।

রাধানাথবাবুর সহিত চোখোচোখি হইতেই কুমার বলিল, "দাদার টেলিগ্রাম এসেছে, ওঁরা কিউলে আটকে পড়েছেন, ট্রেনের কনেক্‌শন পান নি। টেলিগ্রামটা কাল সন্ধ্যেবেলা এসেছে, এতক্ষণে ডেলিভারি দিয়ে গেল। বলছে—পিওন ছিল না, তাই পাঠাতে পারে নি। আগের পোস্টমাস্টারবাবু থাকলে নিজেই এসে দিয়ে যেতেন"

গোপ মহাশয় নির্নিমেষে ক্ষণকাল কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "এও যাবে। যে লোক সদরে

সিভিল সার্জনকে ডাকতে যাচ্ছে সে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে' যায়। আমি তার হাতে একটা চিঠি দেব"

"আচ্ছা। দাদাকে আগে টেলিগ্রামটা করে' দিই, দাদা কিউল থেকে রিপ্লাই প্রিপেড টেলিগ্রাম করেছেন"

"সেখানে কোন ঠিকানায় টেলিগ্রাম করবে"

"কেয়ার অফ. স্টেশন মাস্টার"

"বিরুবাবুর সবই বিচিত্র কাণ্ড"

রাধানাথ গোপের গম্ভীর মুখে হাসির আভাস জাগিল।

"গঙ্গাকে একটু ছুটি দেবেন? ও গিয়ে টেলিগ্রামটা করে' আসুক"

"হ্যাঁ, ও যাক না। গিরিধারী তুমি চৌকিগুলো নাবাও"

"আমাকে যদি কিছু করতে হয় বলুন"

"বলেইছি তো, তুমি তোমার বাবার কাছে চুপ করে' বসে থাক গিয়ে। আজ বিকেলের মধ্যেই আমি সব ঠিক করে' দিচ্ছি, তুমি দেখ শুধু বসে' বসে'। ভাল কথা, চন্দরবাবুকে খবরটা দিয়েছ তো—"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই"

"কোথা আছেন তিনি আজকাল, অনেকদিন দেখি নি তাঁকে"

"পুরীতে আছেন—"

"যদি আসেন, আসবেন তো নিশ্চয়ই, তাহলে দেখাটা হয়ে যাবে অনেকদিন পরে। আমি ওঁর ছাত্র তা জান তো, এখানে যখন প্রথম মাইনার স্কুল হয়, তখন উনিই হেড মাস্টার হ'য়েছিলেন। ও রকম মাস্টার আমি দেখি নি। দু' ভাইই অদ্ভুত—"

চন্দ্রসুন্দর সূর্যসুন্দরের একমাত্র ছোট ভাই।

গঙ্গা কুমারের সঙ্গে চলিয়া আসিল।

"তুই টেলিগ্রামটা পোস্টাফিসে দিয়ে আয়"

সে বলিল, “রাধানাথবাবু যা কাণ্ড লাগিয়েছেন শেষে তোমাকে বিপদে না ফেলেন”

“কি বিপদ”

“শেষকালে যদি বলেন এসব করতে দু’শ পাঁচশ’ টাকা খরচ পড়েছে—

“না, না—তা কি বলেন কখনও”

“কিছুই আশ্চর্য নয়। খগেনবাবুর মেয়ের বিয়েতে বরযাত্রী দেখাশোনা করবার সব ভার উনি নিয়েছিলেন। এমনি নিজে যেচেই নিয়েছিলেন। বিয়ে শেষ হয়ে যাবার ছ’মাস পরে উনি খগেনবাবুকে জানালেন যে বরযাত্রীদের জন্য তাঁর তিনশ’ টাকা খরচ হয়েছে। খগেনবাবু বেচারাকে দিতে হ’ল টাকাটা। অথচ বরযাত্রী ছিল মাত্র পঁচিশ জন—

“খরচ নিশ্চয় পড়েছিল—”

“তুমি রাধানাথবাবুকে চেন না। উনি সব জায়গায় বাহাদুরি করে’ এগিয়ে যাবেন, তারপর তার থেকে লাভ করবার চেষ্টা করবেন”

“কি যা তা বলছিস ভদ্রলোকের নামে”

“দেখো শেষে—”

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গঙ্গা পুনরায় বলিল—“বাবার অসুখ করেছে তাতে এমন ধুমধাম করে’ ঘরবাড়ি বানাবার কি আছে। কেউ যদি আসে, বাইরের বৈঠকখানায় বসবে—খবর নিয়ে চলে যাবে। এত ঘর বানাবার দরকার কি”

“দরকার আছে। ঘর না থাকলে বেশী লোক এলে মুশকিল হবে। আমাদের বাড়িরই যদি সবাই আসে জায়গা দিবি কোথা। বেশী কয়েকটা ঘর থাকা ভাল—”

“তাহলে এক কাজ কর তুমি। ঘর তৈরি করতে যা খরচ হচ্ছে

তা নগদ হিসেব করে' এখনি দিয়ে দিও। ছ'মাস পরে তোমার কিছুই মনে থাকবে না"

"আচ্ছা, সে যা হয় করা যাবে। তুই এখন টেলিগ্রামটা দিয়ে আয়। ট্রেনের গোলমালে দাদাকে নিশ্চয় অনেকক্ষণ কিউলে থাকতে হবে, তা না হলে টেলিগ্রাম করত না। টেলিগ্রামটা কাল রাত্তির থেকে এসে পড়ে আছে, এতক্ষণে দিয়ে গেল। নতুন পোস্ট-মাস্টারটি লোক সুবিধের নয়"

"তাই না কি !"

গঙ্গা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল। কুমার টেলিগ্রাম লিখিতে-ছিল কোনও জবাব দিল না। গঙ্গাও আর কিছু বলিল না, টেলিগ্রামটা লইয়া চলিয়া গেল। গঙ্গা চলিয়া যাইবার পর সাইকেলে চড়িয়া সুকুমার হাজির। সুকুমার স্টেশন মাস্টারের ছেলে।

"জ্যাঠামশাই কেমন আছেন আজ"

"কালকের চেয়ে অনেকটা ভাল। কথা অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। খেয়েওছেন"

"তাহলে বালুয়াচকে চলুন না। সেখানে যা হাঁস বসেছে দেখে এলাম, একটা ফায়ার করলে অন্তত পঞ্চাশটা পড়বে। হাজার হাজার বসে' আছে। চলুন না, যাবেন ?"

"এখন কি করে' যাই বল"

"জ্যাঠামশাই তো ভাল আছেন বললেন"

"তবু একজন কাছে থাকা দরকার সর্বদা। দাদারা আসুক, তারপর যাওয়া যাবে একদিন"

"আমাকে সঙ্গে নেবেন কিন্তু"

"বেশ"

"বাবা বললেন—কোন-কিছু যদি দরকার থাকে খবর দিতে"

"এখন তো কোন দরকার নেই, হ'লে নিশ্চয় পাঠাব"

"আচ্ছা"

সুকুমার আবার বাইকে চড়িয়া চলিয়া গেল। যদিও স্টেশন মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ, তবু সুকুমার যখনই আসে বাইকে চড়িয়া আসে। বাইকটি নূতন কিনিয়াছে।

কুমার ভিতরে গেল। উর্মিলা ভিজা ন্যাকড়া দিয়া সূর্যসুন্দরের চোখের কোণ পরিষ্কার করিয়া দিতেছিল। কুমারকে দেখিয়া সূর্যসুন্দর ঘাড় ফিরাইলেন।

"বিরুর কোন খবর আসে নি ?"

"খবর এসেছে। কিউলে ট্রেন মিস্ করে' দাদা টেলিগ্রাম করেছে। আজ রাত্রে কিম্বা কাল সকালে এসে পড়বে নিশ্চয়"

"আর কারু খবর আসে নি ?"

"না"

সূর্যসুন্দর ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। একটু অন্যমনস্ক হইয়াও পড়িলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইল, শেষ সময়ে সকলের সহিত দেখা হইবে তো ? অন্তরের ভিতর হইতে কে যেন তাঁহাকে আশ্বাস দিল, হইবে। পৃথ্বীশও আসিবে। পৃথ্বীশ প্রায় সাত-আট বছর আগে গৃহত্যাগ করিয়াছে। কেন করিয়াছে কেহ জানে না। কোথায় আছে, কি করিতেছে কোনও খবরও সে দেয় না। সূর্যসুন্দরের মনে হইল সে-ও আসিবে। কুমারের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "আজ অনেকটা ভাল আছি"

"রাধাবাবু এসেছেন। তিনি বলছেন, সিভিল সার্জনকে আনিয়ে একবার দেখাতে। আজ এগারোটার ট্রেনে নবীনকে পাঠিয়ে দেব ভাবছি"

"ভালো তো আছি। কি দরকার তাঁকে কষ্ট দিয়ে"

"তবু একবার দেখে যান"

"হাসপাতালের ডাক্তারবাবুকে জিগ্যেস করে' তিনি যদি মত দেন, তাহলেই সিভিলসার্জনকে খবর দিও। তাঁর কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে যাও বরং"

"আচ্ছা—"

কুমার অনুভব করিল—বাবার মনে প্রফেসনাল এটিকেটের কথা যখন জাগিতেছে তখন জ্ঞানের মধ্যে আর কোনও আবিলতা নাই। কাল সন্ধ্যার সময় বাবার জ্ঞান এত পরিষ্কার ছিল না। সে নিশ্চিন্ত মনে বাহিরে চলিয়া গেল। ডাক্তারবাবুর সহিত কথাবার্তা কহিয়া তাঁহার চিঠি লইয়া সিভিলসার্জনের কাছে লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

কুমার চলিয়া গেলে সূর্যসুন্দর উর্মিলাকে বলিলেন, "মা, তুমি উঠে মুখ হাত ধুয়ে এস। সারারাতই তো মাথার শিয়রে বসে আছ"

"না, আমি ঘুমিয়েছি তো"

"কোথায় ঘুমুলে"

"আপনার মাথার শিয়রেই ঘুমিয়েছিলাম। এখানে অনেকটা জায়গা আছে যে"

"চা খেয়েছ?"

"এইবার খাব। বিজলী আসছে, সে এলে তাকে বসিয়ে যাব"

"বিজলী কে"

"রমেশ কাকার নাতনী"

"ও, সে এসেছে নাকি"

"পরশু এসেছে"

সূর্যসুন্দর চক্ষু দুইটি ধীরে ধীরে বুজিলেন, কথা কহিয়া তিনি যেন একটু ক্লান্তি অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার স্মৃতিপটে বিজলীর ছেলে-বেলার ছবিটা ফুটিয়া উঠিল। ফ্রক-পরা বিনুনি-দোলানো ছোট মেয়ে একটি। বাড়িতে তখন একটি টিয়া পাখী ছিল, টিয়া-পাখীর খাঁচাটির কাছে ঘুরঘুর করিত। চন্দরের বন্ধু রমেশ। সূর্য-সুন্দরই তাহাকে জমিদারি সেরেস্তায় ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন। রমেশের ছেলে সুখেন্দু (কোথায় আছে সে এখন?)। রমেশ যখন প্রথম

এখানে আসে সুখেন্দুর বয়স একবৎসর। সেই সুখেন্দুর মেয়ে বিজলী এখন যুবতী। সময় কত দ্রুত চলিয়া যায়···সূর্যসুন্দর আর ভাবিতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

নবীনকে সিভিলসার্জনের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া কুমার চাকরদের মাঠে পাঠাইয়া দিল। আখের ক্ষেত, গমের ক্ষেত প্রভৃতিতে যেসব কাজ বাকী ছিল সেগুলি সারিয়া তাহারা যেন তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরিয়া আসে। বাড়িতে সদা-সর্বদা লোক থাকা দরকার। অক্লান্তকর্মী রাধানাথ একটা চালাঘর প্রায় খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন, বাড়ির পিছনের দিকের মাঠে গোটা দুই তাঁবুও খাটানো হইয়া গিয়াছে। কিছু কাজ করিতে পারিলে কুমারের মনটাও অবলম্বন পাইয়া স্থির হইত। মাঠে অনেক কাজ, কিন্তু বাবাকে ফেলিয়া মাঠে যাইবার উপায় নাই। গোপ মহাশয়ও তাঁহাকে ওদিকে ভিড়িতে দিবেন না, সুতরাং সে পূর্বদিকে পেয়ারা গাছতলায়, যেখানে রোদ পড়িয়াছে, সেইখানে ক্যাম্বিসের একটা 'ডেক্' চেয়ার পাতিয়া সূর্যসুন্দরের ডায়েরিটা আবার পড়িতে আরম্ভ করিল।

"আমার দেশের বাড়িতেই আমি বড় হইতে লাগিলাম। আমার জন্মের পর মামা কেবল মামীমাকেই সাহেবগঞ্জে লইয়া গেলেন। মা এবং দিদিমাকে লইয়া গেলেন না। মামার ভাইপো দুইটি চাকরি পাইয়া পূর্বেই বিদেশে চলিয়া গিয়াছিল। তখন ঘরের গাই কালীর অনেক দুধ হইতেছিল, পুকুরে প্রচুর মাছ, জমি হইতে ধানও আসে প্রচুর। মামা বলিলেন, এসব ফেলিয়া বিদেশে যাওয়ার দরকার কি। সবাই বিদেশে চলিয়া গেলে পুকুর-বাগান কিছুই থাকিবে না। মা এবং দিদি এসব লইয়া এখানেই থাকুন, খেতু দেখা-শোনা করিবে, আমি প্রতি মাসে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিব।

সুতরাং আমার বাল্যকালের প্রথম কয়েক বৎসর মামার দেশের বাড়িতে শঙ্করা গ্রামেই কাটিয়াছিল। সাত-আট বৎসর পর্যন্ত আমি সেখানেই ছিলাম। সে সময়ের স্মৃতি আমার মনে খুব স্পষ্টভাবে আঁকা নাই। আবছা-ভাবে কিছু কিছু মনে আছে। মামা মা এবং দিদিমাকে গ্রামে ফেলিয়া রাখিয়া নিজে লইয়া শহরে চলিয়া গিয়াছিলেন ইহাতে দিদিমা (আমার মা) খুব সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহার একমাত্র ছেলের বিরুদ্ধে অবশ্য মুখে তিনি কাহারও কাছে বিশেষ কিছু বলিতেন না ; আমার মা তো নীরবতার প্রতিমূর্তি ছিলেন, কোন কথাই তাঁহার মুখ দিয়া কখনও বাহির হইত না। তিনি মুখ বুজিয়া ঘরের সমস্ত কাজগুলি একের পর এক করিয়া যাইতেন। তাঁহার তখনকার যে ছবিগুলি আমার মনে আঁকা আছে, তাহাদের একটিতেও তিনি চুপ করিয়া বসিয়া নাই ! ঘর-দুয়ার-উঠান-গোয়াল পরিষ্কার করিতেছেন, পুকুর হইতে জল আনিতেছেন, রান্নাঘরে বসিয়া রান্না করিতেছেন, অথবা দিদিমার পায়ে তেল মালিশ করিতেছেন—মায়ের এই সব ছবিই আমার মনে আঁকা আছে। কোথাও বসিয়া পর-নিন্দা বা পর-চর্চা করিতেছেন এরূপ একটি ছবিও আমার স্মৃতিপটে আঁকা নাই। তবে মামা কেবল মামীমাকে লইয়া বিদেশ চলিয়া যাওয়াতে আত্মীয়দের মনে যে ঈষৎ ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা খেতুমামার আলাপে বুঝিতাম। খেতুমামা প্রায়ই আসিয়া দিদিমার কাছে আমার প্রসঙ্গ তুলিয়া যাহা বলিতেন, তাহার কিছু কিছু আমার এখনও মনে আছে।

একদিন খেতুমামা মাঠ হইতে ফিরিয়া আমাদের বাড়ি আসিলেন। মাঠের ফেরতই তিনি আমাদের বাড়িতে অধিকাংশ দিন আসিতেন। নিজের জমিতে জনমজুরদের সহিত নিজেই কাজ করিতেন তিনি। সেদিন দুপুরে মাঠ হইতে আমাদের বাড়িতে ফিরিয়া মাথার টোকাটা খুলিয়া ফেলিলেন, হাতের কাটারিটা

উঠানের একধারে রাখিলেন, তাহার পর হাঁকিলেন—"কই বারাহী, এক ঘটি জল দে তো—"

মা রান্নাঘরে ছিলেন, আমি ছিলাম লেবু-তলার ওপাশে। উঠানে দুইটি লেবু গাছ ছিল। লেবু গাছের দক্ষিণ দিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গা ছিল। তিনদিকে বাড়ির দেওয়াল, আর একদিকে লেবু গাছ। চমৎকার নির্জন জায়গাটি, অথচ উঠানের মধ্যেই। আমি সেইখানেই খেলা করিতে ভালবাসিতাম। আমার সঙ্গী ছিল সন্তোষ। সন্তোষের মা ভবতারিণী দেবী মায়ের সখী ছিলেন, ইঁহার কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আমরা সেদিন ইটের টুকরা ও কাদা দিয়া শিব-মন্দির গড়িতেছিলেন।

মা খেতুমামাকে জল আনিয়া দিতে খেতুমামা পা দুইটি বেশ ভালো করিয়া ধুইয়া ফেলিলেন।

"আর এক ঘটি ঠাণ্ডা জল চাই, খাব। তারপর তামাক সাজ এক ছিলিম। তোর মতন কেউ সাজতে পারে না। কেদারকে তামাক সেজে খাইয়েছিলি একদিনও? খাওয়াস নি? খাওয়ালে তোকে ফেলে যেতে পারত না"

আমি লেবু গাছের আড়ালে বসিয়া সব দেখিতেছিলাম। মা খেতুমামার কথাগুলি শুনিয়া লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিলেন মাত্র, কোন কথা বলিলেন না। ঘরে ঢুকিয়া একটি ছোট রেকাবী ও এক ঘটি জল আনিয়া দিলেন। রেকাবীতে সম্ভবত বাতাসা ছিল। বাতাসাগুলি মুখে ফেলিয়া দিয়া খেতুমামা আলগোছে ঢক্‌ঢক্‌ করিয়া সমস্ত জলটুকু পান করিলেন, এক ফোঁটা বাহিরে পড়িল না। একটু পরেই দেখিলাম মা কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে রান্নাঘর হইতে বাহির হইতেছেন। খেতুমামার কোমরে পিছন দিকে সর্বদা একটি হুঁকা গোঁজা থাকিত। সেটি তিনি মায়ের হাতে দিলেন। মা কলিকাটি মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া হুঁকায় জল ভরিলেন। খেতুমামা দু'একবার টানিয়া খানিকটা জল ফেলিয়া দিয়া কলিকাটি হুঁকার

মাথায় বসাইয়া দিলেন। তাহার পরই হুঁকার ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ শব্দ শোনা যাইতে লাগিল।

দিদিমার দৃষ্টি তখনও একেবারে লোপ পায় নাই। খেতুমামার গলার আওয়াজ পাইয়া তিনি ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া রোজ দুপুরে তিনি খানিকক্ষণ ঘুমাইতেন।

খেতুমামা বলিলেন, "খুড়িমা, ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন যে। চেঁচামেচি করে' ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলাম না কি"

"না। ঘুম আমার হ'য়ে গেছে। বারাহী খেয়েচিস?"

"এইবার খাব"

"কি যে সমস্ত দিন ঘুটঘুট করিস রান্না ঘরে। আমার খাওয়া তো সেই কখন হ'য়ে গেছে"

মা কোনও উত্তর না দিয়া দিদিমার চওড়া কাঠের পিঁড়িখানি বারান্দায় পাতিয়া দিয়া আবার রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন। দিদিমা বসিতেই খেতুমামা প্রশ্ন করিলেন, "শক্তির খবর পেয়েছ? সব ভালো আছে তো"

"দিন কয়েক আগে এসেছিল একটা চিঠি। বৌমার নাকি ছেলেপিলে হবে। এ সময় আমাদের ওখানে থাকলেই ভালো হ'ত"

"তাতে আর সন্দেহ কি। কিন্তু আজকালকার ভদ্রলোকরা দেখছি বউ নিয়ে একা একা থাকাটাই উচিত মনে করছেন। মা বোন বা আত্মীয়-স্বজনদের ঘেঁসটা পছন্দ করছেন না। কিছু টাকা মনি-অর্ডার করেই মনে করছেন যে কর্তব্য সমাপন হ'ল"

খেতুমামা মাঝে মাঝে খুব শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করিতেন।

দিদিমা বলিলেন, "সন্তোষের বাবা মুঙ্গেরে চাকরি করে, সেখানে ভালো একটা বাসাও পেয়েছে, কিন্তু কই বৌকে তো নিয়ে যায় নি। বৌ তো মায়ের কাছে আছে"

"তোমার ছেলে শক্তি সে জাতের নয় খুড়ি। তোমার মনে দুঃখ দিতে চাই না, কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হয়"

খেতুমামা বাক্যটি সম্পূর্ণ না করিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

"কি সন্দেহ হয়"

"ও একটু স্ত্রৈণ"

দিদিমা চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর একটু কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিলেন, "না তা ঠিক নয়! নিজের বৌকে কে না ভালবাসে, বাসাই তো উচিত"

"তাতে আর সন্দেহ কি। কিন্তু তা বলে' বউকে নিয়ে মজা করে শহরে একা একা থাকব, আর মা বোন পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকবে এটা কি উচিত"

"কিন্তু এখানকার বিষয় আশয় কে দেখে বল"

"বিষয়-আশয় তো দেখে তোমাদের দুঃখীরাম আর ছিরু, আর সামলাই আমি। তুমি বুড়ো হয়েছ, চোখেও ভাল দেখতে পাওনা আজকাল, আর বারাহী তো ছেলেমানুষ, তোমরা যে বিষয়-আশয় দেখতে পারবে না এ কথা শক্তি ভালো করেই জানে। ওটা ওর একটা ছুতো—"

দিদিমা ইহার প্রত্যুত্তরে আর কিছু বলিলেন না। মনে হইল খেতুমামার কথায় তিনিও যেন সায় দিতেছেন।

...কতদিন আগেকার ঘটনা, কিন্তু এখনও কথাগুলি স্পষ্ট মনে আছে। বড় বয়সের অনেক কথা ভুলিয়া গিয়াছি, কিছুদিন আগেকার কথাও মনে নাই, শৈশবের ওই কথাগুলি কিন্তু মনে আছে।

আর একটি ঘটনাও মনে পড়িতেছে। রাস-উপলক্ষে গ্রামে কোথায় যেন যাত্রা হইতেছিল, আমরা শিশুর দল সন্ধ্যা হইতেই আসরের সামনেই জাঁকাইয়া বসিয়াছিলাম এবং বলা বাহুল্য, কলরব করিতেছিলাম। যাত্রা আরম্ভ হইবার ঠিক পূর্বে একজন লোক আসিয়া বলিল, "তোমরা বড্ড গোলমাল করছ, ওঠ এখান থেকে"

আমি সকলের হইয়া প্রতিশ্রুতি দিলাম, আর আমরা গোলমাল করিব না।

"তবু উঠতে হবে। চৌধুরী বাড়ির ছেলে-মেয়েরা বসবে এখানে"

চৌধুরিরা গ্রামের জমিদার ছিল। যাত্রার আসরে তাহাদেরই স্থান যে সর্বাগ্রে এ জ্ঞান তখন ছিল না, তাই বলিলাম, "বা, আমরা বিকেল থেকে জায়গা দখল করে' বসে' আছি—"

"ওঠ ওঠ উঠে পড়, মেলা গোলমাল কোরো না। ওই পটল কর্তা আসছে—"

এ কথা শুনিবামাত্র আমার সঙ্গীরা একযোগে উঠিয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। আমিই কেবল বসিয়া রহিলাম, কারণ পটলকর্তা কে তাহা আমি জানিতাম না।

সেই লোকটি ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তুমি বসে' রইলে কেন খোকা উঠে পড়, উঠে পড়"

"আমি আগে থাকতে এসে বসেছি, আমি উঠব কেন"

পর মুহূর্তেই পটলকর্তা আসিয়া পড়িলেন। আমার গালে প্রচণ্ড এক চড় বসাইয়া আমার কান দুইটি ধরিয়া আমাকে একেবারে শূন্যে তুলিয়া ফেলিলেন।

"দূর হ'য়ে যা, বাঁদর কোথাকার, সামনে এসে বসেছেন—"

ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন আমাকে। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ি চলিয়া গেলাম। এ অপমানের কথা কাহাকেও কিছু বলিলাম না। তাহার পরদিন সকালেই পটলকর্তা আমাদের বাড়িতে আসিয়া হাজির, হাতে একটি সোলার তৈরি পাখী।

"ও বারাহী, তোর ছেলে কোথা, কাল আমি চিনতে পারিনি তাই কান মলে চড় মেরেছি ওকে। জরিমানা দিতে এসেছি আজ। ডাক তাকে—"

সোলার সুন্দর পাখীটি পাইয়া আমি সমস্ত অপমান ভুলিয়া গেলাম। মায়ের নির্দেশে তাঁহাকে প্রণামও করিলাম। পটলকর্তা

সত্যই আমাকে চিনিতে পারেন নাই। তিনি গ্রামে থাকিতেন না, পূজা-পার্বণ উপলক্ষে আসিতেন। কলিকাতায় কোন একটা সদাগরি আপিসে চাকরি ছিল তাঁহার।

পটলকর্তার শারীরিক এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। খুব বেঁটে-খাটো মানুষ ছিলেন তিনি। ঘাড় বলিয়া কোনও জিনিস তাঁহার ছিল না। মনে হইত বুকের উপরই মুখটি বসানো আছে, মাঝে কিছু নাই। খুব ধপধপে ফরসা রং ছিল। ডান পায়ে ছিল গোদ। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা 'চায়না' কোট পরিতেন। চোখ দুইটি খুব ছোট ছোট ছিল। নাকটি খাঁদা, চিবুকটি চওড়া, চিবুকের নীচে বেশ থল্‌থলে চর্বি। গোঁফ-দাড়ি ছিল না। বেঁটে মোটা চিনেম্যান গোছের চেহারা ছিল তাঁহার। অত্যন্ত বদরাগী ছিলেন। রাগিয়া মাঝে মাঝে অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিতেন। একবার জগদ্ধাত্রী পূজার সময় এমনি একটি অদ্ভুত কাণ্ড করিয়াছিলেন গল্প শুনিয়াছি। তাঁহার নিজের বাড়িতেই জগদ্ধাত্রী পুজা হইত। গ্রামের কুম্ভকার পঞ্চানন গ্রামের সমস্ত প্রতিমা গড়িত, কিন্তু পটলকর্তা নিজের জগদ্ধাত্রী প্রতিমাটি গড়াইতেন কৃষ্ণনগরের কারিগর আনাইয়া। একবার অসুস্থতার জন্য কৃষ্ণনগরের সেই কারিগরটি আসিতে পারিল না। অগত্যা পটলকর্তা পঞ্চাননকেই প্রতিমা গড়িবার ভার দিলেন। বলিলেন, "মজুরি তোমাকে বেশী দেব, প্রতিমাটি কিন্তু নিখুঁত হওয়া চাই। সোনার বেনেদের প্রতিমার চেয়ে ভালো প্রতিমা গড়তে পারবে তো—"

পঞ্চানন বলিল, "পারব"

"বেশ, তাহলে গড়। জগদ্ধাত্রী পুজোর আগের দিন আমি কোলকাতা থেকে আসব। এসে যেন দেখতে পাই প্রতিমাটি তৈরি আছে, নিখুঁত প্রতিমা চাই"

পটলকর্তা কলিকাতা চলিয়া গেলেন। পঞ্চানন প্রতিমা গড়িতে লাগিল। জগদ্ধাত্রী পূজার আগের দিন সন্ধ্যায় পটলকর্তা যখন

স্টেশনে নামিলেন তখন প্রিয় বন্ধু ও পরিষদ ভোলানাথের সহিত তাঁহার দেখা হইল। ভোলানাথ তাঁহাকে লইবার জন্যই স্টেশনে আসিয়াছিলেন। পূজার জিনিসপত্র সঙ্গে থাকিবে বলিয়া ভোলানাথকে তিনি স্টেশনে থাকিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন।

নামিয়াই তিনি প্রশ্ন করিলেন, "প্রতিমা কেমন হয়েছে"

"নিজের চোখেই দেখো। আমি আর কি বলব—"

"তাঁর মানে? ভালো হয় নি?"

"আমি কিছু বলব না ভাই। পঞ্চানন ভাববে আমি তার নামে লাগিয়েছি"

"লাগাবার কি আছে এতে। কেমন গড়েছে বল না"

"পঞ্চানন চিরকাল যেমন গড়ে তেমনি গড়েছে"

ইহার বেশী আর কোনও কথা তিনি ভোলানাথের মুখ হইতে বাহির করিতে পারিলেন না। কিন্তু একথা তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে প্রতিমা ভোলানাথের মনোমত হয় নাই। আর একবার প্রশ্ন করিলেন।

"প্রতিমা তোর পছন্দ হয় নি তাহলে"

"পূজো করবে তুমি, আমার পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে তোমার দরকার কি"

পটলকর্তার গৃহিণীও (সকলে তাঁহাকে পটল গিন্নি বলিয়া ডাকিত) ট্রেন হইতে নামিয়াছিলেন। তিনি মাথার ঘোমটাটা একটু টানিয়া বলিলেন, "তখন বলেছিলাম কেষ্টনগর থেকেই কারিগর আনাও। একজনেরই না হয় অসুখ করেছে, আর কারিগর ছিল না সেখানে? তার ভাইও তো আসতে চেয়েছিল"

পটলকর্তা গর্জন করিয়া উঠিলেন, "পঞ্চা আমাকে বললে কেষ্ট-নগরের প্রতিমার চেয়ে ভালো প্রতিমা গড়ে' দেবে সে। সোনার-বেনেদের প্রতিমা ওই তো গড়ে ফি বছর"

ভোলানাথ বলিলেন "এবার গড়ে নি। সোনারবেনেরা এবার

কেষ্টনগর থেকে লোক আনিয়েছিল। চমৎকার প্রতিমা হয়েছে তাদের"

"তাই না কি"

পটলকর্তার গালে কে যেন একটা চড় কসাইয়া দিল। সোনার-বেনেদের প্রতিমা চমৎকার হইয়াছে! তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইলেন। গ্রামের সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার ঘোর শত্রুতা ছিল। বংশপরম্পরাগত শত্রুতা।

এই সুবর্ণ-বণিকরা মকোর্দমা করিয়া পটলকর্তার পিতামহকে ঋণের দায়ে নাকি সর্বস্বান্ত করিয়াছিল। পটলকর্তা বলেন—উহারা জাল হ্যাণ্ডনোট তৈয়ারি করিয়াছিল। সত্য কি তাহা নির্ণয় করা কঠিন, কিন্তু পটলকর্তার ধারণা সেই মকোর্দমার ফলেই তাঁহাকে আজ বিদেশে চাকুরি করিতে হইতেছে। পূর্বপুরুষদের বিষয়আশয় থাকিলে তিনি স্বচ্ছন্দে এই গ্রামেই পায়ের উপর পা দিয়া জীবনযাপন করিতে পারিতেন। দৈন্য সত্ত্বেও পটলকর্তা পূর্বপুরুষদের জগদ্ধাত্রী পূজাটা বজায় রাখিয়াছিলেন এবং সেই পূজা উপলক্ষ করিয়া সোনার-বেনেদের উপর টেক্কা দিতে চেষ্টা করিতেন। ঠিক টেক্কা দিতে পারিতেন না, কারণ সোনার-বেনেরা প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিপতি ছিলেন। বাজি পুড়াইয়া, লোক খাওয়াইয়া, যাত্রা থিয়েটার করিয়া তাঁহারা যে বিপুল উৎসব করিতেন তাহা করিবার সামর্থ্য পটলকর্তার ছিল না। তবু তিনি চেষ্টা করিতেন প্রতিমাটা অন্তত যাহাতে সোনার বেনেদের প্রতিমার অপেক্ষা ভালো হয়; প্রতি বৎসর তাহা হইতও, অন্তত ভোলানাথ-প্রমুখ তাঁহার পারিষদেরা একথা তাঁহাকে বলিত এবং তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু এবার ভোলানাথের মুখে একি কথা!

বাড়িতে ঢুকিয়াই তাঁহার দেখা হইয়া গেল হাবুর সহিত! হাবু পাড়ারই ছেলে এবং সম্পর্কে তাঁহার নাতি।

"হাবু, প্রতিমা কেমন হয়েছে রে—"

"সিংহ ভালো হয় নি দাত্থ। কান ত্থটো ইত্থরের কানের মতো হয়েছে—"

পটলকর্তা ক্রোধে অস্ফুট শব্দ করিতে করিতে দালানের দিকে হন হন করিয়া আগাইয়া গেলেন। চটিয়া গেলে পটলকর্তার গলা হইতে একপ্রকার শব্দ বাহির হইত যাহা অবর্ণনীয়। দাঁতও কড়মড় করিত। দালানে পঞ্চানন বসিয়া তখনও প্রতিমার গায়ে রং দিতেছিল। পটলকর্তা দালানের দ্বারে দাঁড়াইয়া প্রতিমাটি নিরীক্ষণ করিলেন। পরমুহূর্তেই তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত বজ্রনির্ঘোষ শোনা গেল—"পঞ্চা! এ কি করেছিস? এই কি সিংহের কান?"

পঞ্চানন একলম্ফে পাশের দরজা দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। পটলকর্তাকে সে চিনিত। ইহার পর পটলকর্তা যাহা করিলেন তাহা সত্যই অপ্রত্যাশিত। তিনি ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া পঞ্চাননকে না পাইয়া সিংহেরই কানটা মলিয়া দিলেন। মাটির কান মট্‌ করিয়া ভাঙিয়া গেল।

"ও কি করলে, ও কি করলে, কাল যে পূজো—"

পটল-গিন্নি ছুটিয়া আসিয়া মুক্তকচ্ছ কম্পিত-কলেবর পটলকর্তাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। পুনরায় পঞ্চাননের কাছে গোপনে লোক পাঠানো হইল। সে লুকাইয়া আসিয়া সমস্ত রাত জাগিয়া সিংহের কান জোড়া লাগাইল।

এ গল্পটি আমি সন্তোষের মায়ের কাছে শুনিয়াছি। তিনি খুব চমৎকার গল্প বলিতে পারিতেন। কতদিন আগে শোনা গল্প এখনও স্পষ্ট মনে আছে। আমার জীবনে পটলকর্তার সহিত দেখা আরও ত্থই একবার ঘটিয়াছিল। তাহা যথাস্থানে বলিব। পটলকর্তার সহিত আমাদের আত্মীয়তাও ছিল। তিনি আমার মামার দূরসম্পর্কের কাকা হইতেন। আমার মামা আত্মীয়বৎসল ছিলেন। অনেক গরীব আত্মীয়কে তিনি অর্থ সাহায্য করিতেন। পটলকর্তাকেও করিতেন। একথা তখন জানিতাম না, পরে শুনিয়াছিলাম…"

এই পর্যন্ত পড়িয়া কুমার খাতা হইতে মুখ তুলিয়া দেখিল একটি দোয়েল পাখী সামনের গাছের ডালে বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে পুচ্ছটি উৎক্ষিপ্ত করিতেছে। হঠাৎ ডাকিয়া উঠিল। ক্ষীণ কর্কশ কণ্ঠ। অথচ এই দোয়েলই গ্রীষ্মকালে কি চমৎকার ডাকে। তাহার মনে পড়িল কোথায় যেন পড়িয়াছিল যে শীতকালে দোয়েলরা ভালো ডাকিতে পারে না। গ্রীষ্মকালে যাহার গলায় অত সুর, শীতকালে সে বেসুরা। কুমার একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। তাহার পর হঠাৎ তাহার মনে হইল, পাখীদের কি পক্ষাঘাত হয়? দোয়েলটা উড়িয়া গেল। কুমারও উঠিয়া পড়িল। খাতাটি বগলে করিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেল।

পিছনের ঘরে বসিয়া কুমার আবার স্মৃতিকথায় মনোনিবেশ করিয়াছিল।

"আমার সেই সময়কার আরও কিছু কিছু কথা মনে পড়িতেছে। মনে পড়িতেছে সন্তোষের মাকে, আমার সইমাকে। আমার শৈশবজীবনের প্রধান একটা অংশ পূর্ণ করিয়াছিলেন তিনি। প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা তাঁহার কাছে আমরা গল্প শুনিতে যাইতাম। সাধারণত দিদিমারাই নাতিদের গল্প বলেন, আমার দিদিমা কিন্তু সন্ধ্যাবেলা কেমন যেন অন্যরকম হইয়া যাইতেন, মনে হইত তিনি বড় অসহায় হইয়া পড়িয়াছেন। মা তাঁহাকে সকাল সকাল খাওয়াইয়া বিছানায় বসাইয়া দিতেন। তিনি বিছানায় বসিয়া আপন মনে নিজের সহিতই কথা কহিতেন। কি বলিতেন বুঝিতাম না, যাহাদের নাম করিতেন তাহাদেরও চিনিতাম না। অঘোর-ঠাকুরপো, মহেশমামা, মহেন্দ্রদাদা এমনি সব কত নাম। খেতু-মামাকে একদিন বলিতে শুনিয়াছিলাম, 'সন্ধ্যের সময় বৌদি অতীতে ফিরে যান।' হয়তো তাঁহার যৌবনের দিনগুলি মনে পড়িত। সেই সময় যাহারা তাঁহার প্রিয় ছিল, যাহারা বহুদিন পূর্বে মারা

গিয়াছে, তাহারাই তাঁহাকে সন্ধ্যার সময় পাইয়া বসিত। তাহাদেরই সহিত তিনি গল্প করিতেন। আমরা কাছে গেলে বিরক্ত হইতেন। তাই আমরা সন্ধ্যার সময় সইমার কাছে গিয়া আশ্রয় লইতাম। তিনি আমাকে, সন্তোষকে এবং পাড়ার আরও দুই চারিজন ছেলেমেয়েকে রোজ গল্প বলিতেন। গ্রীষ্মকালে আমাদের আড্ডা বসিত রান্নাঘরের ছোট দাওয়াটিতে, শীতকালে রান্নঘর সংলগ্ন ভাঁড়ার ঘরে। সইমা রাঁধিতে রাঁধিতে আমাদের গল্প বলিতেন। সে যে কত রকমের গল্প। পরীর গল্প, রাজপুত্রের গল্প, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর গল্প, সুখুদুখুর গল্প। এসব ছাড়া গ্রামের অনেক পুরাতন সত্য গল্পও আমাদের বলিতেন তিনি। গল্প বলিবার চমৎকার একটি বিশেষত্ব ছিল তাঁহার। এমন ভাবে গল্প বলিতেন যেন সমস্ত ঘটনাটা আমাদের চোখের উপর ফুটিয়া উঠিত। সিনেমা দেখিয়া ছেলেমেয়েরা আজকাল যে আনন্দ পায় আমরা তাহার চেয়েও বেশী আনন্দ পাইতাম, কারণ কল্পনার সিনেমায় আমরা মনে মনে যে ছবি সৃষ্টি করিতাম বাস্তবের সিনেমায় তাহা সম্ভবে না। একই গল্পকে কেন্দ্র করিয়া আমরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ছবি দেখিতাম। সইমার গল্পস্রোত কখনও মন্থর গতিতে চলিত, কখনও দ্রুতগতিতে। কখনও জোরে জোরে বলিতেন, কখনও চুপি চুপি। গল্পের প্রতিটি চরিত্রের সহিত সইমা যেন একাত্ম হইয়া যাইতেন। রাক্ষসীর কথা যখন বলিতেন, তখন তিনিই যেন রাক্ষসী, পরীর কথা যখন বলিতেন তখন তিনিই যেন পরী। আমরা রুদ্ধশ্বাসে বসিয়া শুনিতাম। মাঝে মাঝে আমাদের গল্প-শোনায় বাধা পড়িত। সই-মা মাঝে মাঝে গ্রামান্তরে চলিয়া যাইতেন। সই-মার রান্নার খুব সুখ্যাতি ছিল। তাই আশপাশের গ্রামে ভোজকাজের বাড়িতে সইমার ডাক পড়িত।

গরুর গাড়ি, কখনও কখনও বা পাল্‌কি পাঠাইয়া তাঁহাকে তাহারা লইয়া যাইত। কয়েকটি বিশেষ রান্নায় সইমার খুব নাম

ছিল। লাউঘণ্ট, শাকের ঘণ্ট, সুক্তো, বড়ির ঝাল, বেগুনের টক প্রভৃতি কয়েকটি নিরামিষ রান্নায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আজকাল উৎসবের বাড়িতে লোকে নামকরা গায়ক-গায়িকাকে যেমন সসম্মানে লইয়া যায়, সেকালে সইমাকে ঠিক তেমনি সসম্মানে লোকে দুই একটা তরকারি রাঁধিবার জন্য লইয়া যাইত। গায়কগায়িকারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে গান শুনাইবার জন্য দক্ষিণা গ্রহণ করেন, দক্ষিণার লোভেই অনেক সময় তাঁহারা আসেন কিন্তু সইমা যাইতেন স্নেহের আকর্ষণে, হয়তো প্রশংসার লোভ একটু থাকিত। আমি জানি পাঁচ ক্রোশ দূরের একটি গ্রামে একবার একজনের অসুখের পর অরুচি হইয়াছিল, কোন খাবারই তাহার মুখে রুচিত না। সইমার সহিত তাহাদের সামান্য একটু আত্মীয়তা ছিল। রোগীর মা স্বয়ং একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, 'সন্তোষের মা, তুমি একবার চল। তোমার হাতের রান্না খেলে হয়তো অতুলের অরুচি ঘুচবে। কোবরেজ মশাই তরকারিতে মশলা দিতে বারণ করেছেন। তরকারিতে মশলা না দিয়ে তরকারির স্বাদ আমরা তো করতে পারি না। তুমি পার। বিনা মশলায় চমৎকার রাঁধ তুমি। তোমাকে যেতে হবে।' সইমা সত্যই তাঁহার সহিত চলিয়া গেলেন এবং তাহাদের বাড়িতে দশ-পনর দিন থাকিয়া অতুলের অরুচি সারাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। সন্তোষও তাহার মায়ের সহিত গিয়াছিল, আমারও যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার মা আমাকে যাইতে দেন নাই। সইমার তখনকার চেহারাটাও আমার স্পষ্ট মনে আছে। তিনি আমার মায়ের সমবয়সী ছিলেন। তাঁহার যেমন স্বাস্থ্য ছিল, তেমনি রং। আমার মা শ্যামবর্ণা ছিলেন। কিন্তু সইমা ছিলেন ধপধপে ফরসা। আগুনের তাত বা রোদের তাত লাগিলে মুখখানা সিঁদুরবর্ণ হইয়া উঠিত। ছিপছিপে দোহারা গড়ন ছিল তাঁহার। কপালের ঠিক মাঝখানটিতে ছিল নীল রঙের ছোট্ট একটি উল্‌কি, মনে হইত টিপ পরিয়া আছেন। তখন সন্তোষ ছাড়া

তাঁহার আর কোন সন্তান হয় নাই। আমরা শঙ্করা হইতে চলিয়া আসিবার পর তাঁহার উপর্যুপরি তিনটি কন্যা হয়—"

কুমারের এই অংশটুকু পড়িতে বড় ভাল লাগিতেছিল। দিদিমা যৌবনে যে এত রূপসী ছিলেন তাহা সে জানিত না। সে যখন দিদিমাকে দেখিয়াছিল তখন তিনি অতি-বৃদ্ধা, সোজা হইয়া হাঁটিতে পর্যন্ত পারিতেন না, কোমর ভাঙিয়া গিয়াছিল।···চিন্তায় বাধা পড়িল। একটা চাকর ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল কয়েকদিন পূর্বে যে মহিষটা নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিল সে না কি সমীপবর্তী বাহী নদীর জলে গলা ডুবাইয়া বসিয়া আছে। কুমার উঠিয়া পড়িল এবং নদীতীরে গিয়া দেখিল সত্যই তাই। এটি মহিষ নয়, মহিষী। কিছুদিন পূর্বে কুমার এটিকে কিনিয়াছিল। এখনও কিন্তু তেমন পোষ মানে নাই, সুযোগ পাইলেই পলায়ন করে।

কুমার নদীতীরে দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইয়া ডাকিতে লাগিল—'যমুনী, আয়, আয়, আঃ আঃ আঃ।' কুমার প্রত্যাশা করে নাই যে যমুনী আসিবে, কিন্তু আসিল। নদীতে তেমন জল ছিল না, বেশীর ভাগই কাদা। সর্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া যমুনী কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কুমার তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিল। একটা চাকর দড়ি লইয়া পিছন দিক হইতে তাহাকে বাঁধিবার জন্য গুড়ি মারিয়া আসিতেছিল। কুমার তাহাকে বারণ করিল।

"ওকে এখন বাঁধতে হবে না। এইখানেই চরুক—"

পাশের একটা জমিতে প্রচুর গম আর যব হইয়াছিল। কুমারেরই জমি। যমুনী সেই ক্ষেতে ঢুকিয়া মনের আনন্দে খাইতে আরম্ভ করিল। কুমার বাধা দিল না। মহিষটা এমনভাবে ফসল নষ্ট করিতেছে দেখিয়া চাকরগুলার বুক করকর করিতেছিল, কিন্তু মালিক যখন কিছু বলিতেছে না, তখন তাহারাও আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। কুমার পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া খাতায় মন দিল। দেখিল বাবা দিদিমার কথা আর লেখেন নাই, অন্য প্রসঙ্গ পাড়িয়াছেন।

"...সেই সময়ের আর একটি লোকের কথা মনে পড়িতেছে, গোলক পণ্ডিতকে, যিনি আমার এবং সন্তোষের হাতে-খড়ি দিয়েছিলেন। গোলক পণ্ডিত কতদূর লেখাপড়া জানিতেন জানি না, কিন্তু তিনি যে ভাল শিক্ষক ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। লোকও খুব ভাল ছিলেন। সেকালে পণ্ডিতেরা সাধারণত যেরূপ উগ্র ও নিষ্ঠুর হইতেন (সাহেবগঞ্জের দীনু পণ্ডিত যেমন ছিলেন, পরে সাহেবগঞ্জে গিয়া এই লোকটির কবলে আমাকে পড়িতে হইয়াছিল) গোলক পণ্ডিত মোটেই সে রকম ছিলেন না। পাঠশালা বলিতে যাহা বুঝায় তাহাও তাহার ছিল না, ছাত্রসংখ্যাও যে খুব বেশী তাহা নয়। সন্তোষ, জীবু এবং আমি এই তিনজন মাত্র তাঁহার ছাত্র ছিলাম। তাঁহার ছিল ছোট একটি মুদির দোকান। চাল, ডাল, নুন, মশলা প্রভৃতি তাহাতে থাকিত। দোকানের সংলগ্ন ছোট একটি বারান্দায় আমরা তিনজন বসিয়া তাঁহার নিকট লেখাপড়া শিখিতাম। শিক্ষাপদ্ধতিটা এই প্রকার ছিল। আমাদের প্রথমেই গিয়া গুরুমহাশয়কে প্রণাম করিতে হইত। তাহার পর আমরা চোখ বুজিয়া হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইতাম। তিনি সরস্বতীর সংস্কৃত স্তবটি এক এক লাইন করিয়া বলিয়া যাইতেন, আমাদের তাহা আবৃত্তি করিতে হইত। ওঁ তরুণশকলমিন্দোবিভ্রতি শুভ্রকান্তিঃ হইতে আরম্ভ করিয়া সরস্বতীর ধ্যান, প্রণামমন্ত্র, স্তোত্র সমস্তটা বলিবার পর পণ্ডিত মহাশয় উঠিয়া বারান্দার উপর খড়ি দিয়া অ আ বড় বড় করিয়া লিখিয়া দিতেন। আমরা তাহার উপর খড়ি দিয়া দাগ বুলাইতাম। ক্রমশ অক্ষরগুলি স্থূলাকৃতি হইয়া উঠিত, আমাদের হাত মুখ জামা কাপড়ও খড়ির গুঁড়ায় শাদা হইয়া যাইত। তখন পণ্ডিত মহাশয় হুকুম দিতেন—"এইবার ডাল দিয়ে সাজাও—"

"কি ডাল দিয়ে সাজাব পণ্ডিত মশায়"

"মশুর ডাল দিয়ে সাজাও আজ"

আমরা তখন মশুর ডাল অক্ষরগুলির উপর নিপুণভাবে সাজাইতাম। দেখিতে দেখিতে মশুর-ডালে-লেখা 'অ' 'আ' হইয়া যাইত। নিজেদের কৃতিত্বে আমরা নিজেরাই মুগ্ধ হইয়া পড়িতাম। বৈচিত্র্য করিবার জন্য প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন ডাল ব্যবহার করা হইত। ডাল আমরা কিনতাম পণ্ডিত মহাশয়ের দোকান হইতেই। পাঁচটি ছোট ছোট মাটির-ভাঁড়ে পাঁচ রকম ডাল থাকিত। ইহার জন্য আমরা পণ্ডিত মহাশয়কে সবসুদ্ধ চার পয়সা দিতাম। মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিতভাবে নূতনত্বের আমদানি করিয়া পণ্ডিত মহাশয় আমাদের আনন্দ ও বিস্ময় বৃদ্ধি করিতেন। ডালের বদলে কোনদিন বা তুলার বিচি আনিয়া দিতেন। এ সবের জন্য আলাদা পয়সা দিতে হইত না। একবার কোথা হইতে তিনি কুঁচফল আনিয়া আমাদের বলিলেন, "আজ এইগুলো দিয়ে সাজাও দিকি—"। সেদিনকার উত্তেজনা আজও যেন অনুভব করিতেছি। কুঁচফলের অ-আ-গুলি আজও যেন চোখের উপর ভাসিতেছে। লেখা হইয়া গেলে পণ্ডিত মহাশয় আমাদের ধারাপাত ঘোষাইতেন। শতকিয়া হইতে শুরু হইত। দোকানের কাজ করিতে করিতেই পণ্ডিত মহাশয় আমাদের পড়াইতেন। খরিদ্দার আসিলেও আমাদের পড়া বন্ধ হইত না। পড়াইবার জন্য পণ্ডিত মহাশয় কোন বেতন লইতেন না, আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে কেবল তাঁহার খাইবার নিমন্ত্রণ হইত। খাওয়ার খুব একটা বিশেষ ঘটা বা আয়োজন হইত তাহা নয়, সাধারণ ডাল-ভাত-তরকারিই হইত, বিশেষত্বের মধ্যে হইত কেবল পায়েস। আহারের শেষে খুব বড় একটি জামবাটি-পূর্ণ পায়েস পণ্ডিত মহাশয় পরিতৃপ্তিসহকারে আহার করিতেন। সেদিন তিনি পানও খাইতেন। অন্যদিন তাঁহাকে পান খাইতে দেখিতাম না। ঠানদির বাড়িতে আহারাদির পর তাঁহাকে হরিতকির টুকরা মুখে দিতে দেখিয়াছি। এই ঠান্‌দিও একটি চমৎকার চরিত্র। পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ির কাছেই ঠানদির বাড়ি ছিল, ঠানদির বাড়িতে দুইবেলা

তাঁহার আহারাদি সম্পন্ন হইত। ঠানদির সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক ছিল জানি না, সম্ভবত রক্তের কোন সম্পর্ক ছিল না। শুনিয়াছি গ্রামের কাহারও সহিত ঠানদির রক্তের সম্পর্ক ছিল না, অথচ তিনি গ্রামের সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। গ্রামের একধারে ছোট একটি কুঁড়ে ঘরে একা তিনি বাস করিতেন। তাঁহার সেই কুঁড়ে ঘরের চারিদিকে যে জমিটুকু ছিল তাহা নিজের হাতেই তিনি বেড়া দিয়া ঘিরিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে কত রকম তরিতরকারিই না হইত। কুমড়া ঝিঞা ধুধুল, বেগুন, নানারকম শাক, লঙ্কা, পুদিনা সব ছিল। তাঁহার বাড়ির চটানের একধারে একটা পিয়ারা গাছ, আর একধারে আর একধারে একটা কুলগাছও ছিল। অজস্র ফলিত। কুলগাছে ঢিল মারিলে ঠানদি চটিয়া যাইতেন, লাঠি হাতে বাহির হইয়া আসিতেন—"কে রে মুখপোড়া, গাছে ঢিল মারছিস কে। তোদেরই তো দেব, তোদের গর্ভেই 'তো সব যাবে, ঢিল মেরে এখন থেকে কাঁচা কুলগুলোকে নষ্ট করছিস কেন। ওই কোষো কুল খেলে কি বাঁচবি, কেসে কেসে মরবি যে"। ঢিল-নিক্ষেপ-কারীকে কোনদিন তিনি ধরিতে পারেন নাই, কিন্তু গাছে ঢিল পড়িলেই লাঠিটি হাতে লইয়া তিনি বাহির হইতেন, উল্লিখিত উক্তিটি সক্রোধে উচ্চারণ করিতেন, এদিক-ওদিক চাহিয়া মিনিটখানেক দাঁড়াইয়া থাকিতেন, তাহার পর মুচকি হাসিয়া আবার ঘরে ঢুকিয়া পড়িতেন। ওই মুচকি হাসিটি হইতে বোঝা যাইত যে তাঁহার রাগটা মেকি। দুষ্ট ছেলেরা যে তাঁহাকে ভয় করে, তাঁহার সাড়া পাইলেই যে ছুটিয়া পালায়, ইহাতেই তিনি খুশী। ইহা লইয়া তিনি গর্বও করিতেন। তাঁহার কাছে কেহ যদি বলিত অমুক ছেলেটা এই বদমায়েসি করিয়াছে, তিনি তৎক্ষণাৎ সগর্বে উত্তর দিতেন, 'কই, আমার সামনে করুক দিকি'। তাঁহার বদান্যতাও ছিল। নিজের এবং পণ্ডিত মহাশয়ের খাওয়ার মতো তরি-তরকারি রাখিয়া বাকিটা তিনি সকলকে বিলাইয়া দিতেন। তাঁহার বাগানের তরি-তরকারি খায়

নাই এমন লোক শঙ্করা গ্রামে খুব কমই ছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত শঙ্করা গ্রামের লোকেরা তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করে নাই।

পণ্ডিত মহাশয় দুইবেলা তাঁহার বাড়িতে আহার করিতেন। তিনি রান্নাবাড়া সব করিতেন স্বহস্তে। ইহার জন্য পণ্ডিত মহাশয়কে নগদ টাকা কড়ি কিছুই দিতে হইত না। তিনি তাঁহার দোকান হইতে চাল ডাল মশলা প্রভৃতি দিতেন, একটু বেশী বেশী করিয়া দিতেন যাহাতে ঠান্‌দিরও কুলাইয়া যায়। ঠানদির চেহারা অদ্ভুত ছিল। মাথার চুল বেটাছেলের মতো করিয়া ছাঁটা। কাঁচা-পাকা চুল। মাথাটি ঠিক কদম ফুলের মতো। গলায় কণ্ঠী, নাকের উপর রসকলি। ঠানদি একটু স্থূলকায়া ছিলেন, হাঁটিবার সময় লাঠিতে ভর দিয়া হাঁটিতেন। গায়ে কিন্তু শক্তি ছিল। বাগানের কাজকর্ম, গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া, আগাছা পরিষ্কার করা, গাছে জল দেওয়া প্রভৃতি নিজের হাতেই করিতেন তিনি। উঠানের একধারে ছোট একটি কূপ ছিল, সেই কূপ হইতে নিজের হাতেই তিনি জলও তুলিতেন। কখনও কাহারও পুকুরে জল আনিতে যাইতেন না। মাঝে মাঝে তাহার কূপটি ঝালাইবার জন্য গ্রামান্তর হইতে লোক আসিত। পণ্ডিত মহাশয় মজুরি স্বরূপ তাহাদের চার আনা পয়সা দিতেন, আর ঠানদি তাহাদের ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইতেন। এই লোকগুলি আমাদের নিকট বিস্ময়ের বস্তু ছিল। তাহারা কুয়ার ভিতর দড়ি, ঝুড়ি বালতি প্রভৃতি নামাইয়া দিত, তাহার পর একজন নামিয়া যাইত, আর একজন উপর হইতে বালতি করিয়া জলকাদা প্রভৃতি তুলিতে থাকিত। একবার মনে আছে প্রকাণ্ড একটা ব্যাংও উঠিয়াছিল। যতক্ষণ সেই লোকগুলি থাকিত আমরা পাড়ার ছেলেরা ভীড় করিয়া তাহাদের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতাম। যে কুয়ার ভিতর জুজুবুড়ি আছে, কুয়ার পাড়ে ঝুঁকিয়া কুক্ করিয়া শব্দ করিলে যে জুজুবুড়ি তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর দেয় আমরা স্বকর্ণে শুনিয়াছি, সেই জুজুবুড়িকে অগ্রাহ্য করিয়া লোকগুলা কুয়ার ভিতর

নামিতেছে, সর্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া উঠিতেছে, আবার নামিতেছে। সত্যই আমাদের বিস্ময়ের আর অন্ত থাকিত না।

পূর্বেই বলিয়াছি ঠান্‌দির সহিত গ্রামের কাহারও রক্তের সম্পর্ক ছিল না, পণ্ডিত মহাশয়ের সহিতও না। সন্তোষের মা বলিতেন গ্রামে মধু চাটুজ্যে বলিয়া কে একজন ছিলেন তিনিই ঠানদিকে বহুকাল পূর্বে বৃন্দাবন হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। ঠানদি নাকি তাঁহার ধর্ম-ভগ্নী ছিলেন। বৃন্দাবনের এক বৈষ্ণবাচার্যের নিকট তাঁহারা উভয়েই দীক্ষা লন। বিপত্নীক এবং নিঃসন্তান মধু চাটুজ্যে মৃত্যুকালে তাঁহার কয়েক বিঘা ধানের জমি এবং গ্রামের প্রান্তে ওই জায়গাটুকু ঠানদিকে উইল করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। চাটুজ্যে-পাড়ার ঠিক মধ্যস্থলে তাঁহার পূর্বপুরুষের ভিটা ছিল, তাহা তিনি কাহাকেও দেন নাই। সেই জমির উপরেই পরে গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ স্থাপিত হয়। মধু চাটুজ্যের তিনকুলে কেহ ছিল না এটুকুও তিনি ঠানদিকে দিয়া যাইতে পারিতেন। দিয়া যান নাই তাহার কারণ তিনি সম্ভবত বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে পাড়ার ঠিক মধ্যস্থলে ঠানদি শান্তিময় জীবন যাপন করিতে পারিবেন না। পাড়ার লোকেরা এই অজ্ঞাতকুলশীলাকে সুচক্ষে দেখিবে না। বাহিরের একটি স্ত্রীলোক মধু চাটুজ্যের সমস্ত বিষয়টা গ্রাস করিয়া বসিয়াছে ইহা সহ্য করা অনেকের পক্ষেই কঠিন হইবে। আর একটা কথাও তাঁহার বোধ হয় মনে হইয়াছিল। ঠানদি যদি বাস করিতে না পারিয়া ভিটাটুকু অপর কাহাকেও বিক্রয় করিয়া দেন এবং সে লোকটিও যদি পাড়ার অশান্তির কারণ হইয়া পড়ে তাহা হইলে সেটাও ঠিক হইবে না। সম্ভবত এই সব ভাবিয়া পাড়ার পাঁচজনের বিচারবুদ্ধির উপরই তিনি ভিটাটুকুর ভার দিয়া গিয়াছিলেন। গোলক পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত ঠানদির ঘনিষ্ঠতা ঘটিয়াছিল এক অদ্ভুত ঘটনার ফলে। গোলক পণ্ডিতের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার কোনও গ্রামে। শিবরাম গাঙ্গুলীর রাধাশ্যাম বিগ্রহের পূজারী হইয়া তিনি প্রথমে শঙ্করা গ্রামে

আসেন। শিবরাম গাঙ্গুলীর বিবাহ হইয়াছিল মুর্শিদাবাদ জেলায়, শ্বশুরের অর্থে এবং আগ্রহেই তিনি রাধাশ্যাম বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তিনিই গোলক পণ্ডিতকে পূজারী নির্বাচন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। শিবরাম এবং তৎপত্নী বিন্ধ্যবাসিনী যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন গোলক পণ্ডিতের পূজারীপদ অটল ছিল। কিন্তু তাঁহাদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের একমাত্র পুত্র কৃষ্ণকমলের সহিত গোলক পণ্ডিতের খিটিমিটি বাধিতে লাগিল। কৃষ্ণকমল অত্যন্ত গোঁড়া প্রকৃতির লোক ছিলেন। অতিশয় নিষ্ঠা সহকারে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা এবং পঞ্জিকা মানিয়া চলিতেন। গ্রামের দলাদলি এবং ঘোঁটেরও প্রধান পাণ্ডা ছিলেন তিনি। তিনি যখন মালিক হইলেন তখনই ঠানদি মধু চাটুজ্যের বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইয়া শঙ্করা গ্রামে বসবার শুরু করেন। শুরু করিবামাত্র অনেকেরই বিষদৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন তিনি, বিশেষ করিয়া কৃষ্ণকমলের অভিসন্ধি ছিল যে নিঃসন্তান মধু চাটুজ্যের বিষয়টি তাঁহার মৃত্যুর পর তিনিই ক্রমশ হস্তগত করিয়া ফেলিবেন। অসম্ভবও হইত না, কারণ ঠিক তাঁহার জমির পাশেই মধু চাটুজ্যের জমি, আল ক্রমশ সরাইয়া লইলে কেহ আপত্তি করিত না। কিন্তু মধু চাটুজ্যের উইল বাহির হইতেই সব গোলমাল হইয়া গেল। ঠানদির উপর তিনি জাত-ক্রোধ হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রথমে ধমক দিয়া এবং ভয় দেখাইয়া ঠানদিকে গ্রাম ছাড়া করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বুঝিলেন ঠানদি অত সহজে হঠিবার পাত্রী নন, বেশ প্রতাপশালিনী। আইনও তাঁহার স্বপক্ষে ছিল। তিনি একেবারে সোজা চলিয়া গেলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে। ম্যাজিস্ট্রেটটি ছিলেন একটি সদ্য-পাস-করা ছোকরা সাহেব। অবলাদের প্রতি সাহেবদের সৌজন্য সুবিদিত। তিনি নিজে আসিয়া সব অনুসন্ধান করিলেন এবং ঠানদিকে অভয় দিয়া গেলেন। কৃষ্ণকমলকে অনুভব করিতে হইল আইনের দিক দিয়া সুবিধা হইবে না। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কোপদৃষ্টিতে

পড়া সমীচীনও নয়। তিনি অন্য পন্থা অবলম্বন করিলেন। গ্রামের দলাদলির দলপতি ছিলেন তিনি। তাঁহার প্ররোচনায় গ্রামের লোকেরা ঠানদিকে একঘরে করিল। সিদ্ধান্তটা গোপনই ছিল, ঠানদি প্রথমে কিছু বুঝিতে পারেন নাই। বুঝিতে অবশ্য বেশী বিলম্ব হইল না। কিছুদিন পরেই যখন তিনি তাঁহার গুরুদেবের জন্মদিনে স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া গ্রামের লোকজনদের নিমন্ত্রণ করিলেন, তখন এক গোলক পণ্ডিত ছাড়া আর কেহ খাইতে আসিল না, তখন ঠানদি ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। কৃষ্ণকমল গোলক পণ্ডিতকেও যাইতে বারণ করিয়াছিলেন কিন্তু গোলক পণ্ডিত তাঁহার বারণ শোনেন নাই। স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন তিনি। এইজন্য তাহার চাকুরিটি গেল। কৃষ্ণকমল তাঁহাকে পূজারীপদ হইতে অপসৃত করিয়া অন্য লোক বাহাল করিলেন। গোলক পণ্ডিত 'দেশেই ফিরিয়া যাইতেন, কিন্তু ঠানদি তাঁহাকে যাইতে দেন নাই। তিনি বলিলেন, "আমি আমার বাড়ির পাশে তোমাকে একটুকরো জমি দিচ্ছি, তুমি তার উপর একটা দোকান কর, মাথা গোঁজবার জায়গাও কর একটা। মুখপোড়াদের হুমকিতে পালিয়ে যাবে কেন পুরুষ মানুষ হ'য়ে! এটা কি মগের মুলক না কি। তুমি বিয়ে থা কর নি, সংসারের ঝঞ্ঝাট নেই, তোমার একটা পেট চলে' যাবেই। এইখানেই থাক।" গোলক পণ্ডিত থাকিয়া গেলেন। গ্রামের লোকেরা ঠানদির পুকুরও বন্ধ করিয়াছিল। ঠানদি তাহাতেও দমেন নাই। তাঁহার কিছু গহনা ছিল, সেই গহনা বিক্রয় করিয়া তিনি নিজের উঠানে পাকা ইঁদারা করাইয়া লইলেন। যতদিন সে ইঁদারা না হইল ততদিন তিনি তিন-ক্রোশ-দূরবর্তী একটি নদী হইতে জল আনাইতেন, এজন্য তিনি একজন বাঁকী (যাহারা বাঁকে করিয়া জল বহন করে) মাহিনা দিয়া বাহাল করিয়াছিলেন। আমার জন্মের বহুপূর্বে এসব ঘটনা ঘটিয়াছিল। অনেক বড় হইয়া

আমি এসব কাহিনী শুনিয়াছি। আমার শৈশবে যখন আমি ঠানদি এবং গোলক পণ্ডিতকে দেখিয়াছিলাম তখন তাঁহাদের সহিত গ্রামের লোকের যে এত বিরোধিতা আছে তাহা বুঝিতে পারি নাই। বিরোধিতার পরিবর্তে হৃদ্যতাই বরং লক্ষ্য করিয়াছিলাম। আমার জন্মের পূর্বেই কৃষ্ণকমল মারা গিয়াছিলেন। এখন আমার মনে হয় তাঁহার বাগানের তরিতরকারির জোরেই ঠানদি সকলের সঙ্গে পুনরায় ভাব জমাইয়াছিলেন। তাঁহার বাগানের তরিতরকারি যে সকলেই সানন্দে লইত ইহা আমি নিজে দেখিয়াছি। কৃষ্ণকমল বাঁচিয়া থাকিলে এটা সম্ভব হইত কি না জানি না। কিন্তু তিনি ঠানদির সম্বন্ধে যে অপপ্রচার করিয়া গিয়াছিলেন তাহার ফল বীভৎসভাবে ফলিয়াছিল তাঁহার মৃত্যুর পর। আমি শঙ্করা হইতে চলিয়া আসিবার পর ঠানদি অনেকদিন বাঁচিয়া ছিলেন। গোলক পণ্ডিতও। আমি যখন ঠানদির মৃত্যুসংবাদ পাই তখন আমি কলিকাতায় পড়িতেছি। ভয়াবহ সে সংবাদ। গ্রামের একটি লোকও না কি ঠানদির মড়া তুলিতে আসে নাই। মড়া তিন দিন পড়িয়াছিল। গোলক পণ্ডিত অনেকের পায়ে পর্যন্ত ধরিয়া অনুনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই আসে নাই। চতুর্থ দিনে দেখা গেল ঠানদিন ঘরের চালে শকুনি বসিয়াছে। গোলক পণ্ডিত তখন অগত্যা যাহা করিলেন তাহা খুবই দৃষ্টিকটু সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা ছাড়া অন্য উপায়ও ছিল না। তিনি ঠানদির পায়ে দড়ি বাঁধিয়া একাই তাহাকে টানিতে টানিতে শ্মশানে লইয়া গেলেন। ঠানদির জমির এক ভাগীদার চাষী ছিল, বৃদ্ধ নিয়ামত আলি। সেই কেবল লাঠি উঁচাইয়া শকুনি এবং কুকুর তাড়াইতে তাড়াইতে পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে শ্মশান পর্যন্ত গিয়াছিল। নিয়ামত আলির সহায়তায় গোলক পণ্ডিত ঠানদিকে দাহ করেন। ঠানদি উইল করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি গোলক পণ্ডিতকেই দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ঠানদির মৃত্যুর পর গোলক পণ্ডিত আর শঙ্করা গ্রামে থাকেন নাই। তিনি

ঠানদির সমস্ত সম্পত্তি নিয়ামত আলিকে দান করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। নিয়ামত আলির সন্তান-সন্ততিরা কিছুদিন আসিয়া ঠানদির ভিটাতে বাসও করিয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকিতে পারে নাই, ঠানদির প্রেতাত্মার ভয়ে শেষে তাহারা পলাইয়া গেল। রাত্রে তো বটেই, দিনে দুপুরেও তাহারা নাকি ঠানদিকে দেখিতে পাইত, বিশেষ করিয়া তাঁহার সেই কুল-গাছটার আশে-পাশে।"

কুমার খাতা হইতে মুখ তুলিয়া মাঠের দিকে চাহিয়া রহিল। বাড়ির দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে সমস্তটা তাহাদের। জমিতে অনেক ফসল ফলিয়াছে, চারিদিকে সবুজে সবুজ। যমুনা মনের আনন্দে একটা ক্ষেতের যব গম নিঃশেষ করিতেছে। মাঝে মাঝে তাহার নাক হইতে ফোঁস ফোঁস করিয়া শব্দও বাহির হইতেছে, কিন্তু কুমারের এসব দিকে লক্ষ্য নাই। তাহার মনে হইতেছিল সত্যই কি ভূত আছে? মা কি কোথাও বাঁচিয়া আছেন? মুক্তি মোক্ষ এসব কি ধরনের অবস্থা! আমাদের কথা মায়ের কি আর একটুও মনে নাই? বাবার কথাও না? এ চিন্তা কিন্তু কুমারের মনে বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিল না। রাধানাথ গোপ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"আমি আমার ঘর থেকে মণ দুই চিঁড়ে আনতে বলে' দিয়েছিলাম। সেটা এসে পৌঁছেচে। কোথাও রাখিয়ে দাও। কত লোক আসবে তো, 'রেডিমেড' খাবার কিছু থাকা ভাল। রামধনিয়ার গোলাতে ভাল গুড় আছে, আনিয়ে রেখে দাও কিছু—"

দুইটি বস্তা মাথায় করিয়া দুইজন মজুরনী আসিয়া পড়িল। একজন কুমারকে দেখিয়া মৃদু হাসিল। তাহার চোখের দৃষ্টি হইতে যেন স্নেহ উপচাইয়া পড়িতে লাগিল। বহুদিন পূর্বে তাহার স্বামী এখানে কাজ করিত। সে-ও জমিতে জন খাটিতে আসিত। তখন কুমার ছয় সাত বছরের শিশু, এখন কত বড়টি হইয়াছে। চলিত হিন্দীতে এই কথাগুলি বলিয়া সে উঠানের দিকে চলিয়া গেল। এ

বাড়ির সব তাহার চেনা। দ্বিতীয় মজুরনীটি অনুসরণ করিল তাহার।

"ওগুলো রাখিয়ে দাও, তাহলে। আমি চললুম। দেখো যেন ড্যাম্প না লাগে"

রাধানাথ গোপ আবার ব্যস্তভাবে চলিয়া যাইতেছিলেন।

কুমার ইতস্তত করিয়া কথাটা বলিয়াই ফেলিল অবশেষে। "ওর দামটা কি এখনিই দিয়ে দেব"

"ওর দাম অনেকদিন আগেই পেয়ে গেছি। তোমার বাবা দিয়েছেন। এইখানে জমা আছে"—বলিয়া তিনি বুকে হাত দিয়া দেখাইলেন। তাহার পর ধমকের সুরে বলিলেন, "তোমার বাবার সঙ্গে আমার দেনা-পাওনার হিসাব তুমি করতে যেও না। সে অঙ্ক তুমি কষতে পারবে না, যদিও তোমার ম্যাথামেটিক্‌সে অনার্স ছিল—"

খানিকক্ষণ কুমারের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর হনহন করিয়া চলিয়া গেলেন। কুমারও ভিতরে চলিয়া গেল এবং একটা চাকরকে ডাকিয়া চিঁড়ার বস্তা দুইটি ভঁড়ার ঘরে মাচার উপর রাখিয়া দিতে বলিল।

...মজুরনীটি খিড়কির পাশে কুমারের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল। কুমার কাছে আসিতেই তাহার মুখে মাথায় চিবুকে হাত বুলাইয়া আদর করিল। তাহার পর ডাক্তারবাবুর অসুখের কথা খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ভাই বোনদের খবর দেওয়া হইয়াছে কি না, কবে তাহারা আসিবে, সমস্ত জানিয়া লইল সে। তাহার পর ম্লান হাসিয়া যাহা বলিল, "তোদের দেখেই আমার আনন্দ। আমি নিজে তো হতভাগী, স্বামী নেই, একমাত্র ছেলে কয়লা সবে জোয়ান হয়ে উঠছিল, গতবার কলেরায় সে-ও গেল। রাধাবাবুর কাছে কিছু ধার আছে, খেটে খেটে সেইটেই উশুল করছি এখন—"

কুমার ঊর্মিলাকে ডাকিয়া বলিল—"এদের কিছু খেতে দাও"

"আচ্ছা—"

মজুরনী দুইজন বারান্দায় উঠিয়া দরজার একপাশে দাঁড়াইয়া তাহাদের ডাক্তারবাবুকে দেখিতে লাগিল। কয়লার মায়ের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

কুমার আবার গিয়া ক্যাম্প চেয়ারে বসিয়াছিল। ডায়েরিখানা আবার পড়িতে শুরু করিয়াছিল সে।

"...আজ শেষ বয়সে শঙ্করা গ্রামে অতিবাহিত আমার সেই শৈশব জীবনের কথা স্মরণ করিতে গিয়া আর একটি কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়িতেছে, সেটি গ্রামের পূজা পার্বণের কথা, সেই বারো মাসে তের পার্বণের কথা। বৈশাখের নববর্ষ হইতে শুরু করিয়া অক্ষয় তৃতীয়া, গন্ধেশ্বরী পূজা, সাবিত্রী চতুর্দশী ব্রত, জামাই ষষ্ঠী, দশহরা, স্নানযাত্রা, রথ, নীলষষ্ঠী, ঝুলন, জন্মাষ্টমী, লক্ষ্মী পূজা, সরস্বতী পূজা, দুর্গোৎসব, কালী পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, দোল, চড়ক প্রভৃতি বড় বড় উৎসব তো ছিলই তাছাড়া সীতানবমী, লুণ্ঠনষষ্ঠী, উমা চতুর্থী, নাগপঞ্চমী, দুর্বাষ্টমী. তালনবমী, সত্যনারায়ণ পূজা, ললিতা সপ্তমী, পুণ্যিপুকুর প্রভৃতি ছোট ছোট উৎসবেও আমাদের বাল্যজীবন হিল্লোলিত হইয়া উঠিত। শুধু হিন্দুদের উৎসব নয়, মুসলমানদের উৎসবও, বিশেষ করিয়া মহরম। মহরমের সেই রঙীন পতাকার সারি, রঙীন কাগজ আর রাংতায় তৈরি মন্দিরের মতো একাণ্ড 'তাজিয়া', মনুষ্যবেশী ঘোড়ারা, তাহাদের লাঠি-খেলা, তরোয়াল-খেলা, তাহাদের হাসেন-হোসেন চীৎকারে আমাদের মনে এক অবর্ণনীয় উত্তেজনার সৃষ্টি করিত। মহরমের মেলার ভীড়ে আমি তো একবার হারাইয়াই গিয়াছিলাম। ফরিদ নামে আমাদের এক প্রজা আমাকে রাত আটটার সময় বাড়ি ফিরাইয়া আনে। মনে পড়িতেছে সে সমস্তক্ষণ আমাকে কাঁধে লইয়া লাঠি-খেলা প্রভৃতি

দেখাইয়াছিল। রাত্রে সে যখন আমাকে লইয়া ফিরিল তখন বাড়িতে কান্নাকাটি পড়িয়া গিয়াছে।...

"সমস্ত উৎসবের সেরা উৎসব ছিল অবশ্য দুর্গোৎসব। সমস্ত গ্রাম যেন মাতিয়া উঠিত। আমার মামার বাড়িতেই দুর্গোৎসব হইত। সে কি সমারোহ। পঞ্চানন যেদিন হইতে প্রতিমা গড়িতে শুরু করিত সেইদিন হইতেই উৎসবের আরম্ভ। আমরা, পাড়ার ছেলেরা, সর্বক্ষণ তাহার নিকটই ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম এবং তাহার ফরমাস খাটিতাম। বাহিরের প্রতিমা পঞ্চানন গড়িত, মনের প্রতিমা আমরা গড়িতাম। সে যে কি আনন্দ তাহা বলিয়া বুঝানো শক্ত। ষষ্ঠীর দিন হইতে শুরু করিয়া বিজয়া দশমী পর্যন্ত কাহারও বাড়িতে রান্না হইত না। বাড়ির মেয়েরা পূজার আয়োজন করিতেই ব্যস্ত থাকিতেন। কেহ ভোগ রাঁধিতেন, কেহ পূজার জোগাড় দিতেন, কেহ বা পাড়ার ছেলেমেয়েদের একধারে বসাইয়া তাহাদের আহারাদির ব্যবস্থা করিতেন। চণ্ডীমণ্ডপের পিছনের দিকে গোটা দুই ঘর ছিল, তাহাতে কচি ছেলেমেয়েদের শোয়ার ব্যবস্থা পর্যন্ত থাকিত। যাহাতে কচি ছেলেমেয়েদের মায়েরা নিশ্চিন্ত মনে আসিয়া পূজার উৎসবে যোগ দিতে পারে। উৎসবের বিবিধ আয়োজন করিতেন কর্মকর্তারা। যাত্রা, ঢপ, কীর্তন, কথকতা, কবির লড়াই সেই সময়েই দেখিয়াছি, আজকাল আর ওসবের আর তত রেওয়াজ নাই। খাদ্যদ্রব্যের কোনও অভাব ছিল না। মায়ের ভোগ দিবার জন্য প্রত্যেক বাড়ি হইতে এত ফল ও মিষ্টান্ন আসিত যে বিতরণ করিয়াও অনেক বাঁচিয়া যাইত। দ্বিপ্রহরে পংক্তি-ভোজনে বসিয়াও আমরা ভূরি-ভোজন করিতাম। খাদ্যদ্রব্যের তালিকায় চপ কাটলেট পুডিং জাতীয় আধুনিক খাদ্য থাকিত না, থাকিত ভালো সুগন্ধ আলো চালের ভাত, মুগের ডাল, পাঁচ ছয় রকম নিরামিষ তরকারি, একটা ভালো চাটনি, দুই তিন রকম মিষ্টান্ন, দই এবং পায়েস। মায়ের সম্মুখে একটি ছাগ-শিশুকে

বলিদান দেওয়া হইত, তাহা রান্নাও হইত, সকলেকে তাহা দেওয়াও হইত কিন্তু তাহার আমিষত্বের প্রমাণ বড় একটা পাইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। দুই চারি টুকরা আলু, দুই চারিটা ছোলার দানা এবং একটু ঝোলই অধিকাংশের ভাগ্যে জুটিত। একবার বোধহয় একটুকরা মেটে পাইয়াছিলাম। নিরামিষ রান্নাগুলি কিন্তু অপর্যাপ্ত এবং অপূর্ব হইত। ওরূপ সুমিষ্ট নিরামিষ রান্না আজকাল বড় একটা হয় না। সন্তোষের মা নিজের হাতেই দুই তিনটা তরকারি র াঁধিতেন, রন্ধন-গৃহের প্রধান পরিচালিকাও তিনি ছিলেন। রন্ধন ব্যাপারে কোন প্রশ্ন উঠিলে কর্তাব্যক্তিরা বলিতেন— আমরা কিছু জানি না, সোনোর মায়ের কাছে যাও। সোনো মানে সন্তোষ। ছেলেবেলায় পূজার সময় চার পাঁচদিন যেরূপ দীয়তাং ভুজ্যতাং দেখিয়াছি তাহার স্মৃতি আজও মনে অক্ষয় হইয়া আছে। ইহার জন্য খুব যে বেশী একটা খরচ হইত তাহাও নয়। চাটুজ্যে-বাড়ির পাঁচ শরিক ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এবং দশমীর পূজা করিতেন। প্রত্যেক শরিকের উপর এক একদিনের পূজার ভার থাকিত। ভার খুব গুরুভার ছিলনা। পূর্বপুরুষেরা এজন্য প্রচুর জমি দিয়া গিয়াছিলেন। নগদ পয়সা খুব বেশী খরচ হইত না। ভোগের চাল ডাল তরি-তরকারি জমি হইতে আসিত, গোয়ালাদের নামে জমি দেওয়া ছিল তাহারা বিনামূল্যে পূজার সময় যত দুধ দই লাগিত তাহা সরবরাহ করিত। পঞ্চানন প্রতিমা গড়িত, বাজানদার বাজনা বাজাইত বিনামূল্যে, তাহাদেরও জমি দেওয়া ছিল পুরোহিতেরও জমি ছিল। দুলেরা বিনামূল্যে পূজার বলির জন্য ছাগ-শিশু সরবরাহ করিত, পূজার কয়দিন ফাইফরমাস খাটিত, শম্ভু ময়রা ভিয়ান বসাইয়া মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিত। সকলকেই জমি দেওয়া ছিল, কেহই পারিশ্রমিক চাহিত না, চাহিবার উপায় ছিল না, কারণ চার-পাঁচদিন বা বড় জোর এক সপ্তাহের পরিশ্রমের জন্য কেহ দুই বিঘা, কেহ পাঁচ বিঘা জমির উপস্বত্ব ভোগ করিত।

প্রতি শরিক পূজা-বাবদ দশ-পনর টাকা খরচ করিতে পারিলেই মহা-সমারোহে মায়ের পূজা সম্পন্ন হইয়া যাইত। যে সব শরিকের অবস্থা ভালো তাঁহারা বাহির হইতে যাত্রা, কীর্তন প্রভৃতি আনাইতেন। চাটুজ্যেদের প্রকাণ্ড অতিথিশালা ছিল, যাত্রার দল বা কীর্তনীয়ারা সেখানেই থাকিত। মনে আছে কলিকাতা হইতে একবার একজন যাত্নকর আসিয়াছিলেন, খুব একটা মজা হইয়াছিল সেবার। তিনি কৌতুকপ্রিয় লোক ছিলেন। নিষ্ঠাবান পুরোহিত মহাশয়ের চাদরের ভিতর হইতে মুরগীর ডিম বাহির করিয়া তিনি তুমুল হাসির তুফান তুলিয়া ফেলিলেন। পুরোহিত রাধু ভট্চাজ কিন্তু ব্যাপারটাকে নিছক প্রমোদ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিলেন না, চটিয়া গেলেন। এত চটিয়া গেলেন যে মুক্তকচ্ছ হইয়া পৈতা ছিঁড়িয়া অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলেন। যাত্নকর অবশেষে তাঁহার পায়ে ধরিয়া অনেক কষ্টে তাঁহাকে শান্ত করেন!

আমার মনে এই ধরনের বহু স্মৃতি সঞ্চিত হইয়া আছে। সব স্পষ্টভাবে মনে নাই, যতটুকু আছে তাহারও যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করি একটা প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া যাইবে। তবে এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিবার পূর্বে আরও ত্নইটি ঘটনার উল্লেখ করিব।

প্রথম ঘটনাটি খেতুমামাকে কেন্দ্র করিয়া ঘটিয়াছিল। খেতু-মামা আমার মামার জ্ঞাতি-ভ্রাতা ছিলেন। মামার জমি পুকুর বাগান মামা তাঁহারই তত্ত্বাবধানে রাখিয়া গিয়াছিলেন। খেতু-মামা পরের বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে বড় ভালবাসিতেন। পরের উপর প্রভুত্ব করিবার প্রবৃত্তি সব মানুষেরই অল্প-বিস্তর থাকে, পরের বিষয় তত্ত্বাবধান করিবার সুযোগে খেতুমামা এই প্রবৃত্তিটি চরিতার্থ করিতেন, খুব আন্তরিকতার সহিত হাঁক-ডাক করিয়াই করিতেন। শুধু মামার নয়, বিদেশবাসী আরও অনেকের বিষয় তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিত। বঙ্কু মামা, মামার আর এক জ্ঞাতি-

ভ্রাতা কলিকাতায় ব্যাঙ্কে কাজ করিতেন। তাঁহার বিষয়-আশয়েরও ভার ছিল খেতুমামার উপর। গ্রামের আরও অনেকের বিষয়ের দেখা-শোনাও করিতেন তিনি। তাঁহার নিজের জমিজমা খুব বেশী ছিল না, কিন্তু পরের বিষয়ের খবরদারি করিতেন বলিয়া গ্রামে তাঁহার প্রতাপ খুব ছিল! তিনি এমন-ভাবে কথাবার্তা বলিতেন যেন তিনিই গ্রামের রক্ষক। তাঁহাকে প্রায়ই বলিতে শোনা যাইত—"এই খেতু চাটুজ্যে আছে বলেই পুকুরে মাছ, গাছে ফল-পাকড়, জমিতে ধান দেখতে পাচ্ছ। বাবুরা তো যে যার বউ নিয়ে শহরে গিয়ে মজা ওড়াচ্ছেন, আমি না থাকলে পাঁচ ভূতে লুটে পুটে খেত সব। ঘরের চালে খড় পর্যন্ত থাকত না। ওই যে বিনোদ চৌধুরী, নামেই গ্রামের জমিদার তিনি, কলিকাতা, মাদ্রাজ, মাদুরা, রামেশ্বর, কাশী, কাশ্মীর করে' বেড়াচ্ছেন, তাঁর জমিদারি চালাচ্ছে কে—এই খেতু চাটুজ্যে। ওই বৈকুণ্ঠ নামেই ম্যানেজার, কিন্তু আসলে আস্ত একটি জরদ্‌গব, ওর উপর নির্ভর করলে কি বিনোদ চৌধুরীর জমিদারি থাকত? থাকত না। জমিদারি আছে তার কারণ হালটি ধরে' বসে' আছে এই খেতু চাটুজ্যে!" খেতু-মামাকে প্রায়ই সদরে যাইতে হইত মকোর্দমার তদ্বির করিবার জন্য। নিজের মকোর্দমা নয়, পরের মকোর্দমা। একদিন কিন্তু একটা চাঞ্চল্যজনক ঘটনা ঘটিল। গ্রামের জমিদার বিনোদ চৌধুরীর সহিত খেতুমামার আন্তরিক সম্পর্ক কতটা ছিল তাহা কেহ জানিত না, কিন্তু আইনত কোন সম্পর্ক যে ছিল না তাহা আদালতে প্রমাণিত হইয়া গেল।

ঘটনাটা এই। ঘোষাল পাড়ার বখাটে ছেলে বিশ্বেশ্বর খেতুমামার দৃষ্টি এড়াইয়া সকলের বাগান হইতে ফল এবং সকলের পুকুর হইতে মাছ নিয়মিতভাবে চুরি করিত। এ বিষয়ে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিল সে। একদিন কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়িয়া উঠিল, খেতুমামা তাহাকে হাতে-নাতে ধরিয়া ফেলিলেন। দিবা-দ্বিপ্রহরে সে বিনোদ চৌধুরীদের বাগানে ঢুকিয়া ডাব

ভাঙাবাড়ির কথা—দাছু, মা, দিদিমা, বাগান, দোতলার আধ-ভাঙ্গা ঘরের কোণটুকু—সবগুলাই বা কোন একটা; সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু মেয়েদের আনন্দ-চপলতায় মুছিয়া যাইতেছে।

বাড়িটা একটা অপেক্ষাকৃত নিচু টিলার উপর; দূর থেকে মনে হয় মাথাটা সরু, কিন্তু যখন আসা গেল, দেখা গেল বেশ খানিকটা চাটালো জমি। জমিটার উঁচু দিকটায় বাড়িটা,—রাঙা টালির ছাত; একটানা নয়, খানিকটা উঁচু, খানিকটা নিচু, খানিকটা আরও নিচু। মেঝেগুলাও সেই রকম, সব ঘর আর সব বারান্দা এক সমতলে নয়, ছোট বড় সিঁড়ি দিয়া ওঠো নামো, যেন খেলা ঘর, দেশের দিকের বাড়ির মতো একেবারেই নয়। দেওয়ালগুলাও কোনটা কাঠের, কোনটা ইঁটের মতো করিয়া কাটা পাথরের, কোনটা আবার এবড়ো খেবড়ো পাথরেরই—একটার ওপর একটা করিয়া সাজানো। প্রায় সমস্ত জমিটাই বাড়িটার সামনের দিকে; পেছনে হাত-চার-পাঁচ পরেই গভীর খাদ, কতদুর নামিয়া গেছে—লম্বা লম্বা গাছের জঙ্গল, ক্রমে মাত্র সেগুলার ডগাগুলা দেখা যায়, তাহার পরই যে কী কিছুই বুঝা যায় না।

প্রতিবেশী হিসেবে খুব কাছে কোন বাড়ি নাই; তবে অল্প দূরে, আরও দূরে, চারিদিকেই অনেক বাড়ি, এ-পাহাড়ে, ও-পাহাড়ে; কোনটাতে একটা, কোনটাতে ছুইটা, কোনটাতে ততোধিক; কোনটা পাহাড়ের মাথায়, কোনটা ঘাড়ে, কোনটা একেবারেই ঢালুর গায়ে—কে যেন ঠুকিয়া বসাইয়া দিয়াছে। সব বাড়িগুলাই রং-করা, উঁচু-নিচু, নীল আকাশের নিচে পরিষ্কার রোদে ঝলমল করিতেছে।

আহারাদি সারিতে দেরি হইল। রাত জাগার জন্ত নিদ্রা হইতে উঠিতে সন্ধ্যা উতরাইয়া গেল। দিব্য কনকনে শীত, গায়ের মোটা কম্বলটা টানিয়া লইয়া জাহ্নবী ঘরের সামনে ছোট্ট বারান্দাটিতে আসিয়া একেবারে নিশ্চল হইয়া গেল,—ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, যেদিকে চায় শুধু আলোর ঝিকিমিকি, দূরে, আরও দূরে; এক এক জায়গায় অল্প, এক এক জায়গায় যেন কালীপূজার রাতের দেয়ালি জ্বালিয়া দিয়াছে।

কাঁধে কাহার হাত পড়িতে ফিরিয়া দেখিল অণিমা দিদি পেছনে দাঁড়াইয়া আছে, প্রশ্ন করিল—"আলো দেখছ?"

"সেই বাড়িগুলোর আলো, না?"

"হ্যাঁ, উঁচুনিচু জায়গা কিনা;—যেদিকটা পাহাড়ের আড়ালে পড়ে না, অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়।···কেমন লাগছে কার্শিয়াং?"

"বেশ।"

"মন কেমন করছে নাতো?"

জাহ্নবী মাথা নাড়িয়া জানাইল, না করে না।

"আরও ভালো লাগবে, সবার সঙ্গে যেমন যেমন ভাব হবে। বেড়াবার জায়গাও এখানে অনেক, আর সুন্দর সুন্দর, এমন হবে যে পাহাড় ছেড়ে নামতেও ইচ্ছে করবে না। নিচের জায়গায় তো বিশেষ কিছু থাকে না—সেই এক ঘেয়ে বাড়ি-ঘর দোর, এক ঘেয়ে জীবন...এখানে আরও ভালোই লাগবে—তোমার বাড়িতো আবার বনের মধ্যে—মা, দিদিমা আর দাদু ভিন্ন···"

হঠাৎ ফোঁপাইয়া কাঁদার শব্দ হইল; হাতটা কাঁধেই, তাহার নিচে শরীরটা দুলিয়া উঠিতে লাগিল জাহ্নবীর।...ভুল হইয়া গেছে, মন বসাইবার জন্য কার্শিয়াঙের গুণ-কীর্তন করিতে গিয়াছিল অণিমা, অতটা হিসাব করিয়া দেখে নাই। হাতে একটা স্নেহের চাপ দিয়া বলিল—"কাঁদতে নেই ছিঃ, আবার যাবে তাঁদের কাছে। ঘরে চলো, এখানে হঠাৎ আবার ঠাণ্ডা লেগে যায়।"

এই নূতন পরিবেশের মধ্যে জাহ্নবীর নূতন জীবন আরম্ভ হইল।

এ-জীবনে সঙ্গ আছে, কিন্তু তাহা সামাজিক নয়, মুক্তি আছে কিন্তু তাহাও সমাজের মধ্যে নয়। এ-দেশটা যেমন মর্ত থেকে অনেকটা দূর-—স্বর্গের কাছাকাছি, এখানের জীবনও তেমনি মর্তের জীবন থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন—এখানকার জীবন সুস্থ, স্বচ্ছন্দ, নিশ্চিন্ত; মর্তের যে-জীবনকে রোগ-সংশয় অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া বিকশিত হইতে হয়, সে-জীবনের সঙ্গে এর কোন সংস্রব নাই।

নারায়ণীর উদ্দেশ্যের এক দিকটা অবশ্য দিন দিনই সফল হইয়া উঠিতে লাগিল। জাহ্নবী সুখে আছে, ভালো আছে, এতটা বোধ হয় কল্পনাও করিতে পারিত না তাহার মা। নিটোল স্বাস্থ্য, তাহার উপর বয়োধর্মে রূপ যেন দিন দিন উছলিয়া উঠিতেছে সর্বাঙ্গে। সত্যই বোর্ডিংয়ে থাকার মতো যাহার অবস্থা, এরূপ রূপসী মেয়ের রূপে একটা দম্ভের জ্বালা থাকে; বনবাসিনী দুঃখিনী মায়ের মেয়ে জাহ্নবীর রূপে আছে একটা বিষাদের স্নিগ্ধতা। তাই বোর্ডিঙে ওর শত্রু নাই; সৌন্দর্যের জন্যই যে-সব সুন্দরী মেয়েদের ঈর্ষা হওয়ার কথা, তাহারাও ওকে ভালোই বাসে; এদিক দিয়াও সবার ভালোবাসায় সুখে আছে জাহ্নবী। শিক্ষিতও হইয়া উঠিতেছে দ্রুত। ওর বুদ্ধিটা তীক্ষ্ণ; নিঃসঙ্গ বনজীবন ওকে ধ্যানপরায়ণা করিয়া সেটাকে আরও তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিয়াছে, শিক্ষার আনন্দে সেটা সাড়া দিয়া উঠিল। সমবয়সিনীদের পেছনে পড়িয়া থাকার লজ্জাও ওকে দ্রুত সামনে ঠেলিয়া লইয়া চলিল; তাহার সঙ্গে রহিল অণিমার যত্ন—জাহ্নবী চারিদিক দিয়াই বোর্ডিঙে বিশিষ্টা হইয়া উঠিল।

আরও একটা পরিবর্তন আসিতে লাগিল। এটাও বয়োধর্মে আসিতই, তবে অরণ্য-জীবনে উপযুক্ত সঙ্গিনীর অভাবেই দেরি হইত আসিতে, আর তাহার আগের যে জীবন তাহাতে বিকৃত হইয়াই আসিত; বোর্ডিঙে ভালোমন্দ নানারকম আলোচনার মধ্যে জাহ্নবী নিজের নারীত্ব সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিতে লাগিল। রূপের জন্য তাহাকে লইয়াই রহস্য-আলোচনা বেশি, তাই বোধ হয় একটু বেশি করিয়াই সজাগ হইয়া উঠিতে লাগিল জাহ্নবী—নিজেকে লইয়া জাগিল যৌবনের সেই চিরন্তন আত্মপ্রসাদ; মনের কোণে স্বপ্নের সিন্দুর উষা দিল দেখা।

তবু সবটুকুর মধ্যে একটা 'কিন্তু' কোথায় রহিয়া গেলই। যেমন রূপকে চিনিল তাহার আসল মূল্যে, সেই সঙ্গে রূপের পিছনে যে, বিকৃত তৃষা ঘুরিয়া বেড়ায়—কপট হাসির মধ্যে, সেবার মধ্যে, সহানুভূতির মধ্যে, মমতার মধ্যে—সেটাকেও চিনিতে লাগিল তাহার প্রকৃত স্বরূপে। অরণ্যবাসের আগে তাহার মায়ের জীবনে ছোটখাটো ঘটনাগুলা আর

একেবারেই ছোটখাটো রহিল না; মায়ের অমন চোখ-জুড়ানো রূপ—কিন্তু তাহার জন্যই তাহাকে এক আশ্রয় থেকে অন্য আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইতে হইয়াছে—ছবিগুলা এক এক করিয়া জাগিয়া ওঠে জাহ্নবীর চোখের সামনে—একটা বাড়িতে রাঁধুনিগিরি করিত মা, একদিন গভীর রাত্রে খিড়কির দুয়ার খুলিয়া, জাহ্নবীকে বুকে চাপিয়া বাহির হইয়া আসিল।···আর একবার বর্ষার প্রায় সমস্ত রাত্রিটা একটা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া আছে। জাহ্নবী মায়ের কতকটা মনোরঞ্জন করিবার জন্যই বলিল—"ও-বাড়িতে কাকারা ভারী দুষ্টু ছিল, না মা?···ছোট্ট উত্তর হইল—"হ্যাঁ"···"কিন্তু দাদু মা?—তাঁর বড্ড কষ্ট হবে, না? আমাদের বড্ড ভালো বাসতেন, না মা? আমায় খাবারের পয়সা দিতেন, রোজই কেমন, না মা?"···দাদু, অর্থাৎ বাড়ির বৃদ্ধ কর্তা। মাকেও যে ভালোবাসিত সেই কথা বলিতে যাইতে ছিল। "চুপ কর, বকে না"—বলিয়া মা থামাইয়া দিল।···কদর্য!—লালসাতুর বৃদ্ধ। আজ জাহ্নবী বোঝে সেই জন্য ছেলেদের ছিল তাহার মায়ের ওপর বিষদৃষ্টি—কিন্তু সে বিষের আড়ালেও আবার তাহাদের নিজেদের লালসায় এই বিষই লুকাইয়াছিল কিনা কে জানে?···আরও কত ছবি, এই রকমই···বনবাসের সময় দুর্গাপুজার সেই দৃশ্য, মিত্তিরদের বাড়িতে; সেদিন মাত্র পুজার আলো একটু মলিন করিয়া দিয়াছিল, আজ সমস্ত পুজাটাকেই মসীলিপ্ত করিয়া দিয়াছে জাহ্নবীর চোখে।

বোর্ডিং অনেক কিছু দিল,—কৃষ্টি দিল, ছাত্রী-জীবনের যা' মূলগত শুচিতা, শিক্ষায় যা' ঔদার্য—সবই ধীরে ধীরে সঞ্চারিত করিল জাহ্নবীর জীবনে, কিন্তু এ সব ছবি মুছিয়া ফেলে কি করিয়া?

তাই এই নূতন জীবনের নূতন আশা, নূতন আনন্দ, নূতন স্বপ্নের সঙ্গে লাগিয়া রহিল ভয়, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস। কার্শিয়াং সমাজজীবন দিতে পারিল না, তাই মানুষ যে ভালোমন্দ দু'রকমই, কল্যাণ-অকল্যাণের আলোছায়া দিয়াই যে সমাজজীবন গড়া এ প্রত্যয়টা হইবার আর অবসর হইল না জাহ্নবীর।

এইখানেই শেষ হইল না। এই ভয় বিদ্বেষ-অবিশ্বাসের সূত্র ধরিয়া ব্যাপকতর জীবন সম্বন্ধে জাগিল একটা কৌতূহল—ধর্ম, সমাজ-ব্যবস্থা, এমন

কি রাজনীতি পর্যন্ত! বয়স্থা মেয়েদের মধ্যে বরাবরই আলোচনা হয় এসব লইয়া—আগে তেমন রস পাইত না, জাহ্নবী, এখন ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হইতেছে—প্রশ্ন জাগে—সত্যই তো ওটা যদি সর্বকল্যাণময়ী দেবীরই পূজা তো সে-পূজার রাতের অমন কলুষিত রূপ কেন? কোথায় কি ভুল আছে?··· আশ্রমটাতে অনেকদিনই ওরা বেশ সুখে ছিল, যদিও সব বিষয়েই অভাব; হঠাৎ একদিন একটা সাড়া জাগিল—একজন খুব বড় ব্যবসায়ীর কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছে···বিরাট অট্টালিকায় উঠিয়া গেল আশ্রম—লোকজনে, সেবাযত্নে, দারিদ্র্যের রূপ গেল বদলাইয়া, দলে দলে মেয়ে-আশ্রিতারা জুটিতে লাগিল। দিনকতক পরেই একটা চাপা আতঙ্ক—'চালান দিচ্ছে!···এও ব্যবসা!'··· শুধু তাহাই নয়, সেই লালসার আহুতি; আজ জাহ্নবী বোঝে মা কেন অত-সুখের মধ্যে ছেঁড়া কাপড়ের ছদ্মবেশে পলাইয়াছিল।···প্রশ্ন জাগে—অর্থের এ আতিশয্য কেন, যাহার জন্য উহা এভাবে বিকৃত হইয়া পড়ে?

এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে জাহ্নবী কি করিয়া ডোরা বোস নামক মেয়েটির কাছাকাছি আসিয়া পড়িল।

ডোরার বয়স প্রায় বাইশ-তেইশ বৎসর, অর্থাৎ বোর্ডিঙের বয়স্থা মেয়েদের একজন। মুখটা কঠিন, প্রায় লালিত্যহীনই—সুন্দরী হইয়াও; এরই মধ্যে এমন কতকগুলা রেখা জাগিয়াছে যাহাতে, দেখিলে কেমন যেন মনে হয় জীবনের পথে ও বয়সের অনুপাতে ও অনেকটা আগাইয়া গেছে। দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ কিন্তু কঠোরভাবে স্বল্পভাষিণী, যেন একটা তপস্যা লইয়া আছে।

একদিন জাহ্নবীকে একলা পাইয়া হঠাৎ বলিয়া বসিল—"তোমার মধ্যে প্রেমের স্বপ্ন জেগেছে জাহ্নবী, অর্থাৎ পুরুষকে বিশ্বাস ক'রে ভালোবাসার প্রশ্রয় দিও না মনকে, ঠকবে।"

তাহার পর দু'একখানা করিয়া বই পড়াইতে লাগিল। ভূমিকা করিল—"পুরুষরা এতদিন ধ'রে সমাজকে কি ক'রে গড়েছে একটু বোঝবার চেষ্টা করো। সব মেয়েই তো বিয়ে করে, তুমি না হয় এই ব্রতটাই নাও।"

ষোল

এই সবের পাশে আর একটি ব্যাপার আসিয়া জুটিল।

কার্শিয়াঙে তখন প্রায় আড়াইটা বৎসর কাটিয়া গেছে; হঠাৎ এক সময় জাহ্নবী অনুভব করিল বোর্ডিঙের জীবনে যেন একটু ছন্দপতন ঘটিতেছে। কোথায় কি অভাব হইতেছে ধরিতে পারিল না। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত রুটিনবদ্ধ কাজের মধ্যে—পড়া, বেড়ানো, নাওয়া, খাওয়া, খেলা, নিদ্রা—কোথাও একচুল এদিক-ওদিক নাই, তবু এ-কাজে ও-কাজে কোথা থেকে একটা যেন ছায়া আসিয়া পড়ে। কয়েকদিন নিজেই একটু লক্ষ্য করিয়া আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিল; দু'একজন সঙ্গিনীকেও বলিল, মেজাজ অনুযায়ী মন্তব্য শুনিল—"কেন, আমরা তো বেশ আছি!...তাই নাকি? ও, তা'হলে আরম্ভ হয়ে গেছে! ইউ আর্ ইন্ লভ্ জাহ্নবী, বিওয়্যার!... সত্যি?—তোমার তাহলে বেড়ানো বন্ধ করা উচিত জাহ্নবী, লক্ষণ ভালো নয়..."

একদিন ডোরাকেও বলিল। ডোরা এদিকে আরও অল্পভাষিণী হইয়া গেছে, তাহার সঙ্গও পাওয়া যায় কম, মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল একটু, একটা যেন বলিবার কথা আছে, কিন্তু বলিবে কি না স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না; তাহার পর প্রশ্ন করিল—"অনুভব করেছ তুমি?"

"হ্যাঁ, কেমন যেন...কী যে, ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না ডোরাদি।"

ডোরা চোখ তুলিয়া একটু কি ভাবিল, তাহার পর বলিল—"আশ্চর্য হচ্ছি না, তোমায় এ্যাফেক্ট করবেই।...ইয়ে, অণিমাদিকে লক্ষ্য ক'রে দেখো তো।"

—খাটিয়া-খুটিয়া 'প্রস্তুত করিবার জন্য একটা যেন পাঠ দিয়া ডোরা কর্মান্তরে চলিয়া গেল।

জাহ্নবীর কৌতূহলী দৃষ্টি গিয়া অণিমার ওপর পড়িল। সত্যই তাহার মধ্যে

একটা পরিবর্তন আসিয়াছে, খুবই সূক্ষ্ম, কিন্তু একটু মন দিয়া দেখিলেই ধরা পড়ে।

বোর্ডিঙে চারজন শিক্ষয়িত্রী, কিন্তু অণিমাই যেন প্রাণস্বরূপ। প্রধানার অনেক বয়স হইয়াছে; বোর্ডিংটা ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের, তিনি বেশির ভাগ ধর্মগত অনুষ্ঠান লইয়াই থাকেন। বাকী দুইজনেরও বয়স হইয়াছে, শিক্ষাদান ও রুটিনগত কয়েকটা কাজের পর আর অন্যদিকে বিশেষ মন দেন না। অণিমা সবদিক তো সামলায়ই, তা' ভিন্ন নিজের প্রাণ-শক্তির প্রাচুর্য দিয়া সব কিছুর মধ্যেই আনন্দ-সঞ্চার করিয়া রাখে। বোর্ডিঙের সামগ্রিক জীবনে তো বটেই, ব্যক্তিগত জীবনেও সবাই যেন সর্বক্ষণ ওকে কাছে পায়। হাওয়ার মতো ওর এই নিত্য-সঞ্চরণশীলতা—হাসি লইয়া, সান্ত্বনা লইয়া, আনন্দ লইয়া—সবার প্রবাস জীবনকে যেন সহনীয় করিয়া রাখিয়াছে।···জাহ্নবী লক্ষ্য করিল এইখানে একটু অভাব ঘটিয়াছে। অণিমা আছে সেইরকমই, কিন্তু যেন চেষ্টা করিয়া ঠাট বজায় রাখিয়া—এক-একসময় চেষ্টা সত্ত্বেও অন্যমনস্ক হইয়া যায়; হাসি যে বিলাইতে চায়, তাহাতে যেন ছায়া আসিয়া পড়ে, সে রকম আলো খোলে না।···ক্রমে এ-ব্যাপারটা আরও একটু স্পষ্ট হইল। জাহ্নবীকে বেশি ভালবাসে, জাহ্নবীও খোঁজে একটু বেশি, দু'একবার এমনও হইল যে সমস্ত বোর্ডিংটা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না অণিমাকে। এক একসময় যেন নিরিবিলি খোঁজে, নজরে পড়িয়া গেলে জাহ্নবী আড়াল থেকে লক্ষ্য করে মুখে স্পষ্ট উদ্বেগ, এমন কি ভয় পর্যন্ত।

বোর্ডিঙের অত মেয়ের মধ্যে কাহাকেও একেবারে একান্তে পাওয়া শক্ত; দুই-তিন দিন চেষ্টা করিয়া জাহ্নবীর একটু সুযোগ হইল, বলিল—"দেখলাম ডোরাদি, সত্যি অণিমাদি একটু কিরকম হ'য়ে গেছেন, এদিকে একটু শুকিয়েও গেছেন যেন। কেন?···জিগ্যেস করব না হয়?"

ডোরা শিহরিয়া উঠিয়াই বলিল—"সর্বনাশ! অমন কাজ কোর না, বোর্ডিং ছাড়তে হবে।"

"আমায়!"

"বাধ্য হবেন ছাড়াতে; কোনও এক ছুতোনাতা ক'রে, একে তো অনুগ্রহের

ওপর আছে।···থাক সে কথা, তুমি আজ বিকেলে দলের সঙ্গে বেড়াতে যেয়ো না। কিছু একটা ব'লে বাসাতেই থেকো।"

বিকালে বোর্ডিংএর বাড়িটা খালি হইয়া যায়। বেশির ভাগ ছাত্রীই বেড়াইতে বাহির হইয়া যায় দলে দলে; পাঁচের কম একটা দলে থাকা নিয়ম নয়; বাকী সবাই বিশেষ করিয়া ছোটদের দল সামনের প্রশস্ত উঠানটায় খেলে। অণিমাও একটি ছোটখাট দল গড়িয়া লইয়া কোনদিকে চলিয়া যায়, বাকী তিনজন শিক্ষয়িত্রী প্রাঙ্গণের একধারে বেতের চেয়ার লইয়া বসেন, উল বোনা চলে, গল্প হয়।

সেদিন জাহ্নবী গেল না; অবশ্য ডোরাও নয়, বোর্ডিং যখন একেবারে খালি, বিকালটাও যখন সন্ধ্যার মুখে একটু মলিন হইয়া আসিয়াছে, ডোরা জাহ্নবীকে নিজের ঘরে ডাকিয়া আনিল।

বাড়িটা একটা ত্রিভুজের মতো। মাঝের কোণটার একেবারে পেছনের দিকে ডোরার ঘরটা। বাড়িতে সবচেয়ে ছোট ঘর, একজনের যোগ্য; একলা থাকিতে ভালবাসে বলিয়া ডোরা এইটা বাছিয়া লইয়াছে। সামনে ত্রিভুজের বাকি যে দুইটি কোণ তাহার মধ্যে একটিতে থাকে অণিমা। পাহাড়ে বাড়ির লাইন প্রায়ই একেবারে সোজা হয় না, শেষের আর সামনের এই দুইটি কোণের লাইনও আঁকিয়া বাঁকিয়া একটু ভিতরের দিকে চলিয়া আসিয়াছে, কতকটা ক্রেসেণ্ট চাঁদের মতো। ফলে ডোরার ঘর থেকে অণিমার ঘরটা দেখা যায়। কিন্তু সবটা নয়; এই দিকটায় বাড়ির নিচেই একটা গভীর খাদ, সেখান থেকে পাইন, বার্চ প্রভৃতি কতকগুলি গাছের চুড়া উঠিয়া আসিয়া এ-প্রান্ত ও-প্রান্তের মাঝে একটা অন্তরাল সৃষ্টি করিয়াছে; ডোরার ঘরের একেবারে শেষদিকের জানালা হইতে অণিমার ঘরের প্রায় অর্ধেকটা দেখা যায় সেই জানালার পাশেই ডোরার বিছানাটা; দুইজনে পাশাপাশি বসিল।

এই দিকে একটা পায়ে-হাঁটা রাস্তা আছে। বোর্ডিঙের সমতল হইতে প্রায় তিনমানুষ নিচুতে সামনের প্রাঙ্গণটার পাশ দিয়া আসিয়া অণিমার ঘরটা হাত দশ-বারো তফাতে রাখিয়া, ঠিক খাদটা বাঁচাইয়া পাশের

পাহাড়টার ওপর উঠিয়া গিয়াছে। রাস্তাটা একটু ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে দিয়া বলিয়া লোক চলাচল কম, পাহাড়িয়ারাই বেশি ব্যবহার করে।

ওরা দুইজনে গিয়া মিনিট পনের বসিবার পরই সামনের পাহাড় থেকে এই পথ ধরিয়া একটি লোক নামিয়া আসিয়া এই পাহাড়টায় উঠিল। ইউরোপীয় পোষাক-পরা, হাতে একটা ছড়ি, সেটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে সান্ধ্য ভ্রমণের বেশ সহজগতিতে চলিয়া আসিয়া অণিমার ঘরের সামনের বাঁকটায় হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ভঙ্গিটা গেল বদলাইয়া, একবার রাস্তার দুই দিকটা গলা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিয়া লইল, তাহার পর রাস্তা আর অণিমার ঘরের মাঝখানে যে ঝোপটা তাহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

জাহ্নবী বলিয়া উঠিল—"এ কি! কে ও?"

ডোরা তাহার ডান হাতটায় চাপ দিয়া বলিল—"চুপ্, এরই জন্যে ব'সে আছি।"

মিনিট খানেক পরেই লোকটা একেবারে অণিমার জানালার সামনে গিয়া উঠিল, চৌকাঠের সমতলে মাথাটা তুলিয়া, তাহার পর হাত উঁচাইয়া জানালায় দুইটা টোকা মারিল।

জানালাটা খুলিয়া গেল এবং একটু তেরছাভাবে দেখা গেল অণিমার মুখ—বুকের খানিকটা পর্যন্ত।

ইহার পর যা কিছু দেখা গেল সব ইসারা-ইঙ্গিতে,—অণিমা কাতরভাবে কি বলিতেছে, মাঝে মাঝে ঘাড় বাঁকাইয়া হাতজোড় করিয়া; এদিকে লোকটা যেন অনড়, মাঝে মাঝে সামান্য একটু মাথাটা যেন নাড়িতেছে, তাহা অসম্মতির ভঙ্গিতে। একবার হাতটা বাড়াইল, অণিমা পেছন দিকে শরীরটা একটু টানিয়া লইতে আবার নামাইয়া লইল।

তীব্র উৎকণ্ঠার জন্য জাহ্নবীর মনে হইল প্রায় পনের মিনিট কাটিল এইভাবে, তাহার পর দেখিল অণিমা নিজের বাঁ হাতের রুলিটা খুলিতেছে। হাত বাড়াইয়া লোকটার হাতে দিল। সে তবু দাঁড়াইয়া রহিল। আবার সেই মূকাভিনয়—ওদিকে কাতর মিনতি; এদিকে অতি মৃদু একটা শিরশ্চালন, অটল প্রতিজ্ঞায়; তাহার পর অণিমা নিজের ডান হাতের রুলিটাও

বাড়াইয়া দিল। তাহার পর করুণা উদ্রেক করিবার জন্যই যেন খালি হাত দুইটা একটু তুলিয়া ধরিল।

লোকটা তবু দাঁড়াইয়া রহিল।

জাহ্নবী চাপা গলায় যেন আপনা হইতেই বলিয়া উঠিল—"আরও চায়?"

ডোরার দাঁতে দাঁত ঘষার শব্দ হইল। জানালাটা আস্তে আস্তে বন্ধ করিতে করিতে বলিল—"হ্যাঁ, চায় বৈকি, পাবেও—দি ইটারন্যাল পার্টিং কিস্ (the eternal parting kiss) এত সত্ত্বেও!...হওয়াই উচিত ওদের এইরকম!"

জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া মুখোমুখি হইয়া প্রশ্ন করিল,—"দেখলে তো?"

"কিন্তু বুঝলাম না তো কিছু।"

"ব্লাকমেলিং; এক সময় ভালোবেসেছিলেন, প্রাণ দিয়ে, কবিত্ব ক'রে, তার একটা পুরস্কার চাই তো?...রাইট্‌লি সার্ভড (rightly served)!

ডোরার মুখটা ঘৃণায় বিকৃত হইয়া গেল।

জাহ্নবী অদ্ভুত অভিজ্ঞতায় যেন হতভম্ব হইয়া গেছে, বিশেষ করিয়া অণিমাকে লইয়া বলিয়া যেন আরও। প্রশ্ন করিল—"কিন্তু কে লোকটা?"

"জানি না; তেমন জানবার কথাও নয়, তবে দেবদূত নয় নিশ্চয়।"

"এই ব্যাপারটার সন্ধান কি ক'রে পেলে তুমি?"

"একটা চিঠিতে।"

"কার চিঠি?"

"ঐ শয়তানটারই।"

ডোরা উঠিয়া স্যুটকেশটা খুলিয়া ফিতা দিয়া বাঁধা একতাড়া চিঠির মধ্য হইতে একটা খামে ভরা চিঠি লইয়া আসিল! ভাঁজ খুলিয়া জাহ্নবীর হাতে দিয়া বলিল—"পড়ো।"

চিঠিটা ইংরাজীতে, ভালো ব্যাঙ্ক কাগজ, ওপরে বাঁ-দিকের কোণে পল-তোলা অক্ষরে ছাপা একটা পরিচ্ছন্ন মনোগ্রাম, লেখা আছে: প্রিয়তমে,

তোমার প্রেরিত টাকা কয়টি পেলাম, সহস্র ধন্যবাদ। কিন্তু আনন্দের চেয়ে দুঃখই অনুভব করছি আমি বেশি এই কারণে যে, তোমার বিচারবুদ্ধির কাছে এত ধর্ণা দিয়েও আমি আজ পর্যন্ত কৃতকার্য হতে পারলাম না। যুদ্ধের

বাজারে সব জিনিসেরই দর আগুন, তবু এখনও তুমি যুদ্ধের আগে যা পাঠাতে যদি তাই পাঠাতে থাক তো চলে কি ক'রে, উচিত নয় কি ভেবে দেখা ? আর একটা কথা, যার জন্যে আমি তোমার ব্যবহারে বেশি ক্ষুব্ধ, —কার্শিয়াংয়ে গিয়ে অবধি তুমি একটা অতিরিক্ত পঞ্চাশ টাকার ভাতা পাচ্ছ এ কথাটি কিন্তু লুকিয়েছ আমার কাছ থেকে। এই অবিশ্বাসে আমি সত্যই মর্মাহত, আমাদের কি এই সম্বন্ধ ?

যাক, আমি চাইছিলাম তোমার পথ আগলে না থেকে নিজেকে নিয়েই একটা নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করতে। তার জন্যে একটু সচ্ছলতা চাই, তাতে সাহায্য করতে তুমি যখন প্রস্তুত নও, তখন আমাকে আবার গিয়ে সকলের সমক্ষে আমাদের অতীত জীবনের কথা প্রকাশ ক'রে তোমার ওপর আমার অধিকার সাব্যস্ত করতে হবে। আর সত্যই তোমার থেকে আলাদা হওয়া অবধি আমার কষ্টের পরিসীমা নেই। আমি তোমায় যে অবিমিশ্র ভালবাসা দিয়েছি, সেটা তুমি দিতে পারনি ব'লে একথাটা বিশ্বাস করা [illegible] হবে জেনেও লিখছি আজ। এই উদ্দেশ্যে আমি শীঘ্রই আসছি কার্শিয়াংয়ে, আশা করি আমাদের পুনর্মিলনের জন্যে প্রস্তুত থাকবে তুমি।

আমার ভালবাসা ও প্রীতিঘন চুম্বন নিও।

তোমারই

আলফ্রেড কিরণময় রায়

একেবারেই নূতন অভিজ্ঞতা, জাহ্নবী বিমূঢ়ভাবে একটু বসিয়া রহিল। তাহার পর কিছু যেন একটা বলিবার জন্যই প্রশ্ন করিল, "এই চিঠিটা পেলে কি ক'রে ?"

"নিতান্ত আকস্মিকভাবেই আমার হাতে এসে পড়েছিল, ডাক-পিয়নের ভুলে।"

জাহ্নবীকে একটু অস্বস্তির সহিত মুখের পানে চাহিতে দেখিয়া বলিল— "বুঝেছি তুমি কি বলতে চাও, আবার ফিরিয়ে দিলাম না কেন ?...আমার এরকম চিঠি খোঁজা একটা বাই আছে জাহ্নবী। বিশেষ ক'রে এটা তো আমার কাছে আমেরিকা-আবিষ্কারের চেয়েও বড়। এ আমার রক্ষাকবচ হয়ে

রইল; আমায় বাঁচিয়েছে, বাঁচাবেও ভবিষ্যতে, হয়তো সেই সঙ্গে আরও অনেককে।...তুমি নীতির কথা ভাবছ; আমি ও সব বিশ্বাস করি না। আমার কাছে সব চেয়ে বড় নীতি—দেখে শিখতে হবে, শিখে বাঁচতে হবে। এই রকম অনেক জোগাড়-করা চিঠি আমায় সাহায্য করছে।"

কিছু মন্তব্য শোনার জন্যই যেন চুপ করিল ডোরা। জাহ্নবী বলিল—"কিন্তু চিঠিটা অণিমাদির হাতে পড়লে লোকটা বোধ হয় আর আসত না, একটা নিশ্চয় ব্যবস্থা করতেন তিনি!"

"তুমি একেবারেই ভুল বলছ জাহ্নবী। অণিমাদির আর কোনও উপায় নে যদি এই রকম করে নিঃস্ব হয়ে লোকটার মুখ বন্ধ ক'রে যেতে পারেন জীবনভোর, তবেই ভালো; কিন্তু তা সম্ভব নয়। ওদের চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না কোন মেয়েই শেষ পর্যন্ত, এতই বেড়ে যায় সেটা দিন দিন।...সব পুরুষই মেয়েদের এক্সপ্লয়েট্ করছে জাহ্নবী, তার মধ্যে ঐ এক জাতের পুরুষ। ঐ ব্যবসা ওদের। ভেবেছে অণিমাদি একলা? না, ওর আরও অনেক আছে ঐ রকম, কি রকম স্টাইলে থাকতে হয়, চিঠির কাগজের মনোগ্রামে দেখছ না? নারীর মন আয়ত্ত করবার এ জাতের পুরুষের একটা ক্ষমতা আছে—সবার কাছ থেকে ওর মাসহারা বরাদ্দ—কলঙ্ক ভয়ের ওপর। তোমাদের সমাজের কুলীন জামাই হোত না?—এও কতকটা সেই রকম, আধুনিক কুলীন জামাই বলতে পার। তবে সে ব্যাপারটি হোত শ্বশুর-জামাইয়ে, এদের ডিরেক্ট—আধুনিক তো? অবশ্য আমাদের সমাজে, যেখানে স্ত্রী-স্বাধীনতা অবাধ, সেখানে বেশি এটা।"

দুইজনে নিজের নিজের চিন্তা লইয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর ডোরা হঠাৎ প্রশ্ন করিল—"কিছু নূতন শিখলে জাহ্নবী? চিনলে পুরুষকে? তার আর একটা দিক?"

জাহ্নবী ঘাড়টা কাৎ করিয়া একটু ম্লান হাসিল। বড়ই বিষাদপূর্ণ হাসি, তাহার অর্থ পুরুষ সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা এই রকমেরই একটা কিছু এবং তাহা কত যে গভীর, কী মর্মান্তিক, ডোরা তাহার কি বুঝিবে?

ডোরা বলিয়া চলিল—"এই বোর্ডিংয়ে বয়স্থা মেয়েদের যে ক'টিকে আমার মতে আনবার চেষ্টা করেছি, তুমি তার মধ্যে একজন জাহ্নবী। আর এও জানি

আমি যে, তুমি একেবারে নির্মল। আমি এই কাজ নিয়েছি, অনেককেই বাঁচাবার চেষ্টা করি, কিন্তু তোমার মতন এতটা কন্‌ফিডেন্সের মধ্যে কাউকে নিই না।"

জাহ্নবী একটু ক্লান্তভাবেই হাসিয়া বলিল—"তোমার দয়া ডোরাদি, মনে থাকবে এ সব; কিন্তু এত দয়া পাবার যোগ্য কিসে আমি বুঝছি না তো।"

ডোরার মুখে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক কাঠিন্য ভিরিয়া আসিল, অনেকক্ষণ ধরিয়া যেন সেটাকে [illegible] মাখিয়া লইল, তাহার পর বলিল--"দয়া বা যোগ্যতা অযোগ্যতার কথা নয় জাহ্নবী, আমার এ ব্রত নিতান্ত নিঃস্বার্থও নয়,—আমার জীবনের সঙ্গে, আমার জন্ম-কাহিনীর সঙ্গেই এর একটা যোগ আছে। হয়তো একদিন শুনবে সে-কথা। আপাততঃ এইটুকুই ব'লে রাখি—আমার বড্ড ঘেন্না ওদের ওপর—ভালোমন্দ কোন পুরুষই তোমার মতন রত্ন যেন অঙ্গে না ধারণ করতে পারে, এই আমার ইচ্ছে। ওরা যে পৃথিবীর খুব একটা বড় সম্পদ্ থেকে বঞ্চিত হ'ল—ওদের মধ্যে যোগ্যতমও—এই আমার আনন্দ।"

সতের

সমস্ত ব্যাপারটা নিতান্ত অপ্রীতিকর বলিয়া জাহ্নবী আর এ প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিল না। কিন্তু এদিকে অণিমার জন্য একটা উৎকট আগ্রহ জাগিয়া আছে, দিন সাতেক পরে ডোরাকে একটু একান্তে পাইয়া প্রশ্ন—করিল "সে ব্যাপারটা কি হ'ল ডোরাদি? গেছে লোকটা?"

ডোরার মুখে একটা অদ্ভুত ধরণের হাসি ফুটিল—যেন এই প্রশ্নটা এই সাতটা দিনের প্রতি মুহূর্ত আশা করিতেছিল, বলিল—"যাক, আছে মনে তোমার এই সামান্য কথাটা?···হ্যাঁ, গেছে চলে, দিন চারেক পরে।"

"আর এসেছিল?"

ডোরা একটু চোখ তুলিয়া চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর ঘাড়টা বাঁকাইয়া জাহ্নবীর মুখের ওপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিল—"হ্যাঁ, আর একবার···অবশ্য এবার আর টাকা-গয়না নেয়নি···বা আরও ঠিকভাবে বলতে গেলে, পায়নি······"

একটু চাহিয়াই রহিল, তাহার পর কি একটা কাজে যাইতেছিল, চলিয়া গেল।

ব্যাপারটা ক্রমে জুড়াইয়া আসিল। অণিমার মুখের ভয় আর ক্লান্তির ভাবটা জাহ্নবীর দৃষ্টি থেকেও অপসৃত প্রায় মাসখানেক লাগিল সময়, তাহার পর সেখানে ধীরে ধীরে ওর স্বাভাবিক প্রসন্নতাও ফুটিয়া উঠিল। জাহ্নবীর কাছে বোর্ডিঙের জীবন আবার স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিল। মাস ছয়েক আরও কাটিল।

তাহার পর একদিন একটা নিতান্তই অভিনব দৃশ্য জাহ্নবীর চোখে পড়িল।

কিছুদিন পূর্বে ডোরার একজন নিকট আত্মীয় আসিয়া কার্শিয়াঙে উঠিয়াছে, মিস্টার দত্ত। ভদ্রলোকের বয়স হইয়াছে, প্রায় ষাট-বাষটি, স্ত্রীর বয়সও পঞ্চাশের ওপর। আর পরিবারের মধ্যে একটি ছোট নাতি ও একটি নাতনি, পিঠোপিঠি, ওঁদের মৃত কন্যার সন্তান। এর অতিরিক্ত আছে স্ত্রীর একটি অনূঢ়া ভগ্নী, বয়স্থাই, অর্থাৎ অনূঢ়াই থাকিয়া গেছে কোন কারণে; আছেও এই পরিবারে বহুদিন থেকে।

পরিবারটি বহু পূর্ব থেকেই বোর্ডিঙের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ, বিশেষ করিয়া প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে। উঁহারা আসিয়াই একদিন বোর্ডিঙে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার পর থেকে ডোরা তাহাদের সহিত মাঝে মাঝে দেখা করিয়া আসিবার অনুমতি পাইল।

বাসাটা প্রায় মাইল খানেক দূরে, গোটা দুই পাহাড় অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। প্রথমে শুধু কর্ত্রীর ভগ্নী মিস সেনই ডোরাকে লইয়া যাইতে আসিত, সঙ্গে করিয়া দিয়াও যাইত; তাহার পর কখনও নাতি-নাতনি দু'টিও। কিছুদিন যাওয়ার পর এমনও হইতে লাগিল, ডোরাই প্রধানার বিশেষ অনুমতি লইয়া একাই যাইতে লাগিল, সন্ধ্যার আগে হইলে ফিরিয়াও আসিতে লাগিল একাই। বিরল বসতি জায়গা, তিন বছরের মধ্যে বোর্ডিঙের নিয়মকানুনে এমনই একটু শৈথিল্য আসিয়া গেছে, কলিকাতার মতো সে কড়াকড়ি ছিল না।

জাহ্নবী আরও গুটিপাঁচেক মেয়ের সঙ্গে বেড়াইতে গিয়াছিল। আজ ডোরাও তাহার আত্মীয়ের বাসায় গেছে, ছেলেমেয়ে দু'টি লইতে আসিয়াছিল।

ফিরিবার সময় সবার খেয়াল হইল ডোরার আত্মীয়ের বাসা হইয়া বোর্ডিঙে যাইবে, ডোরা যদি না ফিরিয়া থাকে, তবে তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইবে। বাসাটা এই দিকেই, তবে এদের পথে নয়, খানিকটা ঘুরিয়া যাইতে হয়।

পৌঁছিতে সূর্যাস্ত হইয়া গেল, শুনিল ডোরা মিনিট কয়েক আগে চলিয়া গেছে।

দলটা সঙ্গে সঙ্গেই আবার বোর্ডিঙের দিকে পা বাড়াইল, ডোরাকে ধরিয়া ফেলিতে হইবে। যতক্ষণ বাসাটা দৃষ্টিপথে রহিল, দ্রুতপদে হইলেও সবাই সংযতভাবেই চলিল, তাহার পর একটা টিলার আড়ালে সেটা অদৃশ্য হইয়া গেলে গতিবেগ বাড়াইয়া ক্রমে রীতিমত দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। অচিরাৎ সমস্ত ব্যাপারটা একটা খেলায় দাঁড়াইয়া গেল এবং সেই নির্জন পাহাড়িয়া পথ পাঁচটি যুবতীর মুক্ত কৌতুক-কলোচ্ছ্বাসে মুখর হইয়া উঠিল।

মিনিট পাঁচেক এইভাবে ছুটিবার পর রাস্তার একটা বাঁকে সবাই ডোরার সঙ্গে এক রকম মুখোমুখি হইয়াই দাঁড়াইল। একা ডোরা নয়, সঙ্গে আর একজন পুরুষ, কলরবে আকৃষ্ট হইয়া দু'জনে এই দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে।...সবাই বেশ একটু বিস্মিত হইয়াই দাঁড়াইয়া পড়িল বটে, তবে জ ভাবটা যেন বিস্ময়ের ওপরেও একটা কিছু—প্রস্তরবৎ নিশ্চল হইয়া গেছে, মুখটা ফ্যাকাসে। ভাগ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, নয়তো তাহার ভাবান্তরই একটা গোলযোগের সৃষ্টি করিত। পুরুষটি সেই-মানুষ, অণিমা যাহাকে নিজের ঘরে জানালার নিচে হাতের রুলি খুলিয়া দিয়াছিল,—মাস ছয়েক আগেকার কথা।

জাহ্নবী অপরিসীম চেষ্টায় যত শীঘ্র পারিল মুখের ভাবটা সহজ করিয়া আনিল।

কথা কহিল প্রথমে ডোরাই: চমৎকার সহজ কণ্ঠস্বর, তাহাতে একটি নিতান্তই সহজ কৌতুকের সুর, মুখে একটু কৌতুকের হাসি—

"কোথায় গিয়েছিলে তোমরা? পাহাড়ে ঝরণার মতো ঘাড়ে এসে পড়লে!"

"গিয়েছিলাম আজ সান্‌সেট পয়েণ্টে ডোরাদি···ভাবলাম তোমায় সঙ্গে নিয়ে ফিরব···গিয়ে শুনলাম তুমি চলে এসেছ···"

"হ্যাঁ, রাত হয়ে আসছিল।···এই দেখো ভুল! আমার ফার্ষ্ট কাজিন, পল অনুপম রয়, আমার ঐ কাকার বাসাতেই এসে উঠেছেন ক'দিন হ'ল।··· আর এরা হচ্ছে সবাই আমার বোর্ডিং মেট্‌স অনুপমদা,—জাহ্নবী, শীলা, অনুপা সেন—ক্লারা আর এই চন্দ্রা বিশ্বাস···জাহ্নবী যেমনভাবে চেয়ে আছে তোমার দিকে, মনে হয়, 'শি ইজ অল্‌রেডি ইন লাভ্‌ উইথ্‌ ইউ!"—বলিয়া সে নিজেও খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, আর সকলেও সে হাসিতে যোগ দিল।

বাতাসটা সঙ্গে সঙ্গেই সহজ হইয়া গেল, অন্ততঃ সে-সময়টুকুর জন্য। "অনুপম" স্মিতহাস্যের সঙ্গে সবার সহিত একে একে করমর্দন করিল, বলিল,— "আমি আসতেই চাইছিলাম না, নেহাৎ নাকি আপনাদের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্যটা ছিল।···তুমি তাহলে যাও ডোরা, আর সঙ্গী তো হ'ল।"

ডোরা হাসিয়া বলিল—"আর খানিকটাও না হয় চলুন না, বোর্ডিঙ পর্যন্ত নেহাৎ যদি নাই যান; পরিচয়টা যে সত্যিই সৌভাগ্য, সেটা বিশ্বাস করানও তো চাই ওদের। এ দাঁড়াচ্ছে, মস্ত বড় একটা দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি পৃষ্ঠভঙ্গ দিচ্ছেন!"

আর একটা হাসির মধ্যে আবার সবাই অগ্রসর হইল।

লোকটার ক্ষমতা আছে। প্রথমটা বোধ হয় একটু হকচকিয়া গিয়াছিল, বিশেষ করিয়া ও-অবস্থায় আবিষ্কৃত হওয়ায়, তাহার পর ডোরা যখন সামলাইয়া লইল, ওর ক্ষণিক সঙ্কোচটা একেবারেই গেল কাটিয়া। নানারকম গল্প জানে, হাসির গল্পের টুকরা-টাকরা, কথার মাত্রায় বেশ মিলাইয়া বসাইয়া দিবার ক্ষমতা আছে। সন্ধ্যার আকাশ, চারিদিকে স্নিগ্ধ সৌন্দর্য—এসব লইয়া মাঝে মাঝে কাব্যও করিল একটু আধটু—দেশী বিলাতী কয়েকজন কবিকে টানিয়া আনিয়া,—এই যে যুবতী-সঙ্গ এটাও চমৎকারভাবে বসাইয়া দিল তাহার মধ্যে—বেনারসীর আঁচলে চুমকির কাজের মতো—বেশ সরস অথচ সংযত এবং ভদ্রভাবে, চমৎকার একটি সূক্ষ্ম সুরুচির পরিচয় দিয়া, খুব শিল্পীজনোচিত একটি মাত্রাজ্ঞানের সঙ্গে। অর্ধেকের খানিকটা বেশি পথ গিয়া যখন ফিরিল তখন সে

সম্পূর্ণ জয়ী, নিমন্ত্রণের ধুম পড়িয়া গেছে—"চলুন না আমাদের সঙ্গে মিষ্টার রয়, আপনি ডোরাদির দাদা, সিস্‌টারদের কিছু আপত্তি থাকবে না···বেশ, না হয় একদিন বলে-কয়েই আসুন, সবাই অত্যন্ত খুশী হবেন···আমরা নিয়েই যাব একদিন আপনাকে···দাঁড়ান, ওঁদের বলে একটা পার্টির ব্যবস্থা করছি সবাই···"

"অনুপম" বলিল—"ভয় করে যে,—দুষ্মন্ত কি আর আশ্রমে মুখ দেখাবার অবস্থা রেখেছেন মিস সেন ?"

একটি স্নিগ্ধ সরস হাসির ছলছলানির মধ্যে বিদায় লইল,—একেবারে নিখুঁত স্টাইলে অল্প ঝুঁকিয়া, অল্প দুলিয়া ; সুটের ভাঁজগুলিও যেন ছন্দে বাঁধা।

জাহ্নবী একটু গম্ভীর ; চেষ্টা করিয়াছে দলের সঙ্গে তাল রাখিয়া যাইবার ; কিন্তু বেশি সফল হয় নাই, কাটে নাই বিস্ময়টা। কাটিবে কি, ডোরা আরও বাড়াইয়া দিল ; একেবারে তাহার পানে চাহিয়া, আগেকার ঠাট্টাটুকুর জের টানিয়াই বলিল—"আসতে বললে না শুধু জাহ্নবীই, যার সবচেয়ে বেশি করে বলা উচিত ছিল। ঠিকই—'থ্যাট্ প্রুভস্ ইট' !"

সঙ্গে সঙ্গেই গম্ভীর হইয়া বলিল—"কিন্তু যতই ডাক তোমরা, অনুপমদা আসবার পাত্র নন। ওঁর একটা সাইডই দেখলে, ওদিকে আবার ভয়ানক কড়া। ঐ যে বোর্ডিঙের নিয়ম বেটাছেলেদের আসতে হলে স্পেশ্যাল পারমিশন নিতে হবে, ওটা ওঁর আত্মসম্মানে ভয়ানক ঘা দেয়। বলেন—এই একটা নীচ অবিশ্বাস যখন, তখন না মাড়ানোই ভালো ওদিক ; লোকটি ওপরে ওপরেই ওরকম হালকা—'ইনসাইড হি ইজ এ্যাডাম্যাণ্ট'।"

ডোরা কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ি হইতে দিল না এই বিস্ময়টা। রাত্রে আহারের টেবিলেই বলিল—"খাওয়ার পর আমার ঘরে একটু আসবে জাহ্নবী ?—শেলীর সেই পীস্‌টা নিয়ে একটু আলোচনা করা যেত ; অবশ্য যদি বেশি ক্লান্ত হয়ে না থাক, তোমরা আবার আজ অনেক দূর বেড়াতে গিয়েছিলে।"

প্রথমটা লোক-দেখান শেলীর আলোচনাই করিল, তাহার পর বোর্ডিং যখন সুষুপ্ত, একবার বাহিরটা দেখিয়া আসিয়া গলা নামাইয়া বলিল—"একেবারে অবাক হয়ে গেছ, না ?"

জাহ্নবী উত্তর করিল—"হ্যাঁ ডোরাদি ; একি কাণ্ড ! ওর পাল্লায় পড়লে কি করে ? কী অশান্তিতে যে কাটছে আমার তখন থেকে !"

"আমি ওর পাল্লায় পড়ব বিশ্বাস হয় জাহ্নবী ?···ওই আমার পাল্লায় পড়েছে এবার।"

"কি রকম ?"

"হ্যাঁ, আমিই ওকে আনিয়েছি, আমার কাকার বাসায় তুলেছি ; তোমাদের যেমন পরিচয় দিলাম আমার ফার্স্ট কাজিন বলে, ওঁদের কাছেও সেই পরিচয় দিয়েই। বলবে—ওঁদের তো জানা উচিত, ওঁরা যখন আমার আত্মীয়। কিন্তু আসলে ওঁদের সঙ্গে যতটা অন্তরঙ্গতা, ততটা আত্মীয় নন ওঁরা, আমাদের পরিবারের সবাইকে চেনেন না ; সেইটেই হয়েছে আমার সুযোগ। এই যে অল্প আত্মীয়তার ওপর বেশি অন্তরঙ্গতা জাহ্নবী, এটাও আমার জীবনের একটা আলাদা অধ্যায় কিন্তু সে-কথা এখন থাক। আপাততঃ অণিমাদি'র প্রণয়ী অ্যালফ্রেড কিরণময় পল অনুপম রয় হয়ে আমার আত্মীয়ের বাসায় রয়েছেন, আমার মধ্যস্থতায় পেয়িং গেষ্ট হয়ে ; ওজুহাত স্বাস্থ্যহানি। হানি নিশ্চয় তেমন কিছু তোমার চোখে পড়ে নি, কিন্তু স্বাস্থ্যকর জায়গায় আসাটাই যে স্বাস্থ্যহানির লক্ষণ আজকাল, তার বেশি কেউ দেখা দরকার বোধ করে না তো।"

ডোরা একটু চুপ করিয়া তাহার পর আবার বলিল—"তোমার কোনও প্রশ্ন জোগাচ্ছে না, নয় কি ? বেশ আমিই বলে যাই। কিরণময় এবার অণিমাদির উদ্দেশ্যে আসে নি, যদিও আসব আসব করছিল। মাসখানেক আগে ওর একটা সেই ধরণের চিঠি আমার হাতে এসে পড়ে, প'ড়ে বুঝলাম অন্ততঃ আরও মাসদুয়েক আগে থেকে সেই রকম হুমকি—কাঁদুনি-গাওয়া আরম্ভ হয়ে গেছে ; ঠিক করলাম এবার অণিমাদিকে বাঁচাতে হবে। এই সময় আমার আত্মীয়রা এলেন, আমিও আস্তে আস্তে আমার প্ল্যান তোয়ের করতে লাগলাম। প্রথমটা ওঁদের ওখানে যাওয়া-আসা আরম্ভ করে দিলাম—সেটা বাড়ালাম—তারপর ক্রমে সিস্টারদের চোখে একা যাওয়া-আসাটাও সইয়ে নিলাম। ইতিমধ্যে চিঠি আরম্ভ করে দিয়েছি ওদিকে। অর্থাৎ ওদের দুজনের কথা জানি আর

ওকে দেখেও ফেলেছি লুকিয়ে এবং ডেস্‌পারেটলি ভালবেসে ফেলেছি। উত্তর পেলাম, তারপর ব্যবস্থার কথা জানতে এসেও পড়ল একদিন।"

জাহ্নবী বিমূঢ়ভাবে চাহিয়াছিল, প্রশ্ন করিল—"অণিমাদি বাঁচলেন কি করে এত ঘায়ে?"

ডোরা বলিল—"তোমার এই প্রশ্নের মধ্যে যে আর একটা প্রশ্ন আছে তারও উত্তর দিচ্ছি জাহ্নবী—অর্থাৎ আমিই যে মরব না, কিংবা অলরেডি মরিনি তাই বা কি করে বিশ্বাস করবে? না, আমার জন্যে একটুও ভয় কোরো না, আমার একটা মস্ত বড় রক্ষাকবচ ঘেন্না, সে ঘেন্না যে কত উগ্র তুমি জাননা বলেই আমার পতনের আশঙ্কা করছ। কিরণময় তো সাক্ষাৎ নরকই, ওদের মধ্যে (অর্থাৎ বেটাছেলেদের মধ্যে) যে সবচেয়ে সাধু, তার ওপরও আমার ঘেন্নার অন্ত নেই। আমার বিশ্বাস ওরা একটি জিনিসে সব চেয়ে দক্ষ, সেটা মুখোস গড়তে। এই আমার কথা, আর অণিমাদি এ-ঝোঁকটায় এখন পর্যন্ত তো বেঁচেছেনই। ওর সেই হুমকি-দেওয়া চিঠিপত্র বন্ধ হয়ে গেছে, আর ও যে এখানে, সে-কথাও জানেন না উনি।"

"কিন্তু দেখে ফেলতে পারেন তো কোনদিন, যখন ও রয়েছেই এখানে।"

"আমি না গেলে বাসা থেকে বেরোয় না মোটেই, বই পড়ে বসে; অব্যেস নেই, প্রাণের দায়ে করছে অব্যেস।...ফুলের কীটকে বইয়ের কীটে পরিণত করেছি আমি, এও কি একটা কম কথা?"

"কিন্তু এই যে মেয়েরা বললে একদিন বোর্ডিঙে নিয়ে আসবে, পার্টির ব্যবস্থা করে—এইতেই প্রকাশ হয়ে যাবে নাকি?"

"এ প্রশ্নটা তোমার করাই উচিত হয়নি; এতটা কাঁচা কাজ ও করবে না, আমিই দোব করতে? তা ভিন্ন আর একটা কথা—ওতো বরাবরের জন্যে এখানে থাকছে না, যাওয়া-আসা করবে; যে কটা দিন থাকে, লুকিয়ে রাখা। অবশ্য যাবে পাহাড় থেকে নেমেই, তবে বলা হবে দার্জিলিং যাচ্ছে, কালিম্পং যাচ্ছে, ঘুম যাচ্ছে,—টাকাওলা শৌখীন স্বাস্থ্যান্বেষী আর কি। বুঝছ না জাহ্নবী?—আমার প্রতি টানটা বজায় রাখবার জন্যে, আরও উগ্র করে

তোলবার জন্তে মাঝে মাঝে বিরহের ব্যবস্থাও তো দরকার, মেয়েছেলে হয়ে এ কূটনীতিটুকুও বুঝছ না ?"

কথাটার মধ্যে কি পাইল, জাহ্নবীর মুখে অল্প একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল, সেটুকু মিলাইয়া গেলে বলিল—"কিন্তু ওকে ধ্বংস করছ কি করে ডোরাদি ? যে-পথ ধরেছ তাতে তো তোমারই বিপদ রয়েছে, অশুভতার প্রচুর সম্ভাবনা।"

"সে যদি ভালবাসার একটুও সম্ভাবনা থাকত জাহ্নবী, তুমি ঐ কথাটা বরাবর ভুলে যাচ্ছ। ও যে-সব মেয়েদের সর্বনাশ করেছে তারা ওকে ভালবেসেছে, অন্তত গোড়ায় বেসেছে, এখন নেই সে ভালবাসা, কিন্তু উপায়ও নেই আর,—যেমন ধরো অণিমাদির কথা। আমি তার জায়গায় ওকে ঘৃণা করি ; ওর আদ্যন্ত জানি, ওর সম্বন্ধে সতর্ক।···বিষকন্যা তো জান ? আমি সেই বিষকন্যার অভিনয় করছি। তাদের থাকত শরীরে বিষ, তিল তিল করে আহরণ করা, তাদের সংস্পর্শে এলেই ম'রতে হোত পুরুষকে। আমার মনে বিষ-ঘেন্না, আমি তাই দিয়ে ওকে শেষ করব।"

সমস্ত বোর্ডিং নিস্তব্ধ হইয়া গেছে। সেই স্তব্ধতার মধ্যে ডোরার মুখের ভাষা আর ভঙ্গি একটা ক্ষণিক বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াই যেন জাহ্নবীকে একটু মৌন করিয়া রাখিল। তাহার পর সে প্রশ্ন করিল—"কিন্তু, কি করে ? ঘেন্না না হয় রয়েছে বুঝলাম···"

"সেটা ডিটেলের কথা, প্ল্যানের কথা, নাই বা শুনলে। মোটামুটি তোমায় এইটুকু বলি—ওকে এমনভাবে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি যাতে আমার জন্যে ও এক সময় সবই করবে।"

জাহ্নবী তবুও মুখের পানে অবুঝভাবে চাহিয়া আছে দেখিয়া, ডোরা উঠিয়া ট্রাঙ্ক খুলিল, এক জোড়া রুলি বাহির করিয়া আনিল, তাহার হাতে দিয়া বলিল—"তার প্রমাণ এই আমার প্রথম উপহার।"

বিস্ময়ে যেন বাক্‌রোধ হইয়া জাহ্নবী চাহিয়া রহিল। সবুজ মখমলের একটি চমৎকার সৌখীন বাক্স, কলিকাতার একটি নামকরা বিলাতী দোকানের ছাপ, তাহার মধ্যে খাঁজে বসানো বিলাতী দামী ক্যারেট স্বর্ণের এক জোড়া রুলি।

প্রশ্ন করিল—"দিয়েছে!"

"একেবারে দেওয়াটা তো একটা সর্তের ওপর নির্ভর করে।·· তবে আমার জন্যেই, এবং আমার কাছেই আছে।"

"কোথায় পেলে?—এর দাম···"

"তা শ'তিনেক তো বটেই।···পেলে,—হয়তো কোন অণিমার হাত খালি ক'রে, কিন্তু একেবারে আনকোরা দেখে আমার অন্যরকম আশা হচ্ছে।"

"কি?"

"দোকান থেকে সরানো; কিংবা তার চেয়ে যা বেশি সম্ভব, কোন বড় মানুষের বাড়ির মেয়ের বিবাহের উপহারের গাদা থেকে হাতসাফাই করা। এদের যাতায়াত থাকে কিনা, তার ওপর বাড়ির চাকর কিংবা অনেক সময় আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগসাজোস থাকে, দুটো কেস্ আমারই জানা আছে।"

বিস্ময়ে রুদ্ধশ্বাস হইয়া জাহ্নবী ডোরার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, একটা যেন সম্পূর্ণ নূতন জগৎ আবিষ্কার করার বিস্ময়!

ডোরা বলিয়া চলিল—"তা যদি হয়তো বিধাতা আমার কত অনুকূল বুঝছই, গোড়াতেই কত বড় একটা অস্ত্র তুলে দিয়েছেন আমার হাতে। ধীরে সুস্থে এগুচ্ছি, ইতিমধ্যে আরও হোক সংগ্রহ।···বেশ আনন্দ পাচ্ছি জাহ্নবী, মেয়েদের হ'য়ে কিছু একটা করছি।···তুমি এবার যাও রাত হয়েছে। মনে রেখো শুধু তুমিই জানলে।"

বইটা খোলা রহিয়াছে, মুড়িয়া তুলিতে তুলিতে বলিল—"শৈলীকে আমি সত্যিই ভালবাসি জাহ্নবী, তাই সত্যি বড্ড আপশোষ হয় লোকটা মেয়ে হয়ে জন্মাল না!···ঘেন্না করব, আবার ভালোও বাসতে হবে—এ যে এক বিষম জ্বালা!"

আঠার

ডোরা পুরুষকে বোধ হয় কিছু কিছু চেনে। পুরুষকে লইয়া একটা বিদ্বেষ যে ওর মনে কিভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গেছে, তাহারই প্রেরণায় ও তাহাকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছে। হয়তো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও কিছু কিছু আছে—ডোরার বয়স এখন প্রায় বাইশ-তেইশ বছর—তাহার ওপর আছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি; ফলে পুরুষকে ও খানিকটা জানে. অন্তত এক শ্রেণীর পুরুষের একদিকের খানিকটা। চেনে না ও নিজের জাতকে।

অণিমার মনে শান্তি ছিল না। হাতের রুলি খুলিয়া দিবার পর, মাস দুয়েক পর্যন্ত কিরণময় চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর, প্রথমে খানদুয়েক চিঠি—খাঁটি প্রণয়পত্র, শুধুই ভাবের উচ্ছ্বাস; তাহার পর অভাবের কথা, সেও খানতিনেক, তাহার পর আসিয়া পড়িবার হুমকি। এদিক থেকে চিঠি দেয় না বড় একটা, বিপদ আছে; তবু একটা দিয়াছিল, কোন উত্তর নাই।

ডোরা একটা ব্যাপার লইয়া একদম মাতিয়া আছে, নয়তো নিশ্চয় লক্ষ্য করিত এবং টের পাইত অণিমা শান্তি হারাইয়াছে। কিরণময় আসিয়া পড়িলে একটা সভয় উৎকণ্ঠার যে ছায়া পড়িত ওর মুখে সেটা অবশ্য নাই, তবে নির্জনতা খোঁজে, অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে মাঝে মাঝে। এটা জাহ্নবীর চোখে একটু একটু ধরা পড়িয়াছে, ডোরার সঙ্গে আলোচনা করা দরকার মনে করে নাই, যে-হেতু কারণটা তো জানাই দুজনের।

তবে জাহ্নবীর জ্ঞানও ঐটুকু পর্যন্তই। ওরও গভীরে যে একটা ব্যাপার চলিতেছে তাহার সন্ধান সে পায় নাই সে ব্যাপারটা এই,—অনিমা সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

সে-সন্দেহ শুধু এই এইটুকু লইয়াই নয় যে তাহার এক আধখানা চিঠি বেহাতে গিয়া পড়িয়া থাকিতে পারে; আরও একটা সম্ভাবনার কথা, যাহা—

যে ভালবাসিয়াছে তাহার কল্পনাতেই উদয় হয়। অণিমার সন্দেহ কিরণময় আসিয়া যায় নাই তো কার্শিয়াঙে?—তাহার পর নূতন কাহারও মোহে পড়িয়া যায় নাই তো?

—অর্থাৎ যাহা ঘটিতেছে, নিতান্ত সন্দেহের বশে ওর মনটা সেই ব্যাপারের কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। ঈর্ষা মেয়েদের মনের গোয়েন্দা, পুরাপুরি যদি সফল নাও হয় তো খুব বেশি দূরেও পড়িয়া থাকে না।

ব্যাপারটা হইলও নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই,—রূপের স্বর্গের কাছাকাছি যখন শয়তানের আনাগোনা আরম্ভ হইয়া গেছে তখন সে যে নিশ্চেষ্ট থাকিবে না—এ আশঙ্কা অণিমার মনে অনেকদিন আগে থেকেই উঁকি মারিতেছিল, আজ ভালো করিয়াই আত্মপ্রকাশ করিল। ওর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি গিয়া পড়িল বোর্ডিঙের রূপসীদের ওপর—শীলা, অনুপা, ডোরা, ফ্ল্যারেন্স এমনকি জাহ্নবীর ওপরও অল্প একটু।

এই সময় "অনুপম"-ঘটিত ব্যাপারটা হইল। কথাটা বোর্ডিঙে ছড়াইয়া পড়িল, তবে কোন খারাপ টিপ্পনির সঙ্গে নয়, কেননা ডোরা গোড়া থেকে সামলাইয়া লইয়াছে তাহার পর টিপ্পনি উঠিবার আগেই আরও ভালো করিয়া সামলাইয়া লইল। দিন দুয়েক পরেই ওর আত্মীয়ের শ্যালিকা মিস সেনকে লইয়া ফিরিল বোর্ডিঙে, যেমন মাঝে মাঝে সঙ্গে করিয়া আনিত। সে বহুদিন আসে নাই এদিকে, প্রধানা ও অন্যান্য সিস্‌টারদের অনুযোগে নিতান্ত সাদা মনে বলিল—বাড়িতে এক নূতন অতিথি, ডোরার ফার্ষ্ট কাজিন মিস্টার রয়, তাই আর আসা হয় না। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশাতেও ঐ কথাই বলিল, কেননা বানানো কথা নয়, ঐটেই সত্য তাহার দিক থেকে। ভদ্রমহিলা সত্যই ভালো; বোর্ডিঙের সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে, সন্দেহের অবকাশ ঐখানেই নষ্ট হইয়া গেল। আলোচনা যাহা একটু আধটু হইল, তাহা ডোরার কাজিনের চেহারা লইয়া, স্টাইল লইয়া—শীলা, ক্লারা, চন্দ্রাদের মধ্যে ঠাট্টা-বিদ্রূপের আকারে। "অনুপম" ডোরারই ফার্ষ্ট কাজিন, ওদের তো আর নয়।

কিন্তু আর কাহারও মনে সন্দেহের উদয় না হইলেও, একজনের মনে সেটা একেবারে জমাট বাঁধিয়াই উঠিল,—অণিমা ভাবিল কিরণময়ের রহস্যের হদিস

পাইয়াছে। ওর ঈর্ষাদীপ্ত দৃষ্টিতে সমস্ত বিষয়টা জলের মতো পরিষ্কার হইয়া উঠিল, আর সবার ওপর সন্দেহটা মিটিয়া গিয়া জড়ো হইল ডোরার ওপর।... জাহ্নবী ব্যাপারটা বুঝিল না, তবে লক্ষ্য করিল, অণিমার চোখে যে একটা চিন্তান্বিত বিমর্ষভাব মাত্র ছিল এর আগে, সেখানে মাঝে মাঝে একটা যেন জ্বালা ফুটিয়া উঠিতেছে, ক্ষণিক হইলেও তাহা ভুল করিবার নয়।

ডোরা কিন্তু সতর্ক ছিল, এখানেও একটা উপযোগী চাল দিয়া বাজিমাৎ করিল। দিনকয়েক বাদে একেবারে অণিমাকেই গিয়া ধরিল, একবার তাহার আত্মীয়ের বাসায় যাইতে হইবে, মিস্ সেন গিয়া সিস্টারদের খুব তারিফ করিয়াছেন তাহার কাজিন "অনুপম"-এর কাছে, তিনি আলাপ করিতে ব্যগ্র, প্রধানা আর মধ্যমা তো বাহির হন না কোথাও, অণিমাদি যদি যান...

অণিমার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না ডোরার এই দুঃসাহসে, এমনভাবে মুখের পানে চাহিয়া রহিল যে ডোরা যেন তাহার অন্তস্তল পর্যন্ত স্পষ্ট দেখিতে পাইল। তাহার পরই অণিমা নিজেকে সংযত করিয়া লইল, বেশ সহজভাবে একটু হাসিয়া বলিল—"কেন?—তিনি নিজে তো আসতে পারেন, একসঙ্গে সবার সাথেই দেখা হয়।"

ডোরা একটু হাসিয়া বলিল—"পারবেন না কেন? খোঁড়া নয়, পা আছে; আর বলছেন বটে স্বাস্থ্য শোধরাতে এসেছেন, তবে শোধরাবার বিশেষ কিছু আছে ব'লে মনে হয় না, দিনকতক কাজের ঝঞ্ঝাট থেকে পালানো। সে-সব কিছু নয়, তবে আসবেন না, ঢের চেষ্টা করেছি অণিমাদি।"

"কেন?"

"বিশেষ অনুমতি নিতে হবে তো,—সেটা ওঁর মর্যাদায় বাধে।... মানী লোক মস্ত!"

—একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসিল।

অণিমা হাসিয়া বলিল—"আর আমাদের মান নেই?"

ডোরা দৃষ্টি নত করিয়া একটু চুপ করিয়া রহিল, অর্থাৎ কথাটা যেন মেয়ে হিসাবে লাগিয়াছে মর্মে; তাহার পর দৃষ্টি তুলিয়া একটু ম্লান

হাসির সঙ্গে বলিল—"ঠিকই বলেছেন আপনি ; এবার বললে তাই বলব।"

একটা বুদ্ধির দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, মনজানাজানির খেলা ; অণিমা স্থিরভাবে চাহিয়াছিল, হাসিয়া বলিল—"না, ওকথা আর ব'লতে হবে না ; না হয় যাওয়াই যাবে একদিন, তাতে আর হয়েছে কি ?"

আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল এবার, ডোরার মুখের ভাব কিন্তু এতটুকু বদলাইল না, কতকটা কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"হয় অনেক কিছু, তবে আপনি সে-সবের ওপরে। কী খুশীই যে হবেন অনুপমদা !"

চমৎকার অভিনয় করিল ডোরা। জিতিল আপাতত।

পরেও জিতিয়াই রহিল ; যখন সন্দেহ কাটিয়া গেছে তখন মনের এ-অবস্থায় কি আর শুধু নূতন আলাপের জন্য যায় অণিমা ?

এর পর একটা অদ্ভুত ব্যাপার হইল এবং সমস্ত ঘটনাটুকু দিন তিনেকের মধ্যে হঠাৎ চরমে উঠিয়া বোর্ডিঙের জীবনে একটা ওলট-পালট ঘটাইয়া দিল। জাহ্নবীর জীবনেরও এ-অধ্যায়টা শেষ হইল।

যেখানে হেতু থাকিতে পারে সেখানে ব্যর্থ হইয়া অণিমার সন্দেহটা একেবারে অহেতুকের কোঠায় গিয়া উঠিল। হঠাৎ জাহ্নবীর ওপর মনটা উঠিল বিষাইয়া। জানে ও নিষ্কলঙ্ক—তিন বছর আগে আদর করিয়া যে-কিশোরীটিকে আনিয়া বোর্ডিঙে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল তাহারই সারল্য ওর মুখে এখনও মাখানো আছে, তবু ওকে হঠাৎই যেন আর সহ্য করিতে পারিতেছে না অণিমা,—শুধু, ও এত সুন্দর কেন ?...অণিমার সন্দেহ-দিগ্ধ মনটা নিজের মধ্যে গুটাইয়া বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে—ওর ঈর্ষাটা কোথাও কিছু না পাইয়া নিছক সৌন্দর্য-ভীতিতে পরিণত হইয়াছে।...এত সুন্দর হওয়াটাই একটা মস্ত বড় অপরাধ এবং তাহার ওপর সবরকম অপরাধই চাপানো বেশ চলিল।

একদিন মুখটা অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া বলিল—"বেড়ানোটা তোমার

একদিকে বড্ড বেড়েছে জাহ্নবী, কমাতে হবে। এদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া তোমার মানায় না।"

জাহ্নবী অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিল। মনের অবস্থা ভালো নয় বলিয়া, ক'দিন থেকে বাহিরই হয় না। তাহা ভিন্ন এত রূঢ় কথাও অণিমাদির মুখে এই প্রথম, বরাবর স্নেহই পাইয়া আসিয়াছে, বলিল—"বেরুচ্ছি না তো অণিমাদি, ক'দিন থেকেই শরীরটা ভালো নয়। কাল অনুপা'রা ডাকতেও যেতে পারলাম না, জিগ্যেস করবেন তাকে।"

অণিমা আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল, বলিল—"সাক্ষী মানতে হবে না; এ-সব দোষও ঢুকেছে দেখছি! কাল যেতে পারনি,—কালকের কথা বলছি না, তার আগের কথা হচ্ছে।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই অণিমা চলিয়া গেল। এটা সকালের কথা।

পর দিন একটা ছোটখাট অভিযান ছিল, প্রায় মাইল তিনেক দূরে একটা ঝরণার ধারে গিয়া বৈকালিক জলযোগ, অণিমারই নেতৃত্বে। একরকম সকলেই গেল, জাহ্নবীও প্রথমটা প্রস্তুত হইল, তাহার পর মাথাব্যথার একটা মিথ্যা অজুহাত করিয়াই শুইয়া রহিল; আসলে আগের দিনে অণিমার কথাগুলা মনে বড় লাগিয়াছে, বরাবর আদরই পাইয়া আসিয়াছে, অভিমান হইয়াছে। না-যাওয়ার কথাটা কিন্তু অণিমাকে বলিল না, অতগুলা মেয়ের হুল্লোড়ের মধ্যে সে লক্ষ্যও করিল না।

বিকেলে নিজের কক্ষে শুইয়া শেলী লইয়াই পড়িতেছিল, এমন সময় দলটা ফিরিয়া আসার কলরোল উঠিল বোর্ডিঙের প্রাঙ্গণে। অনেক আগে ফিরিল বলিয়া জাহ্নবী একটু চকিতভাবেই ঘাড়টা বাঁকাইয়া দুয়ারের পানে চাহিয়াছে, দেখে অণিমা। অণিমার এমন চেহারা কখনও দেখে নাই জাহ্নবী, চোখে রাগ আক্রোশ, ঘৃণা—যেন দগ্ধ করিতে চায় দৃষ্টি দিয়া। চোখাচোখি হইতে ভিতরে আসিয়া বিছানার পাশে দাঁড়াইল, জাহ্নবীও উঠিয়া দাঁড়াইল, হতভম্ব হইয়া অল্প অল্প কাঁপিতেছে।

অণিমা শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"তুমি পিকনিকে গেলে না?"

জাহ্নবী স্খলিতস্বরে উত্তর করিল—"মাথাটা বড্ড…"

"অথচ যাবার জন্তে তো প্রস্তুত ছিলে।"

"হঠাৎই ধরল মাথাটা...তাই..."

"ভাঁওতা, জাহ্নবী, এ আমার কাছে চলবে না..."

ঠিক পথের ধারেই খোলা জানলাটার দিকে ইচ্ছা করিয়াই একটু চাহিয়া রহিল, যেন নিজের কথাগুলার টীকা হিসাবে; তাহার পর আবার জাহ্নবীর মুখের ওপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিল—"শিখলে কোথায় এসব ভাঁওতা?—আর কেনই বা? কী দরকার পড়েছে নূতন এমন?"

আর কিছু না বলিয়া দুয়ারের দিকে ঘুরিতে যাইবে, বইটার ওপর দৃষ্টি পড়িল। তুলিয়া লইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল—"ওই ডোরার শেলী!...ডোরা!"

—তাহার পর তাচ্ছিল্যভাবে বইটা বিছানায় নিক্ষেপ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

অণিমা নিজের জীবনের মাপকাঠি দিয়া জাহ্নবীর হিসাব লইল; উপায়ই বা কি?

পরদিন সকালেই বোর্ডিঙে একটা শঙ্কিত গুঞ্জন উঠিল—জাহ্নবীকে চলিয়া যাইতে হইবে; অণিমা প্রধানাকে বলিয়াছে সে আর তাহার দায়িত্ব লইতে অপারগ। কেন—সে-কথা যদি বলিয়াই থাকে, তাহা আর প্রকাশ পাইল না।

ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হইল না, আরও কদর্য হইয়া ফুটিয়া উঠিল। জাহ্নবীর অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও ডোরা অণিমার সঙ্গে নিভৃতে দেখা করিল, —বৈকালেই, সবাই যখন বাহির হইয়া গেছে, প্রাঙ্গণে কিংবা বাহিরে বেড়াইতে। বলিল—"আপনি অযথাই জাহ্নবীর ওপর রাগ করেছেন অণিমাদি..."

অণিমার চক্ষু দুইটা জ্বলিয়া উঠিল, বলিল—"এতক্ষণ যদিও একটু দ্বিধা ছিল ওর গতিবিধি সম্বন্ধে ডোরা, তোমার এই ওকালতিতে সেটুকু কেটে গেল; ওকে যেতেই হবে।"

"ও আপনার কোন ক্ষতি করে নি, বিশ্বাস করুন।"

সঙ্গে সঙ্গেই কিছু বলিতে পারিল না অণিমা, তাহার পর একটু শুষ্ক কণ্ঠেই প্রশ্ন করিল—"ক্ষতি! আমার!...আমার কী ক্ষতি করবে?"

"হ্যাঁ, আপনার ক্ষতি···মিষ্টার কিরণময় রায়কে নিয়ে···"

অণিমার সমস্ত মুখখানা এক মুহূর্তে রক্তহীন হইয়া গেল, জিভে ঠোঁট ভিজাইয়া কিছু বলিতে পারার আগেই কিন্তু ডোরা এক নিঃশ্বাসে সমস্তই বলিয়া গেল—জানলা দিয়া কি দেখিয়াছিল ছ'মাস আগে—"অনুপম" আসলে কে—কি উদ্দেশ্যেই-বা ডাকিয়া আনানো তাহাকে—অণিমাকেই বাঁচাইবার জন্য—পুরুষ সম্বন্ধে তাহার নিজের অভিজ্ঞতা—অভিমত কি সমস্তই ; বাদ শুধু চিঠিগুলার কথা আর জাহ্নবীর কথা।

অণিমার চোখের দৃষ্টি এক একবার অগ্নিবর্ষী হইয়া উঠিতেছে, এক একবার একেবারে যাইতেছে নিভিয়া। শেষ হইলে যেন একবার অন্তিম চেষ্টা করিল, বলিল—"তোমার দিকের কথাগুলো আমি তো একেবারেই আমল দিই না ডোরা ; আমার সম্বন্ধেও মিথ্যা রটনার কারচুপি আর আস্পর্ধা দেখে আমার মুখে রা ফুটতে চাইছে না···তুমি !···তুমি !···"

ডোরারই ঘর ; ডোরা আগাইয়া গিয়া ট্রাঙ্ক খুলিয়া কিরণময়ের দু'খানা আর অনুপমের কাছ থেকে পাওয়া রুলির বাক্সটা সামনে টেবিলের ওপর রাখিয়া বলিল—"চিঠি দু'খানা আপনার অণিমাদি, আর রুলির বাক্সটা আমি উপহার পেয়েছি।"

অণিমা কাঁপিতেছে। ওপরের চিঠিটার গায়ে শুধু একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইল একটু, তাহার পরই চিঠি আর রুলির বাক্স ডান হাতে সাপটাইয়া দাঁতে দাঁত পিষিতে পিষিতে দুমড়াইয়া জানলার বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"যা ভেবেছ তা নয় ডোরা—আমি কুলটা নই···আর যদি ভেবে থাক কোনও কুলটাকে আমি এ ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়াতে দোব তো সেটাও ভুল তোমার। মিশন নিয়েছেন জীবনে !—ব্রত।···"

বিদায়ের আগে ডোরা জাহ্নবীকে নিজের ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বলিল—"যাচ্ছ, যাও জাহ্নবী ; তোমায় পারা যেত বাঁচাতে প্রধানার সামনে সব কথা প্রকাশ ক'রে। কিন্তু যাওয়াই ভালো তোমার এ বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্য থেকে। তোমায় শুধু একটা কথা বলবার জন্যে ডেকেছি,—অণিমাদি'র ওপর

রাগ রেখো না পুষে, ওর দোষ নেই, খালি এইটুকু মনে রেখো, পুরুষ মেয়েদের কতো অধঃপাতে নিয়ে যেতে পারে।...শিক্ষা-ধর্মের প্রতিষ্ঠানও ওদের লালসার দৃষ্টি থেকে কাউকে বাঁচাতে পারে না।"

তিন বৎসর পূর্বে—আসবার আগের দিন এমনই করিয়াই নারায়ণী অণিমার হাতে ধরিয়া বলিয়াছিল—"পুরুষের ওপর ওর অবিশ্বাস আর ঘেন্না জমে উঠেছে দিন দিন, আপনি ওকে মানুষ করে দিন দিদি।"

দিন চারেক পরে বোর্ডিঙে আর একটা ঘটনা ঘটিল,—সকালে উঠিয়া সবাই দেখিল, অণিমা নেই। সেই দিন বিকালের, দিকে একটু তাড়াতাড়িই ডোরা তাহার আত্মীয়ের বাসায় গিয়া শুনিল, "অনুপম" হঠাৎই দুপুরের গাড়িতে কার্শিয়াং ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেছে।

উনিশ

জাহ্নবীর প্রতি অন্যায়ের জন্য অণিমা যে বিবেকদংশনের জ্বালা অনুভব করিল না এমন নয়, কিন্তু সে দংশনও অগভীর, তাহার জ্বালাও ক্ষণস্থায়ী। মনটা অসহ্য গ্লানিতে ভরিয়া রহিয়াছে, অনুশোচনার চিন্তা তো থিতাইয়া বসিতেই পারিতেছে না, বরং জোর করিয়া এই চিন্তাটাই বারবার মনে আনিয়া ফেলিতেছে—না, জাহ্নবীও আছে এর মধ্যে, ডোরার সঙ্গে যখন এত ভাব ভেতরে ভেতরে, ও-ও নিশ্চয়ই আছে।

তবু হয়তো নিতান্ত লোক-দেখানোই, একটি মেয়েকে দিয়া বলিয়া পাঠাইল জাহ্নবী যদি চায় তো অণিমা সঙ্গে করিয়া দিয়া আসিতে পারে। জাহ্নবী উত্তর করিল—"বোলো, আমি কি বুঝি না এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকলে ওঁর কী কষ্টটা হবে?"

অভিমানের কথা, কিন্তু অণিমা আর কিছু বলিল না।

ঠিক হইল বোর্ডিঙের নেপালী কীপার তেজবাহাদুর তাহাকে রাখিয়া

আসিবে। অন্তরের নিদারুণ অভিমানে এটাও প্রত্যাখ্যান করিল জাহ্নবী, কিন্তু জোর করিয়াই তেজবাহাদুরকে সঙ্গে দেওয়া হইল।

ছোট রেল থেকে বড় রেলে বদলি হইয়া জাহ্নবী তেজবাহাদুরকে ফিরাইয়া দিল; বুঝাইল আর দরকার নাই, এই গাড়িই তো একেবারে শেষ পর্যন্ত যাইবে, যাত্রাটাও কাটিয়া যাইবে একটি ঘুমে। লোকটা আসিবার সময় যেমন ওদের কথা বুঝিয়াছিল, এখন জাহ্নবীর কথাও তেমন বেশ সহজেই বুঝিল, নির্বিচারে ফিরিয়া গেল।

প্রথম খানিকটা এই গত দুইদিনের কথা আলোচনা করিয়াই কাটিল, প্রতি পদেই একটা ক্ষুব্ধ অভিমান ঠেলিয়া উঠিতেছে মনে; কেহই তো নিজের নয়, তাই কাহারও ওপর নিঃশেষ হইতে পারিতেছে না বলিয়া ক্রমাগতই আবর্ত সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। তাহার পর হঠাৎ সামনের বেঞ্চের একটি যাত্রীর মুখের ওপর দৃষ্টি পড়ায় একেবারেই যেন একটা ভীতি-শিহরণের সঙ্গে চিন্তার মোড় গেল ঘুরিয়া;—লোকটা একটু প্রচ্ছন্ন লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, চোখের একটু কোণেই, কিন্তু তাহাতেই বিদ্যুতের কড়া আলো যেন নীল হইয়া ঠিকরাইয়া পড়িতেছে।

জাহ্নবী সঙ্গে সঙ্গে অভিমানের বিলাস থেকে রূঢ় বাস্তবে জাগিয়া উঠিল।···তাহার রূপ!—মনে ছিল না এতক্ষণ। জানালার দিকে মুখটা আরও একটু ঘুরাইয়া স্থির হইয়া বসিল জাহ্নবী, নিজের ভয়ে যেন নিজেই আড়ষ্ট হইয়া গেছে, অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় অপসৃয়মান দৃশ্যের ওপর চক্ষুগোলক দুইটা স্থির হইয়া পড়িয়া আছে।···কী করে এখন সে? আজ এই রাত্রিটুকুর অবকাশ, তাহার পরেই তো লুব্ধ জনারণ্যের মধ্যে সে একা!···এই তাহার রূপ—তাহার শত্রু ছায়ার মতো নিত্যসঙ্গী, ছায়ার চেয়েও দেহলিপ্ত, অপরিহার্য—এ শত্রুকে লইয়া সে কোথায় গিয়া দাঁড়ায়? ··ছেলেবেলায় সে মায়ের বিপদটা একভাবে উপলব্ধি করিত, বোর্ডিঙে বয়সের সঙ্গে নারীচৈতন্যের উন্মেষ হওয়ায় বুঝিতেছে আরও নিবিড়ভাবে; আজ কিন্তু একেবারেই আপনার করিয়া, নিজের অন্তরের সমস্ত অনুভূতি দিয়া উপলব্ধি করিয়া জাহ্নবীর মনটা ক্রমেই অসার হইয়া আসিতে লাগিল।···তিনটা জিনিস যেন আলাদা—সে, তাহার দেহলগ্নরূপ, আর সেই

রূপ-লগ্ন কলুষ দৃষ্টি—যত পুরুষের—ছেলে নাই, যুবা নাই, বৃদ্ধ নাই···বোর্ডিঙের নিশ্চিন্ত জীবনে যে রূপ ছিল আনন্দ, এক মুহূর্তের বিভীষিকা হইয়া তাহা জাহ্নবীর সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করিয়া লইল।···একটা অব্যক্ত প্রার্থনা ঠেলিয়া উঠিতেছে—মনে পড়িতেছে শ্রীবৎস-চিন্তার উপাখ্যান—একদিন বড় কষ্টেই দিদিমণির কাছে মা তোলে সেই কথা—কী অপরিসীম অসহায়তাই না শ্রীবৎস-পত্নী চিন্তা কুরূপ প্রার্থনা করিয়া লইয়াছিলেন! জাহ্নবীর মন থেকেও সেই প্রার্থনাই উঠিতেছে আজ···'কে কোথায় আছ, আমারও রূপ নিয়ে কুরূপ ভিক্ষা দাও—আমি তো চাইছি না কিছু—রূপ ফিরিয়ে দিয়ে কুরূপ—এ তো কিছু চাওয়া নয়—আমায় দাও—পুরুষের হাত থেকে আমায় বাঁচাও···'

অনেক রাত্রে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, জানলার গায়ে মাথাটা পড়িয়াছে ঢলিয়া। যখন নিদ্রা ভাঙিল দেখে সকাল হইয়াছে, গাড়িটা একটা খুব যেন বড় ষ্টেশনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, চারিদিকেই রেল পাতা, রেলের গাঁটে গাঁটে গাড়ির চাকার খট্‌খটানি।···প্রথম ঘোরটা কাটিয়া যাইতেই ধীরে ধীরে সব কথা মনে পড়িল, ধীরে ধীরে রাত্রির সেই আতঙ্ক উঠিতে লাগিল জাগিয়া। মনটা আবার অসাড় হইয়া আসিতেছে; কিন্তু সেটা রাত্রির অবস্থায় আসিয়া পড়িবার আগেই চিন্তার মোড় ফিরিল। গাড়ির গতিবেগ কমিয়া আসিতেছে, সবাই মোটঘাট গুছাইতেছে, বুঝিল শেষ ষ্টেশন শিয়ালদহ গিয়াছে আসিয়া। কি মনে হওয়ায় একটু ভালো করিয়া ঘুরিয়া দেখিল সেই লোকটা নাই, রাত্রে যে চোখের দৃষ্টি দিয়া জাহ্নবীর চিন্তার স্রোত দিয়াছিল খুলিয়া। দিনের বেলা, তায় সেই লোকটা নাই, ওরই মধ্যে কেমন একটু স্বস্তি বোধ হইল। গাড়ি আসিয়া প্ল্যাটফরমের পাশে দাঁড়াইল।

বোধ হয় শেখা শৃঙ্খলা-বোধের জন্যই জাহ্নবী সবাইকে আগে নামিয়া যাইতে দিল। সেকেণ্ড ক্লাস, অল্পই লোক ছিল, গাড়িটা খালি হইয়া গেল। তখন একটা কথা মনে হইয়া সমস্ত শরীরটা আবার হিম হইয়া গেল,—দিনের বেলা সে যাইবে কোথা? দিনে দিনে গিয়া এই বেশে, এইভাবে তো সে বনের মধ্যে প্রবেশ করা যাইবে না।

যে ভাবে ক'টা দিন গেছে, ভালো করিয়া কিছুই ভাবিয়া স্থির করা হয়

নাই, একে একে সব সমস্যাগুলো চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। আবার সঙ্গে ঐ একটা ট্রাঙ্ক; কোথায় যাইবে ওটা লইয়া—দিনের বেলায়—সেই পথহীন বিজন বনে!

কুলীরা তাগাদা দিতেছে—"কুলী—মেম-সাহেব?"

কপালে ঘাম জমিয়া উঠিতেছে, চারিটা আঙ্গুল দিয়া মুছিয়া জাহ্নবী বলিল—"হ্যাঁ, একজন—এই ট্রাঙ্ক আর বেডিংটা।"

বসিয়া থাকাতো চলিবে না—নামিতে নামিতে চলিতে চলিতে করিতে হইবে।

প্ল্যাটফর্মের ভিড় একটু বোধ হয় পাতলা হইয়াছে বিলম্বের জন্য, তবু আছে। সবাই ব্যস্ত তবু তাহারই মধ্যে একটু ঘুরিয়া সুন্দর মুখ দেখার জন্য মাঝে মাঝে মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হইতেছে, ভিড়ের মধ্যে একটা চলতি জোট পাকাইয়া যাইতেছে। প্ল্যাটফর্মের গেটের বাহিরে আসিয়া কুলি প্রশ্ন করিল—"ট্যাক্সি, না ঘোড়ার গাড়ি মেমসাহেব?"

বাঁচাইল কুলিটা, এমনই তো মাথাতে কিছুই আসিতেছে না; জাহ্নবী বলিল—"ইয়ে···না, ঘোড়ার-গাড়ি।"

—বিপদের মধ্যে বুদ্ধি খুলিতেছে; ঘোড়ার গাড়িতে ভাবিবার সময় পাওয়া যাইবে।

কুলিটা বোধ হয় একটু নিরাশ হইল, কেন না গতিটা একটু শ্লথ হইল—ঘোড়ার গাড়ির খদ্দের কালা-মেমসাহেব আর কতই-বা দিবে?

ভালোই দিল কিন্তু জাহ্নবী, বোর্ডিঙে মেমসাহেবেরই মন অর্জন করিয়াছে; দুইটা টাকা সুদ্ধ সেলাম করিয়া কুলি কোচম্যানকে বলিল—"ঠিক সে পৌঁছা দেও মেমসাহেবকো।"

প্রশ্ন হইল—"কাঁহা?"

কুলি অন্তর্বর্তিনী জাহ্নবীকে প্রশ্ন করিল—"কাঁহা হুজুর?"

জাহ্নবীর মুখটা ফ্যাকাশে হইয়া গেছে, ফ্যালফাল করিয়া চহিয়া রহিল।

"নয়া আয়েহেঁ······কোন রাস্তা—চৌরঙ্গী, না ধরমতলা, না পার্কসিট্র?"

জাহ্নবী চাহিয়া আছে। ইচ্ছা করিতেছে যে কোন একটা নাম করিয়া দিই

ইহারই মধ্যে, গাড়ি চলুক, খানিকটা সময় পাই; কিন্তু গলা যেন শুকাইয়া গেছে।

"ভুল গেয়া? আচ্ছা, ইসপার না হাওড়া?"

"হাওড়া···হাওড়া স্টেশন।"

—কুলিটা দেবদূত হইয়া আসিয়াছে।···এখনই তো লোক জড় হইয়া যাইত।···জাহ্নবীর একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়িল।

"হাওড়া টিশন পৌঁছাও মেমসাহেব কো।"

"কতক্ষণ লাগবে?" জাহ্নবী প্রশ্ন করিল।

"এই আধঘণ্টা হুজুর···জোরসে চালাও জী; জলদি পৌঁছাও মেমসাহেবকো।"

"না, আস্তেই চালাক, রাত্তিরে ঘুম হয়নি।"

—একটু আগের বিহ্বলতার একটা কারণও দেখান হইল; কিছু অপ্রতিভই তো হইয়া পড়িয়াছে।

"আস্তে চালাও, শুনা? মেমসাহেবকা তবিয়াৎ ঠিক নেহি হ্যায়, ধীরে হাঁকাও।"

লম্বা হুকুম করিয়া, লম্বা একটি সেলাম করিয়া কুলিটা চলিয়া গেল।

হাতে একটা ঘড়ি আছে, পরীক্ষায় পুরস্কার পাইয়াছিল; মিনিট চল্লিশ লাগিল হাওড়ায় পৌঁছাইতে। জাহ্নবী পুরাপুরি একটা ছক দাঁড় করাইয়া লইল।···অত ভিড়ের মধ্যে, অত ব্যস্ততার মধ্যে, গাড়িঘোড়ার বিপদের মধ্যে পথচারীদের লুব্ধ দৃষ্টি আসিয়া মুখের ওপর পড়িতেছে; দেখুক গিয়া, আর গ্রাহ্য করে না জাহ্নবী, দিনের বেলায় কোন আশঙ্কা নাই, শুধু কেমন একটা ঘৃণা বাড়িয়া যাইতেছে। স্টেশনে নামিয়া একটা কুলি করিল, একটা সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট করিল, তারপর জিজ্ঞাসা করিয়া একেবারে সেকেণ্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমে গিয়া উঠিল।

সমস্ত দিনটা কাটাইল। কোথা থেকে বেশ একটা সহজ সাহস আসিয়া গেছে, তাহা ভিন্ন বাড়ি পৌঁছান পর্যন্ত সমস্ত প্ল্যানটা ঠিক করিয়া লইয়াছে, আর সেই অসহায় উদ্বেগের ভাবটা নাই। বেশ ভালোভাবেই স্নানাহার

করিল, সেকেণ্ড ক্লাসের কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে আলাপও হইল, মেয়েছেলে, আবার পুরুষও ; পুরুষদের মধ্যে দু'একজনের গায়ে-পড়া অভিনিবেশ হজমও করিল, এক দিনের অভিজ্ঞতাতেই জাহ্নবী অনেকটা তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। এমন গুছাইয়া মনগড়া পরিচয় দিল যে নিজের কল্পনাশক্তিতে নিজেই বিস্মিত হইয়া গেল···পাটনায় যাইবে ; একা তো ভয় কি ? আটটায় এক্সপ্রেস, ভোরে নামিবে, মোটর লইয়া স্টেশনে লোক আসিবে। তা ভিন্ন পথও নূতন নয়।···একুটা টাইমটেবল কিনিয়া বেশ অভিজ্ঞ সাজিয়া বসিয়াছে।

তোরঙ্গটা একদিকেই রাখা ছিল, সন্ধ্যা হইতেই জাহ্নবী সেটা খুলিল। একটা মাঝারি সাইজের চামড়ার ব্যাগ আছে, খান তিন সাড়ি জামা বাহির করিয়া তাহাতে পুরিল, বইখাতাও যতগুলি আঁটিল লইল ; যেগুলি লইতে পারিল না, সেগুলির নিজের নামাঙ্কিত পাতাগুলি ছিঁড়িয়া ব্যাগের মধ্যে লইল, আরও নিতান্ত টুকিটাকি যা ধরিল ব্যাগটাতে ; তাহার পর তোরঙ্গটায় চাবি আঁটিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পাশের বেঞ্চটিতেই একটি পরিবার,—স্ত্রী, কর্তা, তিনি-চারটি ছেলে-মেয়ে, আলাপ হইয়াছে। আগে থাকিতেই গাওয়া ছিল, ব্যাগটা লইয়া, বেশ স্টাইলের সঙ্গে হাত-ঘড়িটা দেখিয়া লইয়া বলিল—"খড়্গপুর থেকে আমার যে আত্মীয় আসবেন তাঁকে দিয়ে আসি। জিনিসগুলো, বেডিংটা আর ট্রাঙ্কটা রইল, দেখবেন একটু দয়া করে।"

বোর্ডিংএ যা কিছু অর্জন করিয়াছিল প্রায় সমস্তরই মায়া কাটাইয়া জাহ্নবী বর্ধমানগামী একখানি লোকাল ট্রেনে গিয়া বসিল ; বিশেষ কষ্টও হইল না জিনিসগুলার জন্য—সমস্ত বোর্ডিংটার ওপরই অন্তত সাময়িকভাবে কেমন একটা বিতৃষ্ণা ধরিয়া গেছে।

কুড়ি

গন্তব্য স্থানে রাত আটটার সময় নামিল জাহ্নবী, আজ ঠিক তিন বৎসর পরে ; প্রায় ছয় বৎসর আগে একদিন নামিয়াছিল ; সমস্ত দৃশ্যটি মনে পড়িয়া গেল। পথটা ভালো রকম জানা নাই, তবে কোন্‌দিকের পর কোন্‌দিকে,

মোটামুটি একটা ধারণা আছে। সবার দৃষ্টির নিচে দিয়া বেশ সহজ গতিতে স্টেশনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

এইখানে একটু গোল বাধিল শেয়ালদহের পর এই প্রথম। গাড়ি, রিকশা বাড়িয়াছে, একটু যে কাড়াকাড়ি পড়িল তাহাতে আবার প্রায় বিপর্যস্ত করিয়া দিল জাহ্নবীকে। তবে, ঐ যে একদিনের রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে পরিচয়ে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে, সামলাইয়া লইতেও দেরি হইল না; "দরকার নেই, কোয়ার্টার্সে যাব"—বলিয়া বেশ দৃঢ় পদক্ষেপেই বাহির হইয়া আসিল। কেন যে অত শীঘ্র নিষ্কৃতি পাইল সেটা বুঝিল দু-দিন পরে।

রাস্তাটা বদলাইয়াছে, আগে ছিল এবড়ো-খেবড়ো ইটের খোয়ার, এখন বেশ মসৃণ, পিচ-ঢালা। একটা বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে—আগের তুলনায় আলো আর লোক চলাচল কি বেশি? ঠিক মনে পড়িতেছে না, সেটা কোথায়-সেই ছয় বৎসর পূর্বের কথা। খানিকটা গিয়া হঠাৎ গা'টা ছমছম করিয়া উঠিল—মনে হইল রাস্তা যেন আর ফুরাইতে চাহিতেছে না। পুরানো বাড়িগুলার সংখ্যা অল্প হইয়া আসিয়া যেখানে, তাহার আন্দাজমতো, বন-রেখাটা আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল, সেখান থেকে যেন আরও সব নূতন নূতন বাড়ি আরম্ভ হইয়াছে; আর, দূরে সামনের পানে খানিকটা ডান দিক ঘেঁসিয়া ওকি—যেন আলোর উৎসব পড়িয়া গেছে! এ কোন্ জায়গা! জাহ্নবী ভুল স্টেশনে নামিয়া পড়ে নাই তো! হাত পা যেন অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। ঘোড়ার গাড়ি রিক্শা—যেগুলা যাত্রী লইয়া স্টেশন হইতে বাহির হইয়াছিল, সব আগাইয়া গেছে। তবে লোক চলাচল আছে; মাঝখানে হঠাৎ দাঁড়াইয়া ভাবিবার উপায় নাই বলিয়াই জাহ্নবী আগাইয়া চলিল, বেশ বুঝিতেছে ক্রমাগতই একটা অনিশ্চিত বিপদের গহ্বরে নামিয়া যাইতেছে। লক্ষ্য করিল বেশির ভাগ লোকের পোষাক পরিচ্ছদ অন্ত ধরণের,—রং-বেরং ছাঁটের খাকী কোট-প্যান্ট, যত আগাইয়া যাইতেছে এইটাই যেন বাড়িয়া যাইতেছে। জাহ্নবীর পা দুইটা কাঁপিতে লাগিল—ভুল স্টেশনেই নামিয়াছে! এক সময় সব দ্বিধা সংকোচ কাটাইয়া হঠাৎ থামিয়া পড়িল। ফিরিতেই একটি লোকের সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইল, বেশ বোঝা গেল নিতান্তই একটা ভদ্রোচিত

ব্যবধান রক্ষা করিয়া লোকটা পেছন পেছন আসিতেছিল; অপ্রতিভভাবে একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া ইংরাজীতে প্রশ্ন করিল—"কোথায় যাবেন?"

সৈন্য বিভাগের লোক, ভারতীয়, হয়তো বাঙালী, ছোটখাট অফিসার হইতে পারে, কার্শিয়াংয়ে এ ধরণের লোক দেখিয়াছে মাঝে মাঝে। জাহ্নবীর আপনাআপনি যাহা জোগাইয়া গেল তাহাই বলিল—"স্টেশনে যাব।"

পরিষ্কার উচ্চারণে ইংরাজীতেই বলিল।

"সঙ্গে করে দিয়ে আসতে পারি আপনাকে? একা রয়েছেন।"

"না, ধন্যবাদ।"

তার পর আরও জোগাইয়া গেল।

"স্টেশন মাস্টারের মেয়ে আমি, বেড়াতে এসেছি—রোজ আসি।...তবুও ধন্যবাদ।"

আর অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি পা চালাইয়া দিল। স্নায়ুর অবস্থা এমন হইয়া গেছে মনে হইতেছে এখনই পড়িয়া যাইবে।...লোকটা কি আর বিশ্বাস করিয়াছে? হাতে এমন একটা ব্যাগ লইয়া কে আর বেড়াইতে বাহির হয়? একটু আগাইয়া পা চালাইয়া দিল, তাহার পর অনেক দূরে গিয়া আলোটা যেখানে একটু পাতলা হইয়া গিয়াছে সেইখানে দাঁড়াইয়া ঘুরিয়া দেখিল—না, লোকটা চলিয়া গেছে; বিশ্বাস করুক আর নাই করুক স্টেশন মাস্টারের নাম লওয়ায় কাজ হইয়াছে, ওর সাহসটাকে আর বাড়িতে দেয় নাই।

আরও বেশ খানিকটা আগাইয়া গেল, তাহার পর নিতান্ত গেঁয়ো ধরণের একজন সাধারণ পথিক দেখিয়া, মরিয়া হইয়াই তাহাকে দাঁড় করাইল—"শোন।"

লোকটা দাঁড়াইয়া পড়িল।

"কি কর তুমি?"

"আজ্ঞে, এই মিলিটিরিদের ডিম, মুরগী জোগান্ দি, তাই দিয়ে এসেচি।"

"কি নাম জায়গাটার?"

নাম যাহা বলিল তাহাতে জাহ্নবী বুঝিল ভুল স্টেশনে নামে নাই। ব্যাপারটাও কতক কতক আন্দাজ করিল, প্রশ্ন করিল—"এখানে মিলিটারি ছাউনি পড়েছে, না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আর ই সবই তো মিলিটিরি হ'য়ে যাবে, জঙ্গল কেটে সাবাড় ক'রে দিলো আজ্ঞে। সব জায়গা কিনে নিল কিনা সরকার বাহাদুর।"

"সব জঙ্গল কাটা হয়ে গেছে?"

"তা সবই বলব বইকি, ঐ উদিকে এক খামচা পড়ে আছে, তাতেও কোপ পড়তে শুরু হয়েছে আজ্ঞে। আপনি লোতুন এয়েছেন হেথা?"

"হ্যাঁ···আমার দাদা এখানে বাড়ি তোয়ের করবার ঠিকে নিয়ে এসেছেন, খুঁজছি তাঁর বাসাটা।"

কথাগুলার মধ্যে পুর্বাপর অসঙ্গতি রহিয়াছে, বেশ ভাবিয়া তো বলিতে পারিতেছে না; তবে লোকটা যে স্তরের, গ্রাহ্যও করিল না জাহ্নবী।

প্রশ্ন হইল—"আজ্ঞে তানার নাম? দেখি চিনি কিনা, অনেক বাড়িতেই তো জোগান্ দি।"

একটা নাম বলিল জাহ্নবী।

লোকটা একটু চিন্তা করিল, তাহার পর মাথাটা দুলাইয়া বলিল—"আজ্ঞে না, চিনতে নারলাম।"

"সে আমি খুঁজে নেবো'খন; নতুন এসেছেন, চিনবে না তুমি; যাও।"

লোকটা চলিয়া গেলে একটু দাঁড়াইয়াই রহিল জাহ্নবী। জায়গাটা ঠিক স্টেশন আর যেখানটা মিলিটারি ছাউনি পড়িয়াছে, তাহার মাঝামাঝি। অপেক্ষাকৃত নির্জন আর বিরল-বসতি; কিছু বাড়ি উঠিয়াছে, কিছু কিছু উঠিতেছে, নূতন রাস্তার ছক কাটা হইয়াছে মাঝে মাঝে, অনেক জায়গায় কাটা গাছ এখন সরানও হয় নাই।

মনের অবস্থাও অদ্ভুত রকম হইয়া গেছে জাহ্নবীর। বেশ বুঝিতেছে পৃথিবী থেকে তার শেষ আশ্রয়টুকুও গেছে মুছিয়া। কার্শিয়াংএ থাকিতেই শুনিয়াছিল কলিকাতার চারিধারেই গবর্ণমেন্ট বড় বড় পড়তি জায়গা দখল করিয়া অনেক স্থলে বসতি পর্যন্ত উজাড় করিয়া সেনা ছাউনি বসাইতেছে; এও সেই ব্যাপার। বেশ বুঝিল সে আজ একা, নিরাশ্রয়; এই ধ্বংস আর নিষ্করুণ, সৃষ্টির মুখে মা, দাদু, দিদিমণি যে কোথায় তলাইয়া গেছে তাহার আর সন্ধান পাওয়া

যাইবে না। ভিতর থেকে একটা কান্না ঠেলিয়া উঠিতেছে, কিন্তু চোখে যেন জল খুঁজিয়া পাইতেছে না, সমস্তটা গেছে শুকাইয়া।

আর একবার, শেষবারের মতো জাহ্নবী বাস্তবের সামনে যেন জাগিয়া উঠিল, আর সে-আশ্রয় লোকালয়ে নাই তাহার। মনে কেমন একটা নূতন ধরণের চঞ্চলতা আসিয়া গেছে—লোকালয় নয়, চাই অরণ্য। ছেলেবেলাকার সেই অরণ্য-আশ্রিত ভাঙা বাড়িটির নিশ্চিন্ত শান্তির কথা মনে পড়িল। মুছিয়া গেছে সেটুকু; কিন্তু তাহাই চাই। আর সে জীবন সম্ভব কি অসম্ভব তাহা ভাবিয়া দেখিল না জাহ্নবী, শুধু একটি কথাই মনে উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে—ঐ রকম একটি নিশ্চিন্ত নীড় চাই।—পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোক—অরণ্যজননী আবার ওকে নিবিড় আহ্বানে ডাক দিতেছে।

ঐ লোকটা বলিল না?—এক খামচা এখনও আছে পড়িয়া। আজ রাত্তিরে ঐ আশ্রয়।...জাহ্নবীর বোধ হয় একটু মস্তিষ্কবিকৃতিই হইয়াছে; নির্দিষ্ট দিকে একটা নূতন পাকা রাস্তার উপর দিয়া পা বাড়াইল।

রাত হইয়াছে। নূতন শীতের রাত, বাড়িঘর যা আছে সেগুলার দুয়ার-জানলা বন্ধ হইয়া গেছে বা হইয়া আসিতেছে।...ক্রমে বাড়িও আর নাই; ইট পড়িয়াছে, মালমশলা জড় হইয়াছে, কোথাও বা বনেদ খোঁড়া হইয়াছে। যত এগোয় আরও নির্জন, আরও নীরব। ক্রমাগতই এদিক ওদিক রাস্তা বাহির হইয়াছে, নিশিতে-পাওয়ার মতো সেই সব রাস্তা দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল জাহ্নবী; এক একবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার একই জায়গায় ফিরিয়া আসিতেছে।...কোথায় সেই এক খামচা বন?—মানুষের গ্রাস থেকে পরম আশ্রয় জাহ্নবীর—অন্ততঃ একটা রাতের জন্তও......

হয়তো ভুল তবু আহত চেতনায় জাহ্নবীর যেন মনে হইল প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘুরিয়াছে এইভাবে—শরীর-মন অবসন্ন—একটা নেশায় পাইয়াছে যেন; তবু ছাড়িবে না—ছাড়িয়া-আসা লোকালয়টা ওর যেন বিভীষিকাময় হইয়া উঠিয়াছে, আলোগুলা পর্যন্ত যেন মনে হয় কাহাদের লোলুপ দৃষ্টি; আর ফেরা চলিবে না।

এই সময় মনে হইল অন্ধকারটা সামনে খানিকটা দূরে যেন গাঢ়তর হইয়া

উঠিয়াছে ; আশায় বুকটা দুলিয়া উঠিল,—নিশ্চয়ই সেই এক থামচা বন ; নূতন উৎসাহে আগাইয়া চলিল জাহ্নবী। পথ শেষ হইয়া গেছে, আগাছা আরম্ভ হইল, তাহার পর একজোটে কতকগুলা পুরনো গাছের পাশ দিয়া ওদিকে যাইতেই জাহ্নবীর কানে হঠাৎ যেন সুরসঙ্গীত আসিয়া বর্ষিত হইল—

অন্নদাঠাকরুণের গলা—"আমি নড়ব না—নড়ব না !···ও দিক আমায় বাড়িচাপা—আমায় পুতে তার ওপর বাড়ি তুলুক।—আমি নড়ব না!······"

বন বাদাড় ঠেলিয়া জাহ্নবী গিয়া ভাঙা বাড়ির পেরেক-বের-করা বন্ধ দরজায় মাথা বুক চাপিয়া ডাকিল—"দিদিমণি ! মা !···দাদু !"

শুনিতে পায় নাই, আওয়াজ বোধ হয় খোলেও নাই, গলা একেবারে কাঠ হইয়া গিয়াছে জাহ্নবীর। ডাকিল না আর, দরজায় কপাল ঠেকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অন্নদাঠাকরুণ চীৎকার করিয়া যাইতেছে—"ওর বাড়ি !—দখল করবে !—টাকা দেখাচ্ছে !—টাকা !···আমার নাম অন্নদাঠাকরুণ, আমি দেখব টাকার জোর কত !······"

জাহ্নবী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কর্ণ দিয়া অমৃত পান করিতেছে। কোথায় ছিল এত অশ্রু তাহার ? অবিরল ধারে যেন বুক ভাসাইয়া দিতেছে। শরীর হইয়া উঠিয়াছে অবশ ; আর দুঃখে নয়, জীবনের যা কিছু দুঃখ, যা কিছু গ্লানি সব ধুইয়া মুছিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে জাহ্নবীর। আরও শুনুক—আরও—আরও—এত মিষ্ট কি আর কিছু শুনিয়াছে—কখনও ?···অনেকক্ষণ পরে আবার ডাকিল—"দিদিমণি !—মা !···দাদু !······"

এবার স্বরটা অশ্রুজলে ধুইয়া স্বচ্ছ, নির্মল ; অন্নদাঠাকরুণের কণ্ঠ স্তব্ধ হইয়া গেল। একটু বিরতি ; জাহ্নবী আবার ডাকিল—কণ্ঠে তিন বছরের সঞ্চিত মধু ঢালিয়া।

প্রশ্ন হইল—"কে ?"

"আমি জাহ্নবী ; দোর খোল !"

তিন বৎসরের একটা মোটামুটি ইতিহাস শুনিল জাহ্নবী; তাহার মধ্যে ওদিককার প্রায় আড়াইটা বৎসর বাদ দেওয়া যায়। এদিকে মাস ছয়েকের মধ্যে দ্রুতগতিতে অনেকগুলো ব্যাপার হইয়া গেল। হঠাৎ একদিন শোনা গেল এই সমস্ত তল্লাটটা কিনিয়া লইয়া গবর্ণমেণ্ট মিলিটারি আনিয়া ফেলিতেছে। দেখিতে দেখিতে দক্ষিণদিকে বনবাদাড় পরিষ্কার হইয়া গেল, ঘরবাড়ি উঠিল, তাহার পর কাতারে কাতারে সেপাই আসিয়া সব ভর্তি করিয়া ফেলিল। কি ভয়ে ভয়েই যে কাটিল কয়টা মাস বলা যায় না। কিন্তু খানিকটা পর্যন্ত আগাইয়া বাড়িঘর করা বন্ধ হইয়া গেল, রব উঠিল যে-পর্যন্ত হইয়াছে সেই পর্যন্তই থাকিবে, এদিকে আর বাড়িয়া আসিবে না ছাউনি। মাস দুয়েক গেল তাহার পর আবার এদিককার জঙ্গলে কোপ পড়িতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গেই নূতন রাস্তা, নূতন বাড়ি, সেপাই-ছাউনি আবার আগাইয়া আসিতে লাগিল। সামনের দিকে ছিল শুধু মাঠ আর জঙ্গল, এদিকে শোনা গেল সেপাইরা জোর করিয়া লোকেদের উঠাইয়া দিয়া বাড়িজমিও দখল করিতেছে। আবার দিন-কতক কি হয় কি হয় একটা সশঙ্ক উৎকণ্ঠায় কাটিল। তাহার পর একদিন এ-বাড়ির দরজাতেও ঘা পরিল। অন্নদাঠাকরুণ খিল খুলিয়া দেখে সেপাইদের মতো পাঁশুটে রঙের পোষাক-পরা একটি ভদ্রলোক—বাঙালী, আর তাহার সঙ্গে চাপরাস আঁটা একটা পিওন। বাড়ির কে কর্তা জানিতে চাহিল, বাড়ি খালি করিয়া দিতে হইবে। অন্নদাঠাকরুণ খুব এক চোট গালিগালাজ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

অত দুশ্চিন্তায় বোধ হয় আর কখনও রাত কাটাইতে হয় নাই; বেশ বোঝা গেল গালিগালাজ দিয়া এদের ঠেকানো সম্ভব নয়। কি করিবে, কোথায় যাইবে ভাবিয়া তিনজনে সমস্ত রাতটা জাগিয়া কাটাইয়া দিল।

পরদিন সকালে আবার দরজায় ঘা পড়িল, চেঁচামেচি বিফল জানিয়াই অন্নদাঠাকরুণ আস্তে আস্তে গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। পাছে আবার আগের দিনের মতো দরজা বন্ধ করিয়া দেয়, সেইজন্য লোকটা প্রথমেই চৌকাটের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু ভালো লোক বুঝাইয়াই বলিল, এতে তাদের লাভই,—যেমন বাড়ি, কয়েক হাজার টাকা পাইয়া যাইবে, চেঁচামেচি না করিয়া দিয়া দেওয়াই ভালো; অন্য লোক হইলে জোর করিয়াই দখল করিয়া লইত, অসহায় স্ত্রীলোক দেখিয়াই আবার বুঝাইয়া বলিতে আসিয়াছে। আরও বলিল, আজই লওয়া হইতেছে না; মাপজোক হইতেছে, এদিকে আসিতে দেরি আছে এখনও, ইতিমধ্যে এরা জায়গা দেখুক।

উপায় নাই, এদিকে টাকাও পাওয়া যাইবে ভালো রকম, অন্নদাঠাকরুণ কাছাকাছি বাড়ির খোঁজে রহিল, একবার নৈহাটিও ঘুরিয়া আসিল। তাহার পর কিন্তু সব একেবারেই ঠাণ্ডা; কিছু দুর আগে পর্যন্ত বন কাটা হইতে লাগিল, বাড়ি উঠিতে লাগিল, এদিককার খানিকটা লইয়া কিন্তু কোন উচ্চবাচ্য নাই। এরপর একদিন একটু বেলা করিয়াই স্নানের পর ফিরিতেছিল অন্নদাঠাকরুণ, লোকটির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়া গেল, বলিল—ঠিক হইয়াছে ছাউনি আর বাড়ান হইবে না, ওদিকটা যেমন আছে তেমনই থাকিবে।

মিলিটারি এত কাছে পর্যন্ত ঠেলিয়া আসায় এরা আর এ বাড়িতে থাকা নিরাপদ মনে করিতেছিল না, লোকটিকে সেদিন ভালো বলিয়া মনে হওয়ায় অন্নদাঠাকরুণ সেকথাও বলিল—অবশ্য নারায়ণীও যে আছে সে কথা বাদ দিয়া। লোকটি বলিল কলিকাতায় মানুষের সংখ্যা খুব বেশি বাড়িয়া যাওয়ায় অনেকে বাহিরে জায়গা খুঁজিতেছে, সন্ধান পাইলে সে জানাইবে।

ইহার প্রায় দিন পনের পরে হঠাৎ অন্য ধরণের কাণ্ড এক।

সকাল বেলা আচমকা আবার দরজায় ঘা পড়িল। সেই লোকটি মনে করিয়া অন্নদাঠাকরুণ তাড়াতাড়ি আসিয়া অর্গল খুলিয়া দেখে দু'জন একেবারে অপরিচিত ব্যক্তি। একজনের বেশ বয়স হইয়াছে, একটু মোটা সোটা গোলগাল, গায়ে হাতকাটা জামা, একটা মামুলি র‍্যাপার জড়ানো, মাথার টেড়িটাতে কিন্তু বেশ ঘটা আছে; অন্যটি অল্পবয়সী, সুশ্রী, বেশ সৌখীন জামাকাপড় পরা।

কথা কহিল বয়স্থ লোকটিই, প্রশ্ন করিল—বাড়ির কর্তা কে। বাড়ি বিক্রয়ের কথা আশা করিয়া অন্নদাঠাকরুণ বলিল—সেই সব দেখেশুনে, কথাবার্তাও তাহারই সঙ্গে হইবে। বেটাছেলে একজন আছে বটে, তাহার ভাই, সে কিন্তু কোন কথায় থাকে না। প্রশ্ন হইল এ বাড়িতে তাহারা কতদিন আছে। সেটা জানাইতে আবার প্রশ্ন হইল—কাহার হুকুমে। অন্নদাঠাকরুণ তখন পাল্টা প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল—তাহারাই বা কে, হঠাৎ বাড়ি চড়াও হইয়া এ ধারণের প্রশ্ন করিতেছে কেন। বয়স্থ লোকটি উত্তর দিল; জানাইল বাড়িটা আসলে তাহার সঙ্গীর, সম্পর্কে তাহার শালী-পো হয়, দখল করিতে আসিয়াছে; এতদিন ছিল ক্ষতি নাই, এইবার ছাড়িয়া দিতে হইবে।

এতক্ষণে অন্নদাঠাকরুণ ভালোভাবেই নিজমূর্তি ধরিল, ভেতরটা ভালোভাবেই দেখিবার জন্য লোকটা একটু সামনে পা বাড়াতেই—"কী! আমার সাতপুরুষের শ্বশুরের ভিটে!…"বলিয়া হঠাৎ এমন জোরে কপাট দুইটা বন্ধ করিয়া দিল, যে লোকটা ছিটকাইয়া তিন হাত দূরে আগাছার ওপর গিয়া হাত পা ছড়াইয়া পড়িল।

দিন সাতেক আর সাড়াশব্দ নাই, তারপর একদিন সকালে আবার সেই মোটা লোকটির আওয়াজ শোনা গেল; এবার আর দোরে ধাক্কা নয়,তফাৎ হইতেই জানাইল তিন দিন আরও সময় দিতেছে, ইহার মধ্যে না চলিয়া গেলে জোর করিয়া উঠাইয়া দেওয়া হইবে লোকজন আনিয়া। আরও জানাইল তিন দিনের দিন বাড়ির কাজ আরম্ভ হইবে।

আজ পঞ্চম দিবস। তিন দিনের দিন আর আসে নাই, আজ দুপুর হইতে কিছু না বলিয়া, একেবারে কুড়ি-পঁচিশ জন কুলি মজুর লাগাইয়া বাড়ির কাজে হাত দিয়াছে। যেমন বোধ হইতেছে, একেবারে নূতন করিয়া গোড়া থেকে তুলিবে আবার। কাজ তদারক করিতেছে একা সেই মোটা লোকটি; ছেলেটি নাই সঙ্গে।

জাহ্নবী নিজের কথাও বলিল, তবে প্রচুর কল্পনার আশ্রয় লইয়া। সহজ বুদ্ধিতেই এ কথাটা গোপন রাখিল যে, তাহার মা-ই অণিমার হাতে পায়ে ধরিয়া

তাহাকে বোর্ডিঙে পাঠাইয়া দিয়াছিল। অণিমা অন্নদাঠাকরুণকে যে চিঠিটা দিয়াছিল সে তাহার কথা জানিত, তাহারই ভিত্তিতে একটা গল্প দাঁড় করাইল যে, একটি স্ত্রীলোক তাহাকে বনের মধ্যে থেকে ভুলাইয়া লোভ দেখাইয়া লইয়া গিয়া এতদিন মেয়েদের একটি শিক্ষায়তনে রাখিয়াছিল—সেটা যে ক্রিশ্চানী ব্যাপার, সেটুকুও ঐ সহজবুদ্ধিতেই গোপন করিল।

অরণ্য এদিকটা অল্পসল্প পাতলা হইয়াছে, তবু একেবারে এই বাড়ির চারিদিকে প্রায় সেইরকম। নিবিড় অন্ধকার, অতি ক্ষীণ একটি তেলের প্রদীপ, একটি লণ্ঠন, ভালো করিয়া পরস্পরকে যেন দেখাও যায় না। চারিদিকে দারিদ্র্যের ছায়া, তাহার মধ্যে দাদুর পাশে, দাদুর চৌকিতে ছেঁড়া মাদুরের ওপর অভিজাত্যের সজ্জায় রূপের ডালি লইয়া বসিয়া গল্প শুনিতেছে জাহ্নবী; গল্প বলিতেছে···ষোড়শী রূপসী, সে আত্ম-সচেতন হইবেই—মায়ের প্রশংসাময় দৃষ্টির সঙ্গে সলজ্জ অপ্রতিভ মুখের ভাবে বুঝিতেছে, সে এ বাড়িতে আজ বে-মানান।

অন্নদাঠাকরুণের দৃষ্টির প্রশংসার সঙ্গে আছে একটা প্রচ্ছন্ন আতঙ্ক—কোথায় এক কোণে; জাহ্নবী এত রূপ লইয়া যেন একটা নূতন উপদ্রব হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। দাদুর চোখটা আরও গেছে, এত অপর্যাপ্ত আলোয় দেখিবার চেষ্টাও নাই। ডান হাতটা পিঠের ওপর, কুণ্ঠিত, আগেকার মতো আর অকুণ্ঠ স্নেহে সমস্ত দেহে সঞ্চারিত হইতে পারিতেছে না; উদ্ভিন্ন-যৌবনা নাতনির অঙ্গের একটি কোণে নিশ্চল হইয়া যেন হিসাব করিতেছে—কি পাইল আর কি হারাইল। গোড়াতেই যা একটু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার পর কিন্তু একেবারে নির্বাক হইয়া গেছে। মাঝে মাঝে নিজের গলাটাকে শুধু যেন একটু পরিষ্কার করিয়া লইতেছে, তাহার পর একবার জাহ্নবীর মাথার উপর থেকে হঠাৎ হাতটা ধীরে ধীরে টানিয়া আনিয়া নারায়ণীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল—তোকে এই বয়েসটিতে দেখা হয়নি বন্দী···দিদিমণি কেমনটা হয়েছে রে?"

কাজের কথার মধ্যে তাহার এই নিতান্তই অকাজের কথাটি যে কতখানি বেখাপ্পা হইয়া গেছে সেটুকু বুঝিয়া একটু অপ্রতিভভাবে হাসিয়া চুপ করিয়া গেল।

পুরাণো জায়গায় এ কী নূতন হইয়া ফিরিল, নিজের জায়গায় কতটা পর হইয়া—যেন ভালো করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না জাহ্নবী।...... চব্বিশ ঘণ্টার দুই দিকে, জীবনের এই দুইটা যুগের মধ্যে যেন সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইতেছে না।

বাইশ

জায়গাটা দেখিবার জন্য একটা দারুণ আগ্রহ রহিয়াছে, এদিকে কার্শিয়াঙের মতো তেমন উৎকট শীতও নয়, পরদিন জাহ্নবী উঠিল অতি প্রত্যুষে।... উঠানের বাগানটা নাই, আবার জঙ্গল হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মধ্যে গোটাকতক পাতা-বাহার, একটা করবী আর গোটাদুই গোলাপ খেয়াল-খুশি মতো বাড়িয়া উঠিয়া একটা রুচিহীন আভিজাত্যের ছাপ দিয়াছে। সেই আধ ভাঙা দোতলার ঘরটা নাই, তবে সিঁড়িটা আছে, জাহ্নবী উঠিয়া গেল। একেবারে নূতন জায়গা! ডানদিক ঘেঁষিয়া পিছন দিকটা প্রায় সমস্তটাই এখনও সেইরকম জঙ্গল রহিয়াছে বটে, তবে সামনের দিকে প্রায় শ'খানেক হাত পর থেকে সব পরিষ্কার; গাছ যা আছে, আম-কাঁঠাল জাতীয়, ইচ্ছা করিয়াই ছাড়া; ইঁট পড়িয়াছে, বাড়ি উঠিতেছে। আরও দক্ষিণে একেবারে একটা ছোটখাট শহর বলিলেই হয়,—টানা টানা বাড়ি—খড়ের, খোলার, এ্যাস্‌বেসটসের—এর মধ্যেই লোকেদের চঞ্চলতা পড়িয়া গেছে; খুব স্পষ্ট দেখা যায় না, তবে পোষাকে রংয়ের বৈচিত্র্য নাই, সব খাকী। চারিদিকে বনের একটা পর্দা আছে, লোকও নাই এদিকে। নেড়া ছাতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছিল জাহ্নবী, নিচে অন্নদাঠাকরুণের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল—"নারাণ, ওঠ মা কপাটটা দিয়ে আসবি।"

জাহ্নবী নামিয়া যাইবে ভাবিতেছে, এমন সময় আবার অন্নদাঠাকুরুণের গলা—"না হয় জাহ্নুই ওঠ, তোর মার শরীরটা আবার ভাল নয়।"

জাহ্নবী সাড়া দিবার আগেই একরাশ শঙ্কিত মন্তব্য—"কৈ গো, জাহ্নু

কোথায় ?…জাহ্নবী !…অ নারাণ, জান্থ কোথায় ?—তোর পাশে শুয়েছিল যে !…জাহ্নবী !!…"

নারায়ণী উঠিয়া পড়িল—"অ্যাঁ তাইতো !…জান্থ কোথায় গেল ?…জান্থ ! জাহ্নবী !!…বাবা ! অ বাবা !! জান্থকে পাওয়া যাচ্ছে না !!"

পাশে অম্বিকাচরণের ঘরের কপাট খুলিয়া গেল, ত্রস্ত প্রশ্ন—"কি বলছিস ?…দিদিমণি কোথায় যাবে ?"

অকস্মাৎই ব্যাপারটা এমন গুরুতর আকার ধারণ করিল যে, জাহ্নবীরও যেন কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। সিঁড়িটারও স্থানে স্থানে শ্যাওলা জমিয়া গেছে, সাবধানে যতটা তাড়াতাড়ি পারিল নামিয়া আসার পর তাহার গলা খুলিল, বলিল—"এই যে আমি রয়েছি দাদু…মা, দিদিমণি, এই যে আমি !"

অন্নদাঠাকরুণ আর নারায়ণী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল ; যে সন্দেহে এতটা হৈচৈ উঠিল তাহার জন্য অপ্রতিভ হইয়াছে একটু, কিন্তু তাহার চেয়েও বেশি বিস্মিত—উষার আলোয় জাহ্নবীকে আরও স্পষ্টভাবে দেখিয়া। অম্বিকাচরণ ঘাড়টা ফিরাইয়া স্বর লক্ষ্য করিয়াই হাতটা বাড়াইল, প্রশ্ন করিল—"এয়েছিস ?"

জাহ্নবী আগাইয়া গিয়া হাতটা টানিয়া নিজের পিঠে রাখিল। একটু হাসিয়া বলিল—"যাব কোথায় যে এয়েছিস' ? ভোরে ঘুমটা ভেঙে গেল, ভাবলাম ছাতের ওপর গিয়ে দেখে আসি জায়গাটা, তিন বছর দেখিনি।"

অন্নদাঠাকরুণ আর একটি কথাও বলিল না, ঘটি আর গামছা-জড়ানো কাপড়টা হাতে করিয়া উঠানে নামিল, তাহার পর কপাট খুলিয়া গম্ভীরভাবে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রে অতটা ঠাওর করিতে পারে নাই, একটা অতি উৎকট সমস্যার সামনে আসিয়া যেন বুদ্ধি লোপ হইয়া গেছে।

নারায়ণীর ভাবটা অন্যরকম—গর্ব, বিষাদ, ভয় সব মেশান। অন্নদাঠাকরুণ চলিয়া গেলে কপাটটায় খিল আঁটিয়া আসিয়া বলিল—"জায়গাটা আর সে-জায়গা নেই জান্থ, অমন হুট করে বেরুস-টেরুসনি।"

একটু থামিয়া মন্তব্যটার ওপর একটু আক্রও টানিয়া দিল—"জানিস তো তোর দিদিমণিকে।"

আজ সকাল থেকেই লোকজন খাটিতে আরম্ভ করিল; একটু বেলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই; পুরাণো ইঁট-রাবিস সরানো, নূতন বনেদ খোঁড়া, ওদিকে বাড়ির কাছাকাছি যেসমস্ত আগাছা সেগুলাও পরিষ্কার করিতে লাগিল একটা দল, বড় বড় গাছে কুড়োলের ঘা পড়িতে লাগিল।

মায়ের নির্দেশ অনুসারেই জাহ্নবী বাহিরের রকে কিংবা উঠানে আর বাহির হইল না বড় একটা, প্রথমটা দাদুর কাছে বসিয়াই গল্প করিল খানিকটা, তাহার পর বাহির সম্বন্ধে কৌতূহলটা আর যখন দমন করিতে পারিল না, একবার ভাল করিয়া দক্ষিণ দিকটায় উঁকি মারিয়া দেখিয়া লইয়া একটু গুটি গুটি মারিয়া রান্নাঘরে মায়ের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

নারায়ণী একটু হাসিয়া বলিল—"এলিই চলে? আমি তাই বসে বসে ভাবছিলাম—খোলা জায়গায় মানুষ, এসে ঢুকতে হ'ল কিনা একেবারে পিঁজরের মধ্যে, ওর কি কম্মো একঠায় এক জায়গায় বসে থাকা? তা বোস্, আমারও পেট ফুলছিল,—হঠাৎ এভাবে সেখান থেকে চলে এলি যে?"

এসবের উত্তর জাহ্নবীর ঠিক করাই ছিল, বলিল—ইস্কুলটা হঠাৎ উঠে গেল মা।"

তাহার পর প্রশ্নের গোড়ার কথার খানিকটা আপনিই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—"সেখানেও নাকি কোন টাকাওয়ালা বড় লোক...?"

একটু অপ্রতিভভাবে চুপ করিয়া গিয়া কড়ার দিকে মুখটা ফিরাইয়া লইল। কিসব স্মৃতির আলোড়নে কথাটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে বুঝিতে বাকি রহিল না জাহ্নবীর। এক মুহূর্তেই সেই সব পুরাতন আর তার নিজের এই কয়দিনের নূতন অভিজ্ঞতার স্মৃতিতে তাহারও মনটা তিক্ত হইয়া উঠিল। দু'জনেই পড়িয়া গেছে একটু লজ্জায়, তবু মনের আক্রোশেই জাহ্নবী মনের কথাটা আর চাপিতে পারিল না, বলিল—"বড়লোক না হলেও ব্যাটাছেলেই যে মা।"

ইহার পর দুজনের কেহই আর কিছুক্ষণ পর্যন্ত কোন কথা কহিতে পারিল না। আবার এ-ভাবটা একটু কাটিয়া গেলে নারায়ণী বলিল —মরুকগে, কেরেস্তানী ব্যাপারই তো।...অণিমাদি কেমন আছে তাই বল, ও-মেয়েটি বড্ড ভালো।"

জাহ্নবী বলিল—হ্যাঁ...আছেন ভালোই।"

"ইস্কুল উঠে গেল তো সে গেল কোথায় ?"

তা কিছু বললেন না।...শিক্ষিতা মেয়েছেলে, আবার কোথাও পেয়ে যাবেনই কাজ।"

"হাঁ, বড্ড ভালো।...আমার কথা কিছু বলতো ?"

"প্রায়ই।"

এত আড়ষ্টভাবের মধ্য দিয়া কথাবার্তা অগ্রসর হয় না, তাহার ওপর প্রত্যেক কথাটিই যদি বানাইয়া সাজাইয়া বলিতে হয়। জাহ্নবী প্রসঙ্গটা বদলাইয়া ফেলিল, বলিল—"সে একদিন বলব মা, একদিনে ফুরুবেও না, বিশেষ করে কার্শিয়াং জায়গাটা—কী যে চমৎকার !...হ্যাঁ মা, এদিককার কি হবে ? যেমন তোড়জোড় দেখছি, আজই যদি না বলে তো দিন দু'চারের মধ্যেই ওরা হাত ধ'রে বের ক'রে দেবে, অন্তত নিজেদেরই মানে মানে স'রে যেতে হবে; তারপর ?"

কাল পর্যন্ত নারায়ণী তত গভীরভাবে চিন্তা করে নাই এ লইয়া; এক আশ্রয় থেকে অন্য আশ্রয় হাতড়াইয়া বেড়ানো তাহার জীবনের অভ্যাস; জাহ্নবী আসা পর্যন্ত কিন্তু চিন্তাটাই ওর সবচেয়ে প্রবল, বিশেষ করিয়া যেমনটি হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। তবু নিজের ভয়টা ওর মনে সংক্রামিত করিয়া ফল নাই জানিয়াই বলিল—"অত ভাবিনে জাহ্নু, কি করব বল ভেবে ? পিসিমা ভরসা, শক্ত মেয়েছেলে..."

"কিন্তু তোমার পিসিমার ভরসা তো গলাটুকু মা।" একটু নিষ্প্রভভাবেই হাসিয়া বলিল।

নারায়ণী একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল—"তুই ঐ বলছিস জাহ্নু—আমার কিন্তু মনে হয় এক সময়ে যাই হোক, এখন গলাটাই হয়েছে

বিপদ। যারা বাড়িটা দখল করছে তারা অবস্থাপন্ন লোক।…আশ্রম নয় কিছু নয়, একটা গেরস্তর বাড়ি; মেয়েছেলে নিয়ে আত্মীয়-স্বজন নিয়ে ঘর করবে, বড় বাড়ি, ঝগড়াঝাটি না করে হাতে পায়ে ধরলে বোধ হয় এক কোণে পড়ে থাকতে দিত…"

"আবার ওদের হাতে পায়ে ধরা…আমি বলছিলাম ওপাট তুলে দিয়ে অন্য ব্যবস্থা করলে হয় না?"

—ঘৃণায় যে জাহ্নবীর মুখটা বিকৃত হইয়া উঠিল; তরকারি নাড়িতেছিল বলিয়া নারায়ণী আর সেটা লক্ষ্য করিতে পারিল না। মুখটা ঘুরাইয়া প্রশ্ন করিল—"কি অন্য ব্যবস্থা জাহ্নবী?"

"ভাবছিলাম মা…ভাবছিলাম…"

"হ্যাঁ, কি ভাবছিলি বল না।"

"ভাবছিলাম—আমি যদি কোন স্কুলে একটা চাকরি নিতাম—কলকাতায় কিংবা এখানেও থাকতে পারে মেয়েস্কুল,—মন্দ জায়গা নয়তো,—এত বড় রেলওয়ে স্টেশন…"

নারায়ণী আতঙ্কে সম্মোহিত হইয়া কথাগুলি শুনিতেছিল, কিন্তু সে-ভাবটা চাপা দিয়া একটু রহস্যের হাসি হাসিয়া বলিল—"পিসিমার নয় গলা ভরসা বললি,—তোর ভরসাটা কি শুনি যার জোরে চাকরি খুঁজতে বেরুবি? শোনা যায় আট দশ বছর পড়লে ছেলেরা কুল্যে একটা পাশ দিতে পারে, তাতে কিছুই হয় না, তোর তো মাত্র তিনটি বছরের পুঁজি।…দোরটা হাট-আদুড় হয়ে রয়েছে, উঠে একটু ভেজিয়ে দেমা, একপাল লোক কাজ করছে ওদিকটায়।"

এতখানি বলার উদ্দেশ্যটা লক্ষ্য করিয়াই জাহ্নবী একটু হাসিয়া বলিল—"হ'ল মার সন্ত সন্ত পর্দা আঁটার ব্যবস্থা!…কেন, নিচু ক্লাসের মেয়েদেরও তো পড়াতে পারি।"

সোজাসুজি উঠিয়া দরজাটা ভেজাইয়া দিতে যাইবে, হঠাৎ পাশে সরিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর পাশ দিয়া গিয়াই সন্তর্পণে দরজা দুইটা টানিয়া মাঝে সামান্য একটু খোলা রাখিয়া, একটু দেখিয়া লইয়া চাপা গলায় বলিল—"মা, দেখোসে!"

তরকারি নাড়া লইয়া ছিল বলিয়া নারায়ণী কিছুই দেখে নাই, ঘুরিয়া বিমূঢ়ভাবে উঠিয়া আসিয়া দরজার ফাঁকে চোখ দিয়া দাঁড়াইল।

লোকটাকে দেখিয়াছে, বাড়িরদ াবীদারদের মধ্যে একজন—যে বয়স্থ লোকটি নিজেকে ছেলেটির মেসো বলিয়া পরিচয় দিয়া কথাবার্তা চালাইয়াছিল, তাহার পর কপাটের ধাক্কা খাইয়া ছিটকাইয়া পড়ে। একবারমাত্র দেখা, তাও দূরে ঘরের মধ্যে থেকে, কিন্তু ভুল হইবার জো নেই,—সেই পেটমোটা, গায়ে হাতকাটা জামা, মাথায় ফোলা টেড়ি। উঠানের দক্ষিণ দিকটায় রাবিশ আর ইটের স্তূপ সরাইয়া যে জায়গাটুকু পরিষ্কার করা হইয়াছে লোকটা তাহারই এক দিকে দাঁড়াইয়া। একেবারে সোজাসুজি নয়, উঠানে যে ঝোপঝাপ রহিয়াছে তাহারই আড়াল হইয়া। তাহার ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয় রান্নাঘরের মধ্যে উহাদের দুজনকে যেন এতক্ষণ লুকাইয়া দেখিতেছিল, তাহার পর জাহ্নবী উঠিয়া দরজাটা ভেজাইয়া দিতেই একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়িয়া গেছে—পিছাইয়া যাইবে কি আরও আগাইয়া সন্ধান লইবে ঠিক করিতে পারিতেছে না। অবশ্য এমন বেপর্দা বাড়িতে গৃহস্থ বধূ-কন্যাদের দেখিয়া ফেলাও স্বাভাবিক এবং আগানো পেছানো লইয়া দ্বিধাও স্বাভাবিক, কিন্তু জাহ্নবী অতটা বুঝুক বা নাই বুঝুক দ্বিধার অন্তরালে লোকটার দৃষ্টিতে যে একটা লুব্ধ কৌতূহল রহিয়াছে এত দূর থেকেও নারায়ণীর সেটা বুঝিয়া লইতে দেরি হইল না। খানিকক্ষণ একভাবেই কাটিল দুই দিকে, তাহার পর লোকটা যেন চেষ্টা করিয়া সহজভাবে রকের ওপর দিয়া অগ্রসর হইল এবং এদিকে আসিয়া হাঁক দিল—"বাড়িতে কে আছেন?"

পাশের ঘর থেকে অম্বিকাচরণ প্রশ্ন করিল—"কে?"

গলাটা বেশ ভারি, বার্ধক্যের সঙ্গে শক্তির পরিচয় দেয়। লোকটা একট থতমত খাইয়া গেল, তাহার পর আবার চেষ্টা করিয়াই নিজের গলাতেও একট গুরুত্ব ফুটাইয়া বলিল—"এই আমি···বাড়ির মালিক।"

—আড় চোখটা একবার রান্নাঘরের ওপর গিয়া পড়িল, কপাট-জোড়া অবশ্য ইতিমধ্যে আরও আঁটিয়া গেছে।

রণ বাহির হইয়া আসিল, আন্দাজে চোথ দুইটা তুলিয়া প্রশ্ন করিল—"কি চান ?"

চোখের অবস্থা দেখিয়া লোকটার যেন সাহস হইল একটু, বলিল—"না, চাওয়া চাওয়ি আর কি ? বাড়িটাতে হাত দিলাম, একেবারে ঢেলে সাজব মনে করছি, তাই জানিয়ে দেওয়া দু'চারদিন থাকেন ক্ষতি নেই—বিপন্ন মেয়েছেলে—আপনারও যেমন অবস্থা দেখছি..."

"দিদি তো জানেনই সব, বোধ হয় চেষ্টা করছেন, তবু আবার বলব তাঁকে।"

"হ্যাঁ, সেই। দুচার দিন বললাম বলে কি আর সত্যিই দু'চার দিন ?—তাড়াতাড়ি করছি বটে, তবে এদিকে হাত দিতে, এখনও মাসখানেক মাস দেড়েকের কম নয়। ততদিন আপনারা..."

"বলব'খন দিদিকে।"

"হ্যাঁ, তাঁকে দেখলাম এই খানিক আগে বোধ হল যেন চানে যাচ্ছেন। কুলিগুলোকে লাগিয়েই আবার কলকাতার দিকে যেতে হবে একবার, তাই ভাবলাম..."

"তা বলব'খন দিদিকে।"

নারায়ণী আর জাহ্নবী একটা কপাটের দুইখানা তক্তার জোড়ের ফাঁকে ওপর নিচু হইয়া দেখিতেছে। অম্বিকাচরণের চোখের অবস্থা দেখিয়াই লোকটা প্রায় প্রতিকথার ফাঁকেই একবার করিয়া এদিক ওদিকে তির্যক দৃষ্টিপাত করিয়া লইতেছে—কেমন একটা লালায়িত কৌতূহলের ভাব। নারায়ণী এটাও বেশ বুঝিতেছে অম্বিকাচরণ ভেতরে ভেতরে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে—প্রত্যেকবারে সংক্ষিপ্ত ঐ "বলবখন দিদিকে"—কথা বাড়াইতে চায় না—লোকটা যেন গেলেই বাঁচে।

"হ্যাঁ, বলবেন। আর আপনাদের লোকও তো অল্প, একটা ছোট বাড়ি খুঁজে নিতে বেগ পেতে হবে না বেশী।...ইয়ে, আছেন কে কে ?"

"ঐ যে দিদি সেদিন বললেন।"

ঠিক এর পর কথাটা কিভাবে পাড়িবে ভাবিতেছে লোকটা, এমন সময়

বাহিরের দরজায় ঘা পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে অন্নদাঠাকরুণের কণ্ঠস্বর—"অম্বিকে! দোরটা খোল তো।"

লোকটা একেবারে যেন চমকিয়া উঠিল; কিন্তু প্রায়াম্বের সামনে একটা সুবিধা, সহজেই সামলাইয়া বলিল—"ঐ এসেছেন···আমি যাই, তাহলে বলে দেবেন···কুলিগুলো ওদিকে ফাঁকি দিচ্ছে, আর দাঁড়ালে চলবে না।"

—গলাটাও বেশ একটু নামিয়া গেছে।

"হ্যাঁ, দোব।···কিছু ফেলে গেছলেন নাকি? বড় তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন যে!···যাই দিদি!"

লোকটা ততক্ষণে উঠানের ঝোপগুলার ওদিকে চলিয়া গেছে।

তেইশ

অন্নদাঠাকরুণ একা নয়, সঙ্গে একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক। পোষাকের মধ্যে পারিপাট্য বা পরিচ্ছন্নতা নাই, তবে কাঁধের ওপর অবহেলাভরে ফেলা শালটা দেখিলে মনে হয় টাকাওলা মানুষ।

উঠানে প্রবেশ করিয়াই অন্নদাঠাকরুণ দাঁড়াইয়া পড়িল, লোকটির মুখের পানে চাহিয়া একবার চারিদিকে হাতটা ঘুরাইয়া দেখাইয়া বলিল—"এই আমার বাড়ি—এসো সবটা দেখিয়ে দি ভালো করে।"

রকে উঠিয়া আগে রান্নাঘরের সামনে লইয়া গেল, দরজাটা ঠেলিয়া খুলিয়া দিয়া এক পা ভিতরেই ডাকিয়া লইল, নারায়ণী এবং জাহ্নবী যে একপাশে গুটিসুটি মারিয়া বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার জন্ত একটু ভ্রুক্ষেপ নাই; বলিল,—"এই হচ্ছে রান্নাঘর।" তাহার পর একে একে আরও ঘরগুলার ভিতর দেখাইয়া দক্ষিণদিকে লইয়া গেল ভাঙাঘরের আদলগুলা দেখাইতে দেখাইতে। লোকেরা যে কাজ করিতেছে সেদিকে একেবারে দৃকপাত নাই; কোথাও পরিষ্কৃত জায়গার ওপর দিয়া, কোথাও বা রাবিশের ওপর দিয়াই দেখাইতে দেখাইতে বাহিরে লইয়া গেল। বাড়ির চৌহদ্দিটা আঙুল দিয়া ভালো করিয়া দেখাইয়া আবার সেই কুলিমজুরদের

মধ্যে দিয়া ভদ্রলোককে টানিয়া আনিল ভিতরে ; ওদিককারই রকের একজায়গায় দাঁড়াইয়া পড়িয়া গলার স্বরটা চড়াইয়া বলিল—"এই সবটা তোমায় দেখিয়ে দিলাম। এখন একটা দাম ঠিক করে বিক্রি কবলাটা সেরে নিয়ে দখল করো। এরা যে দেখছ, এসব আমার লোক নয়, দখলি নিয়ে কেউ যদি গোলমাল বাধাতে এগিয়ে আসে, তুমি মেরে পত্তা উড়িয়ে দিও, আমার কিছুমাত্র ওজর আপত্তি নেই।...কইরে, তোদের যারা কাজে লাগিয়েছে তারা গেল কোথায়? সেই হোঁৎকা তেলের কুপোটা কোথায়? লম্বা টেড়ি—যেন বৈতুরিণী বয়ে যাচ্ছে মাথার মাঝখান দিয়ে, গেল কোথায়?

শেষের কথাগুলা কুলি-মজুরদের ডাকিয়া বলা ; তাহারা কাজের মধ্যে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে, সেইভাবেই অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"এসে থাকে তো ডেকে দে, একবার আমার বাড়ির খদ্দেরের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়ে বাড়ি তোলবার সখটা মিটিয়ে দিই, কপালের ঘা না শুকুতে শুকুতে লম্বা লম্বা পা ফেলে তো বাড়ি তুলতে এসেছে।"

কয়েকজন কুলি বোধ হয় একটা তামাসা দেখিবার আশায় বাবুর একটু খোঁজ করিল, কিন্তু তাহাকে পাওয়া গেল না।

অন্নদাঠাকরুণ ভদ্রলোকটির পানে চাহিয়া বলিল—"আমি আদালতে গিয়ে সাবুৎ দেব বাড়ি আমার। কবালাটুকু করে বাড়ি দখল করো। কবে আসছ?"

ভদ্রলোক একেবারেই ভ্যাবাচাকা খাইয়া গিয়াছিল,—"যত শীগ্‌গির পারি, আসছি।"—বলিয়া যত শীঘ্র পারিল বাহির হইয়া গেল।

অন্নদাঠাকরুণ আবার কুলিগুলাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—"খেটে যা যত পারিস, কিন্তু 'আমার বাড়ি নয়' বলে সে মিন্‌সে যখন গা-ঝাড়া দেবে তখন যদি আমার কাছে মজুরির জন্যে কাঁদুনি গাইতে আসিস তো তোদেরই একদিন কি আমারই একদিন।...যত পারিস খেটে যা।"

স্নান করে নাই এখনও ; এর পর অম্বিকাচরণ বা নারায়ণী কাহাকেও একটি কথা না বলিয়া আবার গামছা-কাপড়—ঘটি-হাতে গটগট করিয়া বাহির হইয়া গেল।

এই একটা দিনের ঘটনাপরম্পরা রোজ না হোক প্রায়ই মাঝে মাঝে পুনরাবর্তিত হইতে লাগিল। সকালের এই সময়টুকু একটু নিরিবিলি পাওয়া যায় বলিয়া মায়ে-ঝিয়ে রান্না ঘরে বসিয়া নিজেদের ভবিষ্যৎ লইয়া আলোচনা করে,—এর পর অবশ্য দুয়ার ভেজাইয়াই। লোকটা আসিয়া অম্বিকাচরণের সঙ্গে গল্প জমাইবার চেষ্টা করে, কুৎসিত কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চায়, গল্পের মূল কথা সেই একটি—অম্বিকাচরণ যদি ইচ্ছা করে তো থাকিতে পারে এ-বাড়িতে। দু'চারদিন থেকে এখন দু'চার মাসে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্নদাঠাকরুণ কোনদিন স্নানের আগেই, কোনদিন বা স্নানের পরে খরিদ্দার ধরিয়া আনে, বাড়ি, জমি, পুকুর বিক্রি-কবালা করিয়া দখল লইতে বলে; তফাৎটা এই হইতেছে যে খরিদ্দাররা যত না ফেরে ততই ওর রাগটা "হোঁৎকা তেলের কুপো'র ওপর যায় বাড়িয়া, গলার জোর এবং গলাবাজির ভাষা উগ্র হইয়া ওঠে। লোকটার সঙ্গে কিন্তু দেখা হইল না; অন্নদাঠাকরুণের অনুপস্থিতিতে আসিয়া জোটে, তাহার পর দরজায় ঘা পড়িতে সেই যে গা-ঢাকা দেয়, আর তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। সে যে আসিতেছে মাঝে মাঝে, আশ্বাসের কথা দিয়া যাইতেছে, এক অশান্তি-বৃদ্ধি ভিন্ন আপাততঃ কোন ফল নাই জানিয়া নারায়ণী একথা অন্নদাঠাকরুণকে বলে নাই, জাহ্নবী আর অম্বিকাচরণকেও বারণ করিয়া দিয়াছে, তাই লোকটার চরিত্রের এদিকটা সম্বন্ধে সে এখনও অনভিজ্ঞ; এখন যে গালাগালিটা খাইতেছে সেটা শুধু বাড়ি তোলার অপরাধে।

ইতিমধ্যে বাড়ির কাজ হু হু করিয়া আগাইয়া যাইতেছে। চারিদিকের বনবাদাড় পরিষ্কার হইয়া বাগানের প্ল্যান উঠিতেছে জাগিয়া, দক্ষিণ দিকের খানপাঁচেক ঘর আবার দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে নারায়ণীদের মুখোমুখি প্রথম দুইটাকে একটু যেন তাড়াহুড়া করিয়া চুণ বালি ফিরাইয়া রঙ করাইয়া বাসের উপযোগী করিয়া ফেলা হইয়াছে। একটাতে চেয়ার টেবিল আসিয়াছে, একটাতে পালঙ্ক, ড্রেসিং টেবিল, আলমারি; বেশ সুদৃশ্য পর্দাও ঝুলিয়াছে দুইটা ঘরে। এদিকে সদরের বড় পুকুরটা প্রায় পরিষ্কার হইয়া আসিল; আগের মতোই দুইদিকে শানের বেঞ্চ দেওয়া ঘাট উঠিতেছে; যে গাছগুলা

রাখা হইয়াছে, ওপরকার বাক্সে লতাপাতা নামাইয়া সেগুলাকে পরিচ্ছন্ন করা হইতেছে ; পুরাণো মালতী-লতাটায় ছ ; পুকুরের ও-কোণে রাঙা হেলা ফুলের লতাগুলা যত্ন-অ প্রসার লাভ করিয়াছে।

বাড়ির মধ্যেকার উঠানও পরিষ্কার হইয়া গেল। সেদিন বোধ হয় একটা কাণ্ড ঘটিয়া যাইত, কেন না ঐ জঙ্গলটুকুই ছিল বাড়ির দুইটা অংশের মধ্যে একটা পর্দা ; ঘটিল না নিতান্ত দৈবক্রমে। বাড়ির খরিদ্দাররা ভড়কাইয়া যাইতেছে, সংখ্যা যাইতেছে কমিয়া, খোঁজ করিয়া ফিরিতে অন্নদাঠাকরুণের সেদিন দুপুর হইয়া গেল। একে এমনি আগুন হইয়া আছে, উঠানের ঐ অবস্থা দেখিয়া আর কিছু না বলিয়া রান্নাঘরের মধ্যে চলিয়া গেল এবং বঁটিটা বাহির করিয়া একেবারে হন্‌হন্ করিয়া কুলিদের মেটের সামনে গিয়া বলিল— "উঠোনের মাঝখানে বেড়া তুলিয়ে দে এইসব কাটা গাছপালা দিয়ে—এক্ষুণি, নয়তো তোরই একদিন কি আমারই একদিন।"

যতক্ষণ না উঠানের এ-মুড়ো ও-মুড়ো বেড়াটা উঠিল, বঁটি-হাতে রৌদ্র মাথায় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।···সেই বেড়াটাই এখন এদিককার আব্রু বাঁচাইতেছে।

এই-সবের মধ্যে প্রায় মাস দুয়েক কাটিয়া গেল। বাড়ির একটা দিকে পুরুষদের কর্মচঞ্চলতা, একেবারে প্রত্যক্ষ কুলিমজুরগুলা। তাহার পর সেই ঝাঁপা-টেরি, অম্বিকাচরণের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে নিজের নাম বলিয়াছে বারাণসী, কখনও, প্রত্যক্ষ চরিত্রের জঘন্য ইঙ্গিতে, কখনও অন্তরালে। ইহাদের পেছনেও একজন আছে—ধনী, যুবা, সুবেশ ; সেই সর্বময়, কিন্তু প্রত্যক্ষ নয়। তাহাকে একবার মাত্র দেখিয়াছিল অন্নদাঠাকরুণ, সামনাসামনি; নারায়ণী দেখিয়াছিল ঘরের দরজার ফাঁকে ; অম্বিকাচরণের দুর হইতে দেখার বালাই নাই।

বাড়ির এদিকে আছে এরা এই তিনটি স্ত্রীলোক—

একজনের মনে দুর্জয় ক্রোধ, একজনের মনে নিরুপায় আতঙ্ক, আর এক ার মনেও মায়ের মতো ত মিয়া এতদিনে, যদি এর মধ্যে বোর্ডিঙের তিনটা বৎসর না আসিয়া পড়িত।···ভোরা জাহ্নবীর আতঙ্কটাকে সবল, মহিমময় করিয়া ঘৃণায় রূপান্তরিত করিয়াছে। তাহার

মনটা বিদ্রোহ করে, ইচ্ছা হয় কদর্যতার সামনে গিয়া একেবারে সোজাসুজি হইয়া একটা বোঝাপড়া করে, কিন্তু অবস্থাগতিকে তাহাকে গৃহাশ্রয়ীই হইয়া থাকিতে হয়। সেইখানে অসহায় ভাবে বসিয়া সে ঘৃণাটাকে লালিত করিতেছে যতই অসহায়, জেটা ততই অন্তরের দিকে পথ কাটিয়া চলিতেছে, একটা পুরুষের অপকীর্তি ধীরে ধীরে সমস্ত পুরুষের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া যাইতেছে।

এই সময়ে হঠাৎ একদিন একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল এবং সমস্ত ব্যাপারটা একেবারে চরমে আসিয়া ঠেকিল—

অন্নদাঠাকরুণ অল্পক্ষণ হইল স্নান করিতে গিয়াছে, আজকাল যায়ও দেরি করিয়া ফেরেও দেরি করিয়া। বারাণসী রকের ওপর দিয়া আসিয়া বেড়ার পাশে দাঁড়াইয়া ডাকিল—"দাদা আছেন ?"

"এই যে, কি বলছেন ?" বলিয়া অম্বিকাচরণ বাহির হইয়া আসিল। জাহ্নবীর সঙ্গে গল্প করিতেছিল, দরজাটা ভেজাইয়া দিল।

বেড়াটা এতদিন উঠান থেকে আরম্ভ করিয়া রকের ওপর পর্যন্ত টানা ছিল, কিন্তু তাহাতে বাড়ির দক্ষিণদিকের ওপর স্বত্ব নষ্ট হইতে পারে ভাবিয়া অন্নদাঠাকরুণ রকের ওপরের খানিকটা বেড়া কাটিয়া একটু রাস্তা খুলিয়া দিয়াছে। এটা কালকের কথা। এর আগে বারাণসী যখন আসিত, বেড়ার ওপার থেকেই আলাপ জমাইত ; আজ সেই খোলা জায়গাটুকু দিয়া এপারে আসিয়া দাঁড়াইল, বোধ হয় এই প্রলোভনেই আসা আজ, কহিল—"না, বলাবলি আর কি ? কাজটাজগুলো বেটাদের বুঝিয়ে দিয়ে মনে করলাম দাদার সঙ্গে একটু গল্প করে আসি।...ইয়ে, পেলেন নাকি দিদি কোন বাসার সন্ধান ?"

"কই আর পেলেন এখনও ?"

—কথাটা বলিয়া অম্বিকাচরণ একটু থামিল, তাহার পর আন্দাজে চশমা জোড়াটা তুলিয়া বলিল—"খুঁজছেন ব'লেও তো মনে হয় না, তাঁর তো বিশ্বাস তাঁরই বাড়ি, অসহায় মেয়েছেলে দেখে আপনারা দখল করে..."

বারাণসী হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—"বিশ্বাসটা ভুল কিসে বলুন না দাদা, বঙ্কিমের কমলাকান্তের কথা মনে নেই ?—পেসন্ন গয়লানীকে বলছে —ওর মাখন খেয়েছি, ছানা খেয়েছি, ননী খেয়েছি—ও-গরু আমার হ'ল না

তো কি তোর ?...দিদি যদি বলেন, আমার বাড়ি, তো আটকায় কে ? ভোগদখলটা তো এতদিন তিনিই করলেন ?—সন্ধে দিয়ে, জলছড়া দিয়ে রক্ষেও করেছেন।...সে সব থাক, থাকতেন আপনারা আরও কিছুদিন তাতে ক্ষতি ছিল না তো, তাঁকে একলা খোঁজাখুজি করতে হয়, মেয়েছেলে, বয়স হয়েছে —সব বুঝি তো। তবে কি না দক্ষিণ দিকটা শেষ হয়ে এল, এবার এদিকটায় দিতেই হবে হাত। করতাম আস্তে আস্তে—করছিলামও—অসহায় পরিবার, যতদিন টেনে যেতে পারি, কিন্তু কালও বিকালে ব্রজর একটা টেলিগ্রাম এয়েছে —দু'একদিনেই আসছি, কাজে আরও লোক লাগিয়ে দিন...”

বেড়ার পিছনে ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার হইয়াছে—

অন্নদাঠাকরুণ আজ খরিদ্দার বা বাসার সন্ধানে না গিয়া স্নান সারিয়া সোজাই বাড়ি-মুখো হইল, আর সদর দরজার দিকে গেল না; বোধ হয় নিজের অধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্যই দক্ষিণ দিক দিয়া প্রবেশ করা ঠিক করিল—যে-জন্য রকের এই রাস্তাটুকু খুলিয়া রাখা। নূতন ঘরগুলোর সামনেই বাগানের যে ছকটা কাটা হইয়াছে তাহার মধ্যে পা দিয়া গা'টা জ্বলিয়া ওঠায় মুখ ধরিতে যাইবে ঠিক সেই সময় প্রসন্ন গোয়ালিনীর গোরুর উপমা দিয়া রসিকতা করার মুখে বারাণসী হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছে। ঘরগুলায় পর্দা ফেলা, ওদিকটা দেখা যায় না, তবে এটা বোঝা যায় যে, আওয়াজটা আসিতেছে বাড়ির উত্তর দিক হইতে। থমকিয়া দাঁড়াইল অন্নদাঠাকরুণ, তাহার পর আস্তে আস্তে নূতন ঘরে প্রবেশ করিল। সন্তর্পণে পর্দা সরাইয়া ভেতরের রকে পড়িতেই দেখিল এদিকে পেছন করিয়া একটি লোক বেড়ার ঠিক ওদিকে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে, সামনে অম্বিকাচরণ। লোকটি-যে কে মাত্র একদিন দেখা হইলেও বুঝিতে বাকি রহিল না, টেরির চুড়াও পেছন দিক থেকে দেখা যায়।...অন্নদা-ঠাকরুণ পা টিপিয়া টিপিয়া বেড়ার পেছনটিতে গিয়া দাঁড়াইল, মাঝে মাত্র হাত তিনেকের ব্যবধান।

ওদিকে অম্বিকাচরণ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল—“ব্রজটা কে ? আপনার সেই শালী'পো ?—যিনি বাড়ির আসল দখলদার ব'লে দাঁড়িয়েছেন ?”

বারাণসী টানিয়া টানিয়া বেশ মুরুব্বিয়ানার ঢঙেই বলিল—"হ্যাঁ, শুধু নামেই দখলদার, করছি-কম্মাচ্ছি সব আমিই, আমি যা বোলবো তাই-ই হবে।...তা ব'লে দেব'খন আমি—আরও একখানা ঘর তুললে তবে তো এই তিনটেতে হাত দেবার কথা—ততদিনে ওঁদের দুজনকে থাকতে বলেছি, কোথায় আর যাবেন ?...হ্যাঁ—ইয়ে, আপনারা দুজনই তো দাদা ? না, এর মধ্যে আর কেউ এয়েছে ?...রান্নাঘরে ধোঁয়া দেখছি কি না..."

অম্বিকাচরণ নিরুত্তর রহিল।

বারাণসী বলিল—"অবিশ্যি এও হতে পারে যে দিদিই বোধ হয় কিছু চড়িয়ে গেছেন..."

অন্নদাঠাকরুণ বেড়ার ফাঁক দিয়া অম্বিকাচরণের মুখের পানে চাহিয়া আছে—তাহার নাকের ডগা, ঠোঁঠের প্রান্ত ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিতেছে মাঝেমাঝে; অপমানে, অসহায়তায়, বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, ধোঁয়ার সাক্ষ্যে যেন আরও নিরুপায় হইয়া গেছে। কিছু একটা বলিবার জন্য হাঁ করিয়াছিল—বোধহয় এই কথাই যে অন্নদাঠাকরুণই কিছু চড়াইয়া স্নানে গিয়া থাকিবে, এমন সময় রান্নাঘরে কড়ার ওপর খন্তির ঘা পড়ার শব্দ হইল। অম্বিকাচরণের মুখটা বন্ধ হইয়া গেল, আরও যেন হতাশ হইয়া পড়িয়াছে।

বারাণসীই বলিল—"না, লোক রয়েছে তো...নতুন এল বুঝি ? কে, মেয়ে ?...একা এয়েছে, না ?..."

অন্নদাঠাকরুণ একেবারেই হুঙ্কার দিয়া বেড়ার পেছন থেকে বাহির হইয়া সামনে দাঁড়াইল—"না, আরও আছে দাঁড়া !..."

থর থর করিয়া এত কাঁপিতেছে যে ঘটির জল ছিটকাইয়া পড়িতেছে, মুখ সিঁদুরবর্ণ, চোখ দুইটা যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িবে। বারাণসী প্রথমটা একেবারে হকচকিয়া গেল, তাহার পর বোধ হয় পৃষ্ঠভঙ্গ দিত, অন্নদাঠাকরুণ এমন একটা শপথ দিল সে নড়িতে পারিল না।

কাঁপিতে কাঁপিতেই অন্নদাঠাকরুণ রান্নাঘরের দিকে গিয়া প্রবল ধাক্কা দিয়া দরজাটা খুলিয়া ফেলিল, নারায়ণী সরিয়াই দাঁড়াইয়াছিল, তাহার ডান হাতটা

খুরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনিয়া একটু-সামনেই ঠেলিয়া দিয়া বলিল—হ্যাঁ, ···আরও আছে!···”

মতো সামনের দরজাটাও খুলিয়া জাহ্নবীকে সেইভাবে টানিয়া বাহির করিল, বলিল—“আর এই মাতঙ্গী···কি চাস?···কি চাস এদের নিয়ে?···এত খাতিরটা কিসের আমায় বুঝিয়ে বল্!···বলবি—যদি বাপের বেটা হোস্ তো বলবি!···তস্কোর!···লম্পোট!···পাকা চুলে কুলিয়ে গেরস্ত বাড়িতে ঢুকে মেয়ে-বৌয়ের খোঁজ নেওয়া!···একা আছেন না, আরও?···না, একা কেন?—আরও আছে—এই দেখ···চোখ তুলতে পারছিস না কেন?···”

কাজের যত কুলি-মজুর জড়ো হইয়া গেছে, সামনে পেছনে, চারিদিকে; কৌতূহলীদের চাপে বেড়াটা পর্যন্ত নুইয়া কয়েক জায়গায় ভাঙিয়া গেছে অন্নদাঠাকরুণের গলার বিরাম নাই, পর্দায় পর্দায় উঠিয়া যাইতেছে, বাকি আর সবাই যেন চিত্রার্পিত; নারায়ণী আছে মাথা নিচু করিয়া, জাহ্নবীর দৃষ্টি সিধা, দূরলগ্ন, যেন ভাবলেশহীন।

এক একদিন অনেকগুলা ব্যাপার যেন ষড়যন্ত্র করিয়া একই সময়ে আসিয়া উপস্থিত হয়—

এইভাবে খানিকক্ষণ চলিয়াছে, এমন সময় একেবারে তৈয়ারি যে দুটি ঘর, মায় আসবাবপত্র শুদ্ধ, তাহার একটার পর্দা তুলিয়া একটি যুবক চৌকাঠের ওপর আসিয়া দাঁড়াইল, মুখে-চোখে অসীম বিস্ময়। অনেকে দেখিল, অনেকে দেখিতে পাইল না। একটু একভাবে থাকিয়া যুবক আবার পর্দাটা নামাইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

তাহার পরেই একটি চাপরাশী-গোছের লোক আসিয়া বারাণসীর পাশে দাঁড়াইয়া একটা ছোট সেলাম ঠুকিয়া বলিল—“বাবু এসে গেছেন, হুজুরকে ডাকছেন।”

চব্বিশ

এই দমকা ঝড়টায় একটা মস্ত বড় কাজ হইল, বাড়ির সমস্ত সঙ্কোচ—পর্দা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া উড়িয়া গেল। একবার অত লোকের সামনে ও-ভাবে বাহির হইবার পর আর রান্নাঘরে দোর দিয়া বসিয়া থাকার কোন অর্থই হয় না। মা ও মেয়েতে বেশ মুক্তভাবেই বাড়ির মধ্যে ঘোরাফেরা করিতে লাগিল।

বাড়ির দক্ষিণ দিকের আচরণটা কিন্তু একটু অদ্ভুত ঠেকিতে লাগিল। দুই দিন ধরিয়া বাড়ির কাজকর্ম একেবারেই বন্ধ রহিল, ওদিকে যে ঘরগুলা উঠিয়াছে তাহার উঠানের দিকের দুয়ার জানালাগুলা সব রহিল রুদ্ধ। ঘরে সমস্ত দিনে-রাতে লোকজনেরও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তাহার পর অন্নদাঠাকরুণ যখন একেবারে কৃতনিশ্চয় সে শত্রুকে দেশছাড়া করিয়াছে, বিজয়গর্বে এই ধরণের দুই একটা কথা গলা তুলিয়া বলিতেও আরম্ভ করিয়াছে, সেই সময়, তৃতীয় দিবসে সকালে হঠাৎ আবার দোরজানালার ওদিকে লোকজনের আওয়াজ শোনা গেল। ব্যাপারখানা বেশ ভালো করিয়া বুঝিয়া উঠিবার আগেই নূতন একটা ঘরের দুয়ার খুলিয়া একদল কুলি আবার উঠানে আসিয়া পড়িল এবং ভাঙা বেড়াটা আবার মেরামত করিয়া দাঁড় করাইয়া দিল। কতকটা যেন বিস্ময়েই বাক্‌রোধ হইয়া অন্নদাঠাকরুণ একটি কথাও বলিতে পারিল না, তাহার পর অবস্থাটা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল যখন বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে দেখিল এ-বেড়াটার পেছনেই আবার বাঁশের খুঁটি পোতা হইতেছে।···দুপুরে নূতন ঘরগুলার ওদিকে নূতন তৈরী রাস্তার ওপর দিয়া গোটা দুই মোটর লরী আসার শব্দ হইল, তাহার পর ঝনঝনাইয়া ভারী জিনিষ পড়ার শব্দ।··· বিকালে আবার নূতন ঘরের দরজা খুলিয়া কুলিরা থান থান করুগেটেড্ লোহার চাদর উঠানে আনিয়া ফেলিল, গায়ে গায়ে লাগাইয়া এমুড়ো ওমুড়ো একটা বেড়া তুলিয়া দিল।

আগাছার বেড়ার জায়গায় একেবারে পাকা ব্যবস্থা, কিছু বলিতে না পারায়

অন্নদাঠাকরুণের পেট ফুলিতেছিল। রকটুকুও বন্ধ করিবার জন্য কুলিরা চাদর তুলিতেই গর্জাইয়া উঠিল—"তোরা আমার রাস্তা বন্ধ করিস কার হুকুমে ?... অম্বিকে, বেরোও, শুধু কথায় এদের সানাবে না।"

—আগাইয়া গিয়া মাঝখানে দাঁড়াইল, অম্বিকাচরণও লাঠি হাতে বাহিরে আসিয়া দৃষ্টি তুলিয়া দাঁড়াইল, ঠিক যে মারামারি করিবার জন্য এমন নয়, যেন হুকুমটা অমান্য করিবার উপায় নাই বলিয়াই।

কুলিদের একজন নরম হইয়া বলিল—"বাবু সবটুকু বন্ধ করে দিতে বলেছেন, তাই..."

অন্নদাঠাকরুণের গলা আরও এক পর্দা চড়িয়া উঠিল।—

"বলি, কেন ? কি অধিকারে ? আমার বাড়ির তুদিকে যাওয়া-আসা বন্ধ করবার কী হক্ তোর বাবুর ? সে নিজে কেন সামনে এসে হুকুম দেয় না ? ডাক্, মস্ত বড় মদ্দ তো নিজে দাঁড়িয়ে তুলুক বেড়া—গোঁফ পাকিয়ে—পাকা-চুলে টেরি ফুলিয়ে। একটা অবলা মেয়েছেলের একদিনের দাবড়ানি খেয়ে ঘরের কোণে..."

এই সময় নূতন ঘর তুইটার মধ্যে একটার দরজা খুলিয়া গেল এবং কালকের সেই যুবকটি গটগট করিয়া একেবারে সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল —"তিনি নেই, কালকের সেই ব্যাপারে তাঁকে সরিয়ে দিয়েছি; আজকের এসব কাজ আমার হুকুমে হচ্ছে।"

ভঙ্গীটা দৃপ্ত, মুখে বিরক্তির ছাপটা বেশ স্পষ্ট, তা সত্ত্বেও চেহারার মধ্যে এমন একটা সংযত ভদ্রভাব যে অন্নদাঠাকরুণের মুখে কোন কথা ফুটিল না। সেই লোকটাকে সরাইয়া দেওয়ার কথাতেও নিশ্চয় বিস্ময়কুণ্ঠিত করিয়া দিয়া থাকিবে, খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিয়া একটু স্খলিত কণ্ঠে বলিল—"তাতো বুঝলাম, তোমার হুকুমে হচ্ছে, কিন্তু আমার বাড়িতে..."

"বাড়ি আপনার নয়।"

"তবে ?"

"তবে আর কি ?—আমার। নৈলে এত টাকা খরচ করে কখনও মেরামত করে লোকে পরের বাড়ি ? কার মাথাব্যথা পড়েছে বলুন না ?

"তাহলে আমার বাড়ি কোথায় গেল ?—আমার জমি পুকুর···"

"সে-কথার উত্তর দিতে পারি না বলে তো আমার নিজের বাড়ি থেকে বঞ্চিত হ'তে পারি না।···দোষটা কি এতই গুরুতর ?"

এতটা যুক্তির সঙ্গে এমন কঠিন শ্লেষ শোনার নিশ্চয় অভ্যাস নাই অন্নদাঠাকরুণের; এ পর্যন্ত জীবনে যাহাদের সংস্রবে আসিয়াছে এ যেন সে-সকলের থেকেই আলাদা; নির্বাকভাবে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

যুবকের সমস্ত ভঙ্গীটা বেশ খানিকটা নরম হইয়া গেল, বলিল—"আমায় মাফ করবেন, ভুল হয়ে যাচ্ছে আমার; কিন্তু তার গোড়াতেও রয়েছে আপনার ভুলটা। আমার ইচ্ছে ছিল, উচিতও ছিল আগেই আমার মেশোমশাইয়ের ব্যবহারের জন্যে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাওয়া—কিন্তু···কিন্তু যাক্, করবেন ক্ষমা আপনারা দয়া করে, তিনি যে অমন তা আমি জানতাম না, তাহলে আগেই সাবধান হতাম। বাকি থাকে আপনাদের থাকবার কথা; আপনারা দুদিন থাকুন, দশদিন থাকুন, বা বরাবরের জন্যে থাকুন, আমার কিছু আসে যায় না। বলেন তো যেমন বাড়িটা ওদিকে করছি, এই দিকটাও এই সঙ্গে ঠিক করিয়ে দোব; বিশেষ অসুবিধে বোধ করেন, আপাতত এইরকম থাকলেও আমার ক্ষতি নেই। বলবেন আমার এতে স্বার্থটা কি ?—কিছুমাত্র নয়, মস্তবড় একটা উপকার করছি বলেও আমি মনে করি না—বাড়িটা আছে পড়ে, আপনাদের দরকার, আমি একা মানুষ সমস্তটা না হলেও চলে, তাই আমার আপত্তি নেই বিশেষ।"

চুপ করিল; একটু পরেই আবার বলিল—"হাঁ, তা হলে বলুন—রকটুকুও বন্ধ করে দোব, না, আগেকার মতন খোলাই থাকবে ?"

অন্নদাঠাকরুণ কিছু উত্তর করিল না, গম্ভীরভাবে একবার লোহার চাদরগুলার দিকে আড়ে চাহিল।

যুবকই কহিল—"আমি বলি না হয় দিকই বন্ধ করে। মেলা কুলি মজুর খাটছে এদিকে, আর, আপনাদের কোন কাজও তো থাকে না ওদিকে···যেমন বলেন।"

অন্নদাঠাকরুণ কিছুই বলিল না, মুখটা অতিরিক্ত গম্ভীর করিয়া আস্তে ধের ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

সমস্ত দিন চারজনের একরকম নীরবেই

অম্বিকাচরণ আর নারায়ণীর মনটা খুব হালকা, একটা মস্ত বড় দুশ্চিন্তার বোঝা যে এই বিপন্ন পরিবারের ঘাড় থেকে নামিয়া গেছে এটা দুজনের লঘু গতিবিধি থেকে বেশ বোঝা যায়। ভিতরের আনন্দে দুজনের মুখ চোখ মাঝে মাঝে অকারণেই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু অন্নদাঠাকরুণ বরাবরই নির্বাক আর গম্ভীর বলিয়া এরাও কথাবার্তার মধ্যে সেটা প্রকাশ করিতে পারিতেছে না।

নির্বাক এবং গম্ভীর জাহ্নবীও, তবে সেখানে নারায়ণী একবার টোকা মারিল ; একবার একটু একা পাইয়া প্রশ্ন করিল—"তোর মনটা আজ যেন বেশি ভার-ভার বোধ হচ্ছে জাহ্নবী ?"

জাহ্নবী উত্তর করিল—"হালকা হবারই বা কি হ'য়েছে মা এমন ?"

নারায়ণী একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল উত্তরটাতে, বলিল—"নাই হোক, তা'বলে তোর এত ভাবনা কিসের এই বয়সে ? আমরা তো রয়েছি।"

জাহ্নবী আর ইহার উত্তর দিল না।

রাত্রে যখন সবাই একত্র হইয়াছে, অম্বিকাচরণ আর জাহ্নবী আহার করিতেছে, অন্নদাঠাকরুণ আর নারায়ণী বসিয়া আছে, একথা সেকথা লইয়া একটু গল্প আরম্ভ হইয়াছে,—জাহ্নবী একটু অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বলিল— "দিদিমণি···একটা কথা বলছিলাম।"

অন্নদাঠাকরুণ বলিল—"বল্ না···কথাটা কি ?"

"বললে তুমি রাগ করবে, মা আর দাদু আরও বেশী, তবু না ব'লে পারলাম না,—বাড়িটা যে ওরই একথাটা কি মেনে নিলে ?"

খানিকক্ষণ ঘরটা একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার পর অন্নদাঠাকরুণ বলিল—"না মেনে উপায় কি দিদি ? আবার তাও ভাবছি—সত্যিই যদি না হয় বাড়ি ওর তো এতটা খরচ ক'রে ক'রতেই বা যাবে কেন মেরামত ? শুনলি না, বললে ?"

"শুনলাম বৈকি। বলে মুখের মতন উত্তর পেলে না ব'লে আমার গাটা জলছে সেই থেকে, সত্যি কথা বলতে কি।...আমার মুখে এসেও গেছল কথাটা—গোরু মেরে জুতো দান হচ্ছে।...মেরামত করানোটা তো অধিকারের প্রমাণ নয় দিদিমণি, সেটা টাকার প্রমাণ হতে পারে, তার চেয়েও বেশি গা'জুরির প্রমাণ। আমি হ'লে এই সবই বলতাম।"

ঔদ্ধত্যে অম্বিকাচরণ আর নারায়ণী শুধু বিস্মিত নয়, ভীতও হইয়া পড়িয়াছে ভিতরে ভিতরে; অম্বিকাচরণ থাকিয়া থাকিয়া বার দুই অল্প অল্প কাশিল নারায়ণী সামলাইবার জন্য বলিল—"পিসিমা একটা কিছু না বুঝেই কি নিয়েছেন মেনে?"

"বেশ, তা'হলে বাড়িটা ছেড়ে দিই আমরা···আর সত্যি, ওর হওয়াও তো সম্ভব।"

চেষ্টা সত্ত্বেও নারায়ণীর দৃষ্টিটা অন্নদাঠাকরুণের মুখের ওপর গিয়া পড়িল, গালে হাত দিয়া মুখ নিচু করিয়া বসিয়া আছে। নারায়ণীই বলিল—"যখন নিজের মুখেই বলছে তার এতটা বাড়িতে দরকার নেই···কিংবা ধরো আছেই দরকার,—স্ব-ইচ্ছেয় যখন দিচ্ছে ছেড়ে······"

"গেরস্ত যেমন ভিকিরীকে নিজের দরকারী চাল থেকে স্ব-ইচ্ছেয় দেয় এক মুঠো······"

নারায়ণী ভিতরে ভিতরে একেবারে উত্যক্ত হইয়া উঠিল, কতকটা সেইজন্যেও এবং কতকটা বোধ হয় অন্নদাঠাকরুণকে একটু খোসামোদ করিবার জন্য সেইদিনের কথাটা প্রকাশ করিয়া দিল, বলিল—"জানো পিসিমা? তোমার নাতনি এবার ভার নেবে সবাইয়ের, বিদ্বান হয়ে এসেছে তো তিন বছরে!"

ইহাতেও অন্নদাঠাকরুণ কোন কথা কহিল না।

শুবে জাহ্নবীর মুখটা রাঙিয়া উঠিল, একটু চুপ করিয়াই রহিল, তাহার পর বলিল—"তা নিজের দাদু, দিদিমা, মা অপরের ভার হয়ে রয়েছে এটা যদি তোমার মেয়ের নাই সয় মা?···নিজের ক্ষমতা নেই, ঘাড়ে করতে গেলে পিঠটা ভেঙে গিয়ে মরব নিশ্চয়, কিন্তু সে যা মরণ তাতে এ অপমান থেকে তো বাঁচব···তোমরাও তো বাঁচবে?"

অম্বিকাচরণ কয়েকবারই খুক খুক করিয়া কাশিয়াছে, নিরুপায়ভাবে বলিল—"একটু ডাল দিবি বন্দী ?"

নারায়ণী খুব অন্যমনস্ক হইয়া গেছে : অন্নদাঠাকরুণ চোখ তুলিয়া বলিল—"মায়ে ঝিয়ে বসে বসে ঝগড়া করবি শুধু ?…দাদা ডাল চাইছে।"

ইহার পরেও কয়েকদিন এইভাবে কাটিল, সবাই নীরবে থাকে, বিশেষ করিয়া অন্নদাঠাকরুণ—দিন দিনই আরও যেন নীরব, শুধু মায়ে ঝিয়ে মাঝে মাঝে এইরকম কথা কাটাকাটি চলে। ওদিকে বাড়ির কাজ হইয়া যাইতেছে, সেও একেবারেই নিরুপদ্রবে।

তাহার পর একদিন ভাতে বসিতে গিয়াই অন্নদাঠাকরুণ উঠিয়া একেবারে শয্যা গ্রহণ করিল, প্রবলবেগে জ্বর আসিয়া গেছে।

পঁচিশ

আজ মাস ছয়েক ধরিয়া নাগাড়ে একটার পর একটা আঘাত, লোহার শরীর, তেমনই শক্ত মন বলিয়া এতদিন টিকিয়া ছিল অন্নদাঠাকরুণ, আর পারিল না। চারিদিকের নিবিড় অরণ্য ছিল ওর সবচেয়ে বড় অবলম্বন, তাহাতে যেদিন প্রথম কুড়ুলের কোপ পড়িল, সেই দিনই ওর শরীর-মনে ভাঙন ধরিল। সে অরণ্য হইল প্রায় নির্মূল, তাহার পরও অন্নদাঠাকরুণ যে দাঁড়াইয়া ছিল তাহা এই বিশ্বাসের জোরে যে বাড়িটা তাহারই, হাজার নিরুপায় হওয়া সত্ত্বেও সেই জোরে গালাগালি বর্ষাইয়া, হৈহল্লা করিয়া ও বুকে বল পাইত। সেই বিশ্বাসে আঘাত লাগিয়াছে, তাহার সঙ্গে এই উপায়হীন নৈরাশ্য জাগিয়াছে মনে—তবে আমার বাড়িঘর, জমিজমা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গেল ?…ভাঙনের একটু যা বাকি ছিল সেটা পূরণ করিয়া দিল জাহ্নবীর কথাগুলা। যদি ওর তর্ক বা মন্তব্যের মধ্যে একটু খুঁত থাকিত, প্রাণ ভরিয়া, গলা খুলিয়া ঝগড়া করিতে পারিত জাহ্নবীর সঙ্গে, তো এ-ঝোঁকটাও বোধ হয় সামলাইয়া লইতে পারিত ; কিন্তু তাহা হইতে পারিল না, ওর প্রতিটি কথা অন্নদাঠাকরুণকে

অন্তরে অন্তরে নীরবে মানিয়া লইতে হইল! এই পরাজয়টুকুই দিল শেষ আঘাত।

পরিবারটি একেবারে অকূলে পড়িল। অসুখ এর আগেও হইয়াছে অন্নদাঠাকরুণের, কিন্তু সে যেন পরিচিত অতিথি, তাহার জন্য সব ব্যবস্থাই করা থাকিত; ন'মাসে ছ'মাসে একবার আসিল, কোনবার দু'দিন বেশি রহিল কোনবার দু'দিন কম, তাহার পর বিদায় লইল। এবারে কিন্তু একেবারে অন্য প্রকৃতির দেহের উত্তাপ দ্রুত বাড়িতে বাড়িতে বিকাল পর্যন্ত রীতিমতো বিকারে দাঁড়াইয়া গেল, সবার মুখ গেল শুকাইয়া। ডাক্তারের বাড়ি জানা নাই, ডাক্তার ডাকিবার মতো অর্থবল নাই, সব চেয়ে চিন্তার কথা, যায় কে? অম্বিকাচরণ বলিল—"পাশের বাড়ি খবর দিই···লোক তেমন খারাপ বলে বোধ হচ্ছে না তো; আর হলেও এ বিপদে···"জাহ্নবী নিজের ঘৃণা আর আক্রোশটা চাপিতে পারিল না, বলিল—"বিপদটাতো ওরাই পথ কেটে এনে ঢোকালে দাদু, বিকারের ঘোরে কথাগুলো শুনছ না দিদিমণির?"

নারায়ণী একবার বক্র দৃষ্টিতে কন্যার মুখের পানে চাহিল, বলিল—"বেশ, ওরাই এনেছে তো ওরাই কাটিয়ে দিক, তারপর—তাই যেমন চাইছিস—না হয় পথে গিয়ে দাঁড়াব; কিন্তু পিসিমাকেও সারিয়ে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াতে হবে তো?"

"বিপদ ঘাড়ে চাপানো যাদের ব্যবসা তাদের ডাকলে বিপদ বাড়বেই মা, তার চেয়ে দাদুকে সঙ্গে করে আমি বেরুই। ডাক্তার খুঁজে বের করা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়।"

"তুই বেরুবি!"

"ও ভয়টা আর কেন করছ মা? এটা তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে একমুঠো খেয়ে বাঁচবার জন্যেই আমার এবার বেরুতে হবে, ঐ তিন বছরের পুঁজি নিয়েই—আজ না হয়, দু'দিন পরে। আমায় বেরুতে না দাও দাদুকে বেরুতে দিতেই হবে আবার ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে।"

"ডাক্তারের টাকা?"

"আছে কিছু আমার হাতে, ওরা ভাড়ার সঙ্গে আমায় কিছু বেশি দিয়েছিল, বোধ হয় অণিমাদি বলে দিয়ে থাকবেন।"

নারায়ণী আর কিছু বলিল না, মেয়েকে যেন ভয় করে আজকাল একটু। কিছু টাকা আছে জাহ্নবীর হাতে, শুধু যে বোর্ডিং থেকেই বেশি করিয়া দিয়াছিল এমন নয়, ডোরা দিয়াছিল একটা মোটা অঙ্ক।

অম্বিকাচরণকে লইয়া জাহ্নবী বাহির হইয়া গেল।

মিনিট দশেকও যায় নাই, দক্ষিণ দিকের রকের খানিকটা এদিক থেকে প্রশ্ন হইল—"বাড়িতে কেউ আছেন?"

একটু কুণ্ঠায় পড়িয়া নারায়ণী উত্তর দিতে পারিল না। আরও একটু এদিক থেকে আওয়াজ হইল—"কেউ থাকেন তো একবার আসবেন বাইরে· রকের এটুকু বন্ধ করে দোব কিনা কাল বললেন না, আমার লোকগুলো চলে যাচ্ছে, বলেন তো ওটুকু শেষ করে দিই।"

নারায়ণী ঘোমটায় কপালটুকু ঢাকিয়া দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"বাবা বাড়িতে নেই, পিসিমারও···পিসিমাও······"

চুপ করিয়া গেল।

"তিনিও বাড়ি নেই?"

জাহ্নবীর ভয়েই যেন উত্তরটা নারায়ণীর গলায় একটু আটকাইয়া গেল, তাহার পর বলিল—"না, পিসিমার অসুখ করেছে।"

যুবক লঘুভাবেই লইল সংবাদটা, বলিল—"শুধু এটা বন্ধ করে দেব কিনা বলবেন।"

"অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন······"

"সে কি!—যুবক যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াই একটু থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর একেবারেই দ্বিধাহীন গতিতে ঘরের মধ্যে গিয়া বলিল—"কি অসুখ! কোথায় আছেন তিনি?···দেখি তো।"

নারায়ণী ভিতর দিকে সরিয়া দাঁড়াইতে, যুবক চৌকির কাছে গিয়া অন্নদাঠাকরুণের কপালে হাত দিয়া শিহরিয়া উঠিল, বলিল—"একি! কতক্ষণ হয়েছে? আমায় জানান নি কেন?"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বাড়ির ওদিকটায় চলিয়া গেল এবং প্রায় সঙ্গে

সঙ্গেই একটা ওডিকলনের শিশি খুলিতে খুলিতে আসিয়া, খানিকটা রোগিণীর কপালে চাপড়াইয়া বলিল—"বাতাস করুন···ডাক্তার ?······"

নারায়ণী হাওয়া করিতে করিতে বলিল—"ডাকতে গেছেন।"

"কে ?···ও !—কিন্তু তিনি তো প্রায় অন্ধ, কাল যেন মনে হ'ল।"

"আমার মেয়ে সঙ্গে গেছে···"

"কি সর্বনাশ !···কতক্ষণ ?"

"এই মিনিট দশ বারো।"

"কি সর্বনাশ! চারিদিকে মিলিটারি !—আপনারা কিরকম ?···এই শিশিটা রইল, জলের সঙ্গে মিশিয়ে— যেন না শুকোয়······"

হনহন করিয়া বাহির হইয়া গেল। একটু পরেই মোটর স্টার্ট দেওয়ার শব্দ হইল।

বৃদ্ধ আর জাহ্নবীকে দেখিতে পাইল একটা রাস্তার মোড়ে, বোধ হয় জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া অগ্রসর হওয়ার জন্যই খুব বেশি দূরে যাইতে পারে নাই। মোটর দাঁড় করাইয়া নামিল, প্রশ্ন করিল—"কোথায় যাচ্ছেন ?"

জাহ্নবীর মুখের পানেই চাহিয়া প্রশ্ন, কিন্তু উত্তর দিল অম্বিকাচরণ, প্রতিপ্রশ্ন করিল—"কে ?"

"আমি ব্রজলাল, আপনাদের বাড়িতেই থাকি। আপনারা বাড়ি যান, আমি ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসছি।"

তাহার পর জাহ্নবীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল—"ওঁকে বাড়ি নিয়ে যান। আপনারা কিরকম মানুষ বুঝছি না তো! বিপদের ওপর বিপদ ডেকে আনেন !"······

—বলিতে বলিতেই মোটরে গিয়া উঠিল।

মিনিট পনেরোর মধ্যে ডাক্তার সঙ্গে করিয়া ফিরিল; বেশি দূর বা ঘোরাঘুরির মধ্যে গেল না, সেনা-শিবিরে গিয়া ওখানকার সার্জেনকে ডাকিয়া আনিয়াছে, একজন পাঞ্জাবী। ভালো ভাবে পরীক্ষা করিয়া একটা ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিল। শেষ হইলে তাহাকে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য এবং ঔষধটা

আনিবার জন্য ব্রজলাল তাহার সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। ঔষধ আনিতে হইল সহর থেকে ; তবে মোটরে যাতায়াত, খুব বেশি বিলম্ব হইল না। এক দাগ ঔষধ সেবন করাইয়া মাথায় হাওয়া করিতে করিতে নারায়ণী বলিল—"বাবা, ওঁকে জিগ্যেস করো ডাক্তার কি বললে? ভয়ের কিছু আছে?"

অম্বিকাচরণের যেন বাকরোধ হইয়া গেছে ; একপাশে মাথা নিচু করিয়া বসিয়াছিল, বার দুই কাশিয়া প্রশ্নটা করিবার আগেই ব্রজলাল নিজেই উত্তর দিল, নারায়ণীর পানেই চাহিয়া বলিল—"সেবাটা ঠিক মতো হওয়া দরকার। না হয় একজন নার্সের ব্যবস্থা করবো?...জানি না এখানে আবার পাওয়া যায় কিনা।"

নারায়ণীর দৃষ্টিটা আরও শঙ্কিত হইয়া উঠিল, ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল—"ভয়ের আছে কিছু? লুকুবেন না, স্পষ্ট করেই বলুন ডাক্তার যা বলেছেন, আমরা বড্ড অসহায়।"

"কিন্তু এত হেদিয়ে পড়লে তো ফল খারাপই হবে। অসুখটা যে ভালো নয় দেখতেই পাচ্ছেন, কত অল্প সময়ের মধ্যে একেবারে বাড়াবাড়ি হয়ে উঠেছে। ওষুধটা লাগলে ভয়টুকু কেটে যায়...আপাতত। সেটা এক্ষুণি টের পাওয়া যাবে ; তবে সেবাটা ঠিক মতো হওয়া চাই, সেটা আপনারা কি......?"

জাহ্নবী প্রশ্ন করিল—"ডাক্তার যেমন যেমন বললেন তাইতো? তা পারবো, দু'জন রয়েছি আমরা।"

পাঞ্জাবী ডাক্তার যাহা বলিয়াছে সব ইংরাজীতে, ব্রজলাল একটু চকিত দৃষ্টিতেই জাহ্নবীর মুখের পানে চাহিল, তাহার পর বলিল "হ্যাঁ, তাই...আমিও আছি, যতটুকু পারি ; তা'ভিন্ন নার্স খুঁজে বেড়ানোও চলবে না, ডাক্তারকে তাড়াতাড়ি রিপোর্ট দিয়ে আসতে হবে, বা ডাকতে হবে...ওষুধটা কটার সময় খাওয়ানো হল?"

নিশ্চয় ভুল করিয়াই একবার দেয়ালের দিকে চাহিল, তাহার পর নিজের কব্জিটার দিকেও ভুল করিয়া চাহিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

একটু পরে একটা চাকরকে সঙ্গে লইয়া ফিরিল। তাহার হাতে একটা ছোট টেবিল, কাঁধে একটা টেবিল-ক্লথ, ব্রজলালের নিজের হাতে একটা টাইমপিস ঘড়ি, খানিকটা কাগজও। টেবিলটা পাতিয়া কাপড় বিছাইয়া তাহার উপর ঘড়িটা আর ওষুধ, ওডিকলনের শিশিগুলা; কাগজে ঔষধ সেবনের সময়টা টুকিয়া রাখিতেছে, এমন সময় অন্নদাঠাকরুণ চোখ খুলিল। দৃষ্টি খুব ঘোলাটে নয়, কিছু একটা বলিবারও চেষ্টা করিল, তাহার পর আবার চোখ বুজিল। ব্রজলাল অন্য একটা ঔষধ খাওয়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। প্রায় আধঘণ্টার মধ্যে এইরকম কয়েকবার করিয়া রোগিণীর অবস্থা অনেকটা ভালোর দিকে আসিল, জল চাহিয়া পান করিল, দু'একটা সঙ্গত প্রশ্ন করিল, উত্তরও বুঝিতে পারিল। ব্রজলাল রিপোর্টটা দিতে চলিয়া গেল।

রাত্রে একটু বাড়িল আবার, আর একবার ডাক্তারকে ডাকিতে হইল; ওভাবটা কিন্তু এবার আরও শীঘ্র কাটিয়া গেল। এ-ঝোঁকটা ভালো ভাবেই সামলাইয়া গেল।

এক সময় ওদিক থেকে একজন পাচক-ঠাকুর আসিয়া নিঃশব্দে ঘরের একদিকে প্লেটে করিয়া তিনজনের খাবার ঢাকা দিয়া চলিয়া গেল।

রাত যখন প্রায় দশটা, সুস্থ নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে রোগিণী নিদ্রাগত, ব্রজলাল উঠিল, বলিল—"এবার আমি যাই, খেয়েদেয়ে আবার আসছি।"

নারায়ণী বলিল—"আর আসতে হবে না আপনাকে রাত্তিরে।"

"যদি কিছু…"

"যদি কিছু দরকার দেখি সঙ্গে সঙ্গে খবর দোব। আর আমাদের উপায়ই বা কি? কাকেই বা বলব?"

জাহ্নবী যেন প্রস্তুত হইয়াই ছিল, দু'খানা দশ টাকার নোট হাতে আগাইয়া গিয়া বলিল—"ডাক্তারের ফী আর ওষুধের দামটা…কতো হ'ল?

ব্রজলাল একটু বিরক্তির সহিত চাহিল নোট দু'খানার পানে। তাহার পর জাহ্নবীর মুখের ওপর সেই দৃষ্টিই সাধ্যমতো নরম করিয়া তুলিয়া বলিল—"থাক্ না, আমি তো পালাচ্ছি না, রোগের খরচও আজই শেষ হয়ে যাচ্ছে না।"

আর কিছু না বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

ছাব্বিশ

অসুখটা দিন তিনেক বেশ বেগ দিল, তাহার পর ধীরে ধীরে কমিতে আরম্ভ করিল। সপ্তাহখানেক পর্যন্ত কমিয়া কমিয়া যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইল তাহার পর আর কোন উন্নতি দেখা গেল না, অন্নদাঠাকরুণ শয্যাগত হইয়া পড়িয়া রহিল। এইভাবেই কাটিতে লাগিল। ব্রজলাল এর মধ্যে একদিন জেলা সহর হইতে সিভিল সার্জেনকেও ডাকিয়া আনিল, দুই ডাক্তারে আলোচনা করিয়া অভিমত দিল যে রোগটা খুবই কঠিন হইয়াছিল, মস্তিষ্ক থেকে আরম্ভ করিয়া সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে উৎকটভাবে নাড়া দিয়া গিয়াছে; তাহা ভিন্ন বয়সের জন্যও জীবনীশক্তিতে ভাঁটা পড়িয়া আসিয়াছে, পূর্বের অবস্থায় ফিরিতে সময় লইবে।

এই ব্যাপারটুকু লইয়া ব্রজলালের সঙ্গে পরিবারটির ঘনিষ্ঠতা গাঢ় হইয়া উঠিল। খুবই স্বাভাবিক, কেননা সে যাহা করিল, নিতান্ত আপনার জন ব্যতীত সেরকম কেহ করে না। বাড়াবাড়ির তিনটা দিন প্রায় দিনরাতই রোগিণীর ঘরে কাটাইল; অর্থ দিয়া সেবা করিয়া, আরও সবরকমে কায়িক পরিশ্রম করিয়া তাহাকে সঙ্কট অবস্থা হইতে টানিয়া তুলিল। শুধু তাহাই নয়, এদিকে বাকি তিনজনের দিকেও সজাগ দৃষ্টি, বিশেষ করিয়া অম্বিকাচরণের দিকে; আহারে স্নানে, সাধ্য-মতো বিশ্রামে কোন অনিয়ম আসিতে দিল না। এসবই করিল এমন একটি সহজ দৃঢ়তার সঙ্গে যে জাহ্নবী পর্যন্ত এদিকের নির্দেশগুলি ওর কথামতো নির্বিবাদেই পালন করিয়া গেল, মনের ভিতরে যত-যাহাই থাকুক না কেন।

নারায়ণীর চেয়ে বয়সেও অনেক কম, প্রায় চার পাঁচ বছর, সুতরাং দু'চার বার কথাবার্তার পর ওদিকটাও সহজ হইয়া গেল। রোগের প্রথম ধাক্কাটা কমিয়া আসিলে যখন একটু ফুরসৎ পাওয়া গেল, এদের প্রশ্নে এ-প্রসঙ্গে সে-প্রসঙ্গে নিজের পরিচয়ও সে দিল খানিকটা। যুবক আজন্ম প্রবাসী, পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এই প্রথম বাঙ্গালায় আসিয়াছে। ওর বাপ লক্ষ্ণৌ থেকে কয়েক

মাইল দূরে একটা গণ্ডগ্রামে ডাক্তারী করিতেন। বাড়িঘর যাহা কিছু সেইখানেই করিয়া যৌবনোত্তর প্রায় সমস্ত জীবনটাই সেখানে কাটান। দেশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। দু'একবার যা আসিয়াছেন, কলিকাতাতে —আত্মীয়স্বজনের বাড়িতেই কাটাইয়া গেছেন। ব্রজলাল গল্প শুনিত সে বড় পরিবারের ছেলে—দেশে নাকি প্রকাণ্ড চকমেলানো বাড়ি ছিল—তবে সে পরিবারেও কেহ বাঁচিয়া নাই, বাড়িও দাঁড়াইয়া নাই। ওখানে নিজেদের সংসারে বাবা, মা আর একটি মাসতুতো বিধবা ভগ্নী, তাহার বাপ কলিকাতাতেই থাকেন, কন্যার খোঁজখবর রাখেন না।

দুই বৎসর আগে প্লেগের হিড়িকে বাবা, মা ও ভগ্নীটি উপরি উপরি মারা গেল। তাহার পর এই দুইটা বৎসর যে কি করিয়া কাটিয়া গেছে বিশেষ খোঁজ রাখিতে পারে নাই ব্রজলাল। সম্পত্তি সামান্য যা কিছু ছিল যেন কোথায় দিয়া উড়িয়া গেল। প্রথমটা ছিল দারুণ শোকের বেগ, তাহার পর আসিল নিদারুণ দৈন্যের। এই সময় মনে হইল কলিকাতার দিকে আসিবার কথা।

তাহার পর ওর জীবনের একটা দিকপরিবর্তন হইয়া গেল রেলে আসিতে আসিতে,—একজন মারোয়াড়ী বড় মিলিটারী কণ্টাক্ট ধরিয়াছে, ইংরাজী জানা কর্মঠ লোক চায়; ব্রজলালের সঙ্গে কথাবার্তা কহিয়া নিজের কাজে ডাকিয়া লইল। কিছুদিন একসঙ্গে থাকিয়া ব্রজলাল স্বাধীনভাবে কাজ ধরিতে লাগিল, এবং ওদিক দিয়া একটু গুছাইয়া উঠিলে, খেয়াল হইল দেশের বাড়িটা খুঁজিয়া বাহির করিয়া আবার বাসোপযোগী করিয়া লইবে এবং সেইটাকেই নিজের কর্মকেন্দ্র করিবে। এক গ্রাম আর জেলার নাম ভিন্ন কিছুই জানা নাই, তাহাও এত অস্পষ্টভাবে যে, তাহার ওপর নির্ভর করিয়া গিয়া দাঁড়ান যায় না। শেষে মেসোমশাইয়ের কথা মনে পড়িল। স্বাস্থ্য মেরামত করিতে বারদুয়েক ব্রজলালদের প্রবাসের বাটীতে গিয়াছিল তাহার শৈশবে, যেন মনে পড়ে সে সময় দেশের বাড়িতে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের খবরও লইয়া গিয়াছিল। বোমার ভয়ে পলাতক মেসোমশাইকে তবুও খুঁজিয়া বাহির করিল; অনুমানটা ঠিক, সে জানে বাস্তুভিটার সন্ধান, অনেকবার গিয়াছে সেখানে, একদিন সঙ্গে করিয়া আনিল। তাহার পর এঁদের সবই জানা।

কাহিনীটার মধ্যে মস্ত বড় একটা গলদ থাকিয়া যায়,—মেসোমশাই তো ঐ মানুষ, তাঁহারই কথায় বাড়ির ওপর অধিকার কি করিয়া সাব্যস্ত হয়? সে আসিয়া বাড়িটি দেখাইয়া দিল আর সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গা-গড়া শুরু হইয়া গেল! ...কিন্তু কেহ কোন প্রশ্ন করে না; অন্নদাঠাকরুণ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া পড়িয়া শোনে; প্রশ্নতো করেই না, বরং এমন এক একটা মন্তব্য করে মাঝে মাঝে যাহাতে মনে হয় নিজের অদৃষ্টকে প্রসন্নচিত্তেই মানিয়া লইয়াছে শেষ পর্যন্ত; বলে—"যা হোক তবুও একটা লোক ছিল যে জানতো।"—কিংবা "এটা আমাদেরই ওপর দয়া ভগবানের—নয়কি?...কি গো দাদা?...নারাণ কি বলিস?"

"তা বৈকি, নয়তো তোমায় তো হারিয়েইছিলাম দিদি, বাড়ি নিয়ে কি ধুয়ে খেতাম?"

বাপের কথায় যে অসংলগ্নতাটুকু থাকে মেয়ে সেটা তাড়াতাড়ি শোধরাইয়া দেয়—"আর, যার বাড়ি সেই পেলে এর চেয়ে আর সুখের কথা কি হবে, বলনা, পিসিমা, অ্যাঁ?...

"তা আর বলতে?"

স্পষ্ট খোসামোদ, কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও খুব সত্য যে, স্বার্থের কথা বাদ দিয়াও ছেলেটিকে ঘিরিয়া তিনজনের মনে সত্যকার প্রীতি উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে। বাস্তবিকই বড় ভালো—যেমন নির্ভরযোগ্য তেমনই, বোধহয় সংসারে নিতান্ত একা বলিয়া কয়েকটা বিষয়ে আবার নির্ভরশীলও—যাহার জন্য তাহাকে বয়সের অনুপাতে বেশ একটু ছেলেমানুষ বলিয়া মনে হয়, বুকের স্নেহ আপনি উদ্বেলিত হইয়া ওঠে।

ওর সম্বন্ধে পরোক্ষেও আলোচনা হয়। —"গুণতো দেখছই বাবা, আর রূপেও তেমনি রাজপুত্রের মতন! বরাবর পশ্চিমে ছিল তো?"

অম্বিকাচরণ বলে—"দেখতেই পাই না, সব ক্রমেই আবছা হয়ে আসছে..."

চুপ করে, তাহার পর দু'তিনবার কাশে, তাহার পর আবার বলে—"আর কায়েতও তো...আমাদের মতনই।...সবই তো ভালো, কিন্তু ঐ যে বললাম দিন দিনই ঝাপসা হ'য়ে যাচ্ছে সব—দিদিমণিই বললি অপূর্বটি হয়ে ফিরে এসেছে, তা পেলাম কি দু'চোক ভরে ভাল করে একটু দেখতে?"

ব্যক্তের মধ্যে কি সব অব্যক্ত কথা লুকানো থাকে, দুজনেরই গভীর নিশ্বাস পড়ে।

এদের তিনজনের এই ইতিহাস, ওদিকে জাহ্নবীর ভাবটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। দিন দিনই অধিকতর অপ্রসন্ন হইয়া উঠিতেছে। সাধ্যমতো চাপিয়াই রাখে মনের ভাব, তবে এরা প্রশংসামুখর হইয়া উঠিলে অনেক চাপিয়া চাপিয়াও শেষ পর্যন্ত এক আধটা বিদ্রূপ না ছাড়িয়া পারে না। যদি খুবই সংযত করিল নিজেকে, তো ঘরটা ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তবে যায় এমন করিয়া যে মনের ভাবটা সূক্ষ্ম বিদ্রূপের চেয়ে আরও স্পষ্টভাবে ছড়াইয়া পড়ে ঘরময়।

সাক্ষাতে ওদের নিজের দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা যেমন বারে অল্প, তেমনি সংক্ষিপ্ত। বাড়াইতে গেলেই অপ্রীতিকর হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে এই ভয়েই যেন অল্প দু'এক কথার প্রশ্ন-উত্তরে সারিয়া লয় দুজনে, তাহাও নিতান্ত প্রয়োজনে। অপ্রিয় করিবার পাত্র অবশ্য জাহ্নবী, সে যেন নিয়তই অন্তরের একটা জ্বালাকে চাপা দিয়া ফিরিতেছে এবং এটা জানে বলিয়াই সে থাকে বেশি সাবধান।

কিন্তু দিন দিনই অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। ওর নিজের একটা প্ল্যান ছিল, আশা ছিল অন্নদাঠাকরুণ সারিয়া উঠিলে একদিনে না হয় ধীরে ধীরে বাহিরে একটা ব্যবস্থা করিয়া লইয়া ও সবাইকে লইয়া এখান হইতে সরিয়া যাইবে। ব্যবস্থার মূলধন অবশ্য ওর ঐ তিন বছরের শিক্ষা, কিন্তু ওরা তিনজনে যাহাই বলুক, ওর নিজের সে-বিষয়ে আত্মবিশ্বাস আছে, আরও এটাও জানা আছে, একটা সংস্থান করিয়া লইতে পারিলে মা, আর দাদুকে সহজেই নিজের দিকে টানিতে পারিবে। সবাই একদিকে হইলে অন্নদাঠাকরুণও যে নিজের জিদ ধরিয়া বসিয়া থাকিবে, এই কঠিন অসুখের পর, সে শক্তি থাকিবে না তাহার। কিন্তু গোল বাধাইল অন্নদাঠাকরুণ—না ভালো করিয়া অসুখে পড়িয়া রহিল, না ভালো করিয়া ভালো হইল, শরীরের মধ্যে রোগের সামান্য একটু রেশ এমন-ভাবে আটকাইয়া রাখিল যে, বেশ বোঝা গেল কিছুদিনের জন্য এই শয্যাই এখন ওর অবলম্বন।

জাহ্নবীর মনে হয় একটা যেন ষড়যন্ত্র,—একদিকে ওরা চারজনে, একদিকে সে একা।

তবুও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে সংযত থাকিবার, কিন্তু এত চেষ্টা করিবার জন্যই বোধ হয় একদিন হঠাৎ মনে হইল কিছু একটা না করিলে যেন আর বাঁচে না।

চিকিৎসার খরচের কথাটা মনে পড়িল।

একদিন ডাক্তারের ফীর দরুণ কুড়িটা টাকা দিতে গিয়া একরকম দাবড়ানিই খাইয়াছিল ব্রজলালের কাছে। এখন ডাক্তারের ফী, ঔষধের দাম, এসব বটেই, এমনকি সংসারও চলিতেছে তাহারই টাকায়। টাকা বাহির করি দিবার মালিক অন্নদাঠাকরুণ, সে ঐ অবস্থায় পড়ায় কতকটা নিঃসাড়েই এই রকম দাঁড়াইয়াছে; জাহ্নবী আবার ঐ সূত্র ধরিয়াই আরম্ভ করিল, তাহার কাছে যা টাকা আছে তাহাতে কিছুই হইবে না, তবুও কেমন ওর একটা জিদ ধরিয়া গেল। করিয়াই বসিল একটা কাণ্ড—

ব্রজলাল আজকাল খুব বেশি আসে না এদিকে, দরকার হয় না, নিজের কাজ লইয়াই বাহিরে বাহিরে থাকে, ওদিকে খানিকটা ক্ষতিও হইয়া গেছে। সকালে বাহির হইবার আগে একবার খোঁজটা লয়ই, তাহার পর হয়তো সমস্ত দিনই আসিতে পারিল না।

সেদিন বিকালের দিকেই ফুরসৎ হইয়াছে, আসিয়া গল্প করিতে লাগিল। আজকাল আর চিকিৎসার দিকটা লইয়া বেশি আলোচনার কিছু থাকে না, গল্প হয় আর পাঁচটা কথা লইয়া,—এদিকে নিজের জীবনের কাহিনী, ঠিকার কাজ এখন কি চলিতেছে, কেমন আয়, কি সব অভিজ্ঞতা, লড়াইয়ের কি খবর, বোধ হয় দুর্ভিক্ষ আসিয়া পড়িল বলিয়া,—বেশ জমিয়া ওঠে গল্প।

সেদিন আরও জমিয়া উঠিয়াছে। ইহারা তিনজনে চায় ছেলেটিকে, কিন্তু পায় না। আজ ভালোভাবে অনেকক্ষণ পাইয়া ইহারাও মুখর হইয়া উঠিল। জাহ্নবীর মুখটা শুধু অন্ধকার, অন্নদাঠাকরুণের মাথায় হাত বুলাইতেছিল, একসময় উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। যখন ফিরিল, আর চৌকির ওপর আসিল না; নারায়ণী একবার আড়চোখে চাহিয়া দেখিল, নিজের ব্যাগটা খুলিয়া একমুঠা কি বুকের

কাছটায় ব্লাউজের ভিতর গুঁজিয়া রাখিল, তাহার পর একখানা বই লইয়া আবার বাহির হইয়া গেল।…গল্পের মধ্যে নারায়ণীর দু'একটা কথা একটু এলোমেলো হইয়া যাইতে লাগিল। খানিকপরে ব্রজলাল উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—"আসি দিদিমা; দাদু, মাসিমা আসি; আজ আবার এখানকার মেজরের বদলি, নতুন একজন আসবে, তার পুজো দিয়ে আসি, ওরাই তো ভরসা।"

হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া রক দিয়া খানিকটা গেছে, নারায়ণী দেখিল জাহ্নবী পাশের ঘর থেকে একটু ত্রস্তভাবেই বাহির হইয়া দুয়ারের সামনে দিয়া অনুসরণ করিল। নিম্নকণ্ঠে একটু ডাকও দিল—"শুনুন!"

ব্রজলালের প্রশংসা করিয়াই বোধ হয় অন্নদাঠাকরুণ কিছু বলিতে যাইতেছিল, নারায়ণী চাপা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিল—"একটু চুপ করো তো পিসিমা।"

অম্বিকাচরণ প্রশ্ন করিল—"কি গা বন্দী?"

নারায়ণী হাতটা উঁচাইয়া বলিল—"চুপ করো।"

উহারা দু' জনে কিছু না দেখিলেও উৎকর্ণ হইয়া রহিল।

ইহার মধ্যে বোধ হয় এক আধটা কথা বাদ গেছে, শুনিতে পাইল ব্রজলাল প্রশ্ন করিতেছে—"এ কিসের টাকা?"

জাহ্নবীর গলা—"চিকিৎসার; ফী, ওষুধ…তারপর অনেকদিন হ'য়েও গেল তো—সেই যে একবার দিতে গেছলাম।"

সহজই কণ্ঠস্বর দুজনের।

এরপর একটু বিরাম, তাহার পর কিন্তু ঠিক উত্তেজিত না হইলেও দুজনের স্বর বেশ স্বাভাবিক নয়। ব্রজলাল প্রশ্ন করিল—"কত এনেছেন?"

"পঞ্চাশ।"

"এখনও হিসেব করিনি; কিন্তু—কিন্তু অত কমই খরচ হয়েছে মনে করেন কি?"

আবার একটু বিরাম, তাহার পর জাহ্নবীর গলা—"দাঁড়ান, যাবেন না, দিব্যি রইল।"

মুহূর্ত পরেই জাহ্নবী আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল; মুখখানা রাঙা, হনহন্ করিয়া গিয়া ব্যাগটা খুলিল। নারায়ণী বলিল—"কি হয়েছে শুনি?" অন্নদাঠাকরুণ মাথাটা একটু তুলিয়া প্রশ্ন করিল—"কিলা জান্নু?—হঠাৎ?" অম্বিকাচরণ ব্যাকুলভাবে শব্দ লক্ষ্য করিয়া বার দুই কাশিল। জাহ্নবী কোন উত্তর না দিয়া, আরও গোটাকতক নোট বাহির করিয়া ব্যাগটা বন্ধ না করিয়াই হনহন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল, আবার কথাবার্তা আরম্ভ হইল—

"এই একশ'টা—আপাতত—ধারতো একদিনে শোধ দেওয়া যায় না… অন্তত আমাদের অবস্থা নেই, তাই করতেও চাইনি।"

আবার একটু বিরাম, তাহার পর ব্রজলালের কণ্ঠ—"দাঁড়ান, রাখুন টাকাটা একটু। ধারটা একদিনে শোধ না দিতে পারেন, হিসেবটা জেনে রাখা ভালো। …ইয়ে, আমার একরকমের পাওনা নয়তো, বাড়িভাড়াও আছে, পাওনা মেটাবার জন্যে যে ক্ষেপে উঠেছেন, পারবেন অত দিতে—যত দিন থেকে আছেন হিসেব করে?"

বলিতে বলিতেই স্বরটা বেশ একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। এবার যা বিরাম সেটা যেন যাইতে চায় না, তাহার পর হয়তো এক পর্দা ওপরেই জাহ্নবীর গলা খুলিল—

"হিসেবের কথাটা মনে করিয়ে দেবার জন্যে ধন্যবাদ আপনাকে—কিন্তু ভাড়া দেবেন তো আপনি, আর সে-হিসেবে পাওনা তো আপনার নয়। বাড়ি দখল করে, জমি দখল করে ব্যবসা চালাচ্ছেন, চিকিৎসার জন্যে যা খরচ হয়েছে, ভাড়া হিসেবে তার জন্য কিছু বাদ গেলেও, আমাদের বাড়ি তছনছ করবার জন্যে খেসারত হিসেবে যে এখনও আমাদেরই অনেক পাওনা আপনার কাছে।… বোকামি করেছিলাম টাকা দিতে গিয়ে; যেমন ওদিকে ঠিকেদারি করছেন, তেমনি করুন আমাদেরও খরচপত্রের ঠিকেদারি—চালান এখন—তারপর কোন সময়ে হিসেব করে ভাড়া থেকে…"

রীতিমত কলহ! এই সময় নারায়ণী বাহির হইয়া একেবারে দুইজনের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ব্রজলালের হাত দুইটা ধরিয়া ফেলিল, ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল—

"বাবা, তুমি আর দাঁড়িয়ে অপমান হয়ো না। যাও, যাও তুমি; আমাদের পাপের ভার এভাবে আর বোঝাই হ'লে পিসিমাকে ফিরে পাব না··· ও যখন চায়, আমরা ছেড়েই যাব এ-বাড়ি, জানি এত পাপ সহ্য হবে না আমাদের···"

সাতাশ

রাত্রে ব্রজলাল আর আসিল না, কিন্তু তেমনই পরদিন সকালে মুখহাত ধুইয়াই আসিয়া উপস্থিত হইল। রকে নারায়ণীকে দেখিয়া একটু উৎকণ্ঠিতভাবেই প্রশ্ন করিল—"দিদিমা কেমন আছেন?"

নারায়ণী একটু বিস্মিত ভাবেই চাহিয়া বলিল—"কেন? ভালই তো; এসো।"

ঘরে লইয়া গেল। আজও অনেকক্ষণ ধরিয়া গল্পগুজব করিল ব্রজলাল, সকাল বেলার দিকে যাহা করিবার সাধারণতঃ সময় থাকে না ওর। যখন উঠিল, নারায়ণীও ওর সঙ্গে সঙ্গে ও-বাড়ির দিকে খানিকটা পর্যন্ত গেল, তাহার পর দাঁড় করাইয়া বলিল—"তোমায় একটা কথা বলতে সঙ্গে এলাম বাবা, ছেলেমানুষের কথা ধরে বসে থেকো না। অবিশ্যি উঠে যাবার ব্যবস্থাটা শীগ্গিরই কোরবো আমরা—ওর মেজাজটা দিন দিনই যেমন হয়ে উঠছে···"

ব্রজলাল বলিল—"মাসিমা, ঐ ছেলেমানুষের কথা না ধরবার বিষয় আমিও বলতে এসেছিলাম, কেননা আমাকেও তো আপনাদের সেই নজরেই দেখতে হবে। কাল রাগের মাথায় কি সব বেরিয়ে গিয়েছিল মুখ থেকে, কিন্তু দেখছি আপনারা ধরেই বসে আছেন সে সব কথা।"

"না, না, সেকি কথা! তুমি কিই বা বলেছিলে যে···"

"বলেছিলাম বইকি মাসিমা—ভাড়ার কথা; উঠে যাবেন ব'লতে এখন বুঝলাম মাপ করতে পারেন নি।"

এর পর বেশি আসিয়া বেশি গল্প করিয়া সেদিনের সমস্ত গ্লানিটুকু মুছিয়া দিল ইহাদের তিনজনের মন থেকে। নিরুপায় দরিদ্র পরিবারের অভিমান,

অন্নায়, মিটিয়া যাইবার আগ্রহ লইয়াই জন্ম তাহার, দু'একদিনের মধ্যেই এদিক দিয়া বাড়ির হাওয়াটা পরিষ্কার হইয়া গেল।

একটা কোণে কিন্তু গুমোটটা লাগিয়াই রহিল,—জাহ্নবী যেটুকু অধিকার করিয়া আছে। মুখটা সর্বদাই থম্‌থমে, অল্প কথায় থাকে, অল্প কথা কয়, মন্তব্য পারতপক্ষে কিছু করে না, যদি করেই তো তাহা যেমনি সংক্ষিপ্ত, তেমনি বিষাক্ত।

একদিন ব্রজলালকে লইয়াই আলোচনা হইতেছিল তিনজনে। অন্নদা-ঠাকরুণের প্রশংসার ওপর নারায়ণী বলিল—"শুধু তাই নয় পিসিমা, এমনি অবশ্য করে অনেকের জন্যে অনেকেই—পয়সা আছে, মনও আছে; কিন্তু জাহ্নু যে অমনভাবে কঁ্যাট কঁ্যাট করে শোনালে সেদিন—না ভূতো না ভবিষ্যতি—তারপরে করা তো দূরের কথা, সে বাড়িতে আর পা দেয় কে বলো না?"

জাহ্নবী চৌকির একধারে বসিয়া একটা কি সেলাই করিতেছিল, চোখ না তুলিয়াই বলিল—"দেয় পা—বেহায়ায়।"

সেলাইয়ের সরঞ্জামগুলা গুটাইয়া লইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

সেদিনই আর একটা বোমা ফাটিল। পুকুরের দিকটা বাড়ির পেছন দিক বলিয়া বেশ নিরিবিলি। আগে জাহ্নবী মাঝে মাঝে বিকালে আসিয়া বসিত প্রায়ই অম্বিকাচরণকে সঙ্গে করিয়া, আজকাল যতদিন থেকে মনের এরকম অবস্থা যাইতেছে, যখন তখন চলিয়া আসে, আর বেশির ভাগ একাই।

বিকালের আকাশটা ম্লান হইয়া আসিয়াছে, জাহ্নবী আসিয়া মালতীলতার নিচে শানের বেঞ্চটায় বসিল। আজ ভেতরটা খুবই অস্থির, হাতে করিয়া একটা বই আনিয়াছে বটে, কিন্তু শুধু বারকয়েক খুলিল আর মুড়িয়া রাখিল। এমন সময় দেখা গেল অম্বিকাচরণ লাঠি হাতে হাতড়াইতে হাতড়াইতে দরজা দিয়া বাহির হইতেছে।

জাহ্নবী উঠিয়া গিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল, একটু রূক্ষ কণ্ঠেই বলিল—"একা অমন করে আসতে যাও কেন দাদু? হোঁচট খেয়ে পড়বে কোনদিন; ডাকলেই পারতে তো!"

অম্বিকাচরণ একটা উদ্দেশ্য লইয়াই আসিয়াছে, কিন্তু একটু অপ্রতিভ হইয়া গিয়া মিথ্যা করিয়া বলিল—"তুই এখানে আছিস তা কি জানি দিদি ?"

"যাব কোথায় ?…পুণ্যক্ষয় না হলে তো এ স্বর্গবাস ঘুচবে না ?"

হঠাৎ বাতাসটা ভারী হইয়া উঠিল, কিছুক্ষণের মধ্যে অম্বিকাচরণের বার কতক খুক খুক করিয়া কাশি ছাড়া আর কোন শব্দ হইল না। তাহার পর বোধ হয় অনেক চেষ্টা করিয়া সে-ই প্রথমে মুখ খুলিল, বলিল—"কেন ছেলেটি কি এতই খারাপ ? তুই নাকি অমন করে বললি, তাই জিগ্যেস করছি।"

জাহ্নবী কোন উত্তর দিল না, শুধু একটু আওয়াজ করিয়া বইয়ের খানতিনেক পাতা উলটাইল, বোধ হয় জানাইতে চাহিল সে পড়ায় ব্যস্ত। খানিকক্ষণ চুপ-চাপ কাটিল, তাহার পর আবার অম্বিকাচরণই প্রশ্ন করিল—কৈ, উত্তর দিলি নাতো ?"

"কি রকম উত্তর দিলে তোমার মনে ধরে দাদু ?"

অম্বিকাচরণ আবার সামনের দিকে চোখ তুলিয়া অপ্রতিভ ভাবে হাসিল একটু, বলিল—"রাগছিস, তবে থাক। আমি উঠি তাহলে। বই পড়ছিস ? কিন্তু অন্ধকার হয়ে আসছে না ?—চোখে জোর পড়বে যে।"

লাঠির ওপর হাত দুইটা রাখিয়া একটু সোজা হইয়া বসিল, তাহার পর "যাই, উঠি।"—বলিয়া যেই উঠিতে যাইবে জাহ্নবী খপ করিয়া একটা হাত ধরিয়া ফেলিল,—বলিল—"না বসো দাদু ; বেশ, তাহলে যখন ছাড়বেই না, তখন সব কথা পরিষ্কার হয়ে যাওয়াই ভালো,—ও খারাপ নয় বলছ, ভালোটাই বা কিসে শুনি ?"

উত্তেজনায় হাতটা ধরিয়াই আছে, হঠাৎ ভাব পরিবর্তনে অম্বিকাচরণ থতমত খাইয়া গেছে, আমতা আমতা করিয়া বলিল—"অমন উপকারটা করলে, করছেও এখনও…"

"কেন ?"

"এই শোন ! উপকারের আবার কেন কি ? উপকার করা স্বভাব এক এক জনের তাই করে।"

"দাদু, স্বভাবের বশে কোন বেটাছেলে কারুর উপকার করছে এমন দৃষ্টান্ত তো আজ পর্যন্ত পাইনি আমি।"

বোধ হয় মন্তব্যটা অতিরিক্ত গুরুগম্ভীর হওয়ার জন্যই অম্বিকাচরণ হাসিয়া ফেলিল, বলিল—"একেবারে বেটাছেলের জাত ধরে টান! তোর দাদুও তো বেটাছেলে।"

জাহ্নবীর কিন্তু এতটুকুও ভাবান্তর হইল না। হাতটা ছাড়িয়া দিয়াছে, তবে কণ্ঠে বেশ উত্তেজনার সঙ্গেই আরম্ভ করিল—"এখন আর তুমি বেটাছেলে নও দাদু, কিছু একটা হয়ে বেঁচে আছ মাত্র; আগে যখন ছিলে বেটাছেলে তখন কি করেছ কে জানে? যতক্ষণ..."

হঠাৎ থামিয়া গেল, তাহার পর এইরকম একটা কঠোর বাক্য বলিতে হইল বলিয়াই একেবারে উগ্র হইয়া উঠিল, বলিল—"দাদু, একদল বেটাছেলে তোমার অসহায় অবস্থায় তোমার ওপর অন্য এক দলকে লেলিয়ে দিয়েছে, তারা তোমার বাড়ি থেকে তোমার মেয়েকে লুটে নিয়ে গেছে—তারপর তোমার মেয়ের সমস্ত জীবনটাই ওই—একজনের, পরএকজন, একদলের পর একদল লুটের জিনিসেরই মতন তাকে নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি করবার চেষ্টা করেছে। একেবারে ছেলেবেলার কথা জানি না, অতটা বুঝিনি বলে মনে নেই, কিন্তু যখন থেকে জ্ঞান হয়েছে দেখে আসছি কী অসহায়ভাবে তোমার মেয়েকে পুরুষদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। সাহায্য করেছে তারাই, যাদের আমরা মানুষের শত্রু বলি—ঝড়, বৃষ্টি, অন্ধকার, জঙ্গল—আমি দেখেছি—তখন অত বুঝিনি, আজ ভালো করে বুঝি—সেসব বিপদের বেশির ভাগই এসেছিল উপকারের বেশ ধরে—যত ঘটা করে উপকার, যত দয়ায় গলে যাওয়া, বিপদ ততই উৎকট। এই বনে পালিয়ে এসে বেটাছেলের ভয়ে কি করে জানোয়ারের মতন দিন কাটাতে হয়েছে সে কথা মন থেকে মোছবার নয়—সেখানেও ব্যাধের দল তোমার মেয়ে শিকার করবার জন্যে বনের আশে পাশে ঘুরে বেড়িয়েছে—অনেক দিন ধরেই—তাদের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে উঁচু গলায় কথা কইতে পারা যায় নি, রাত্তিরে আলো জেলে সেটাকে অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে চলাফেরা করতে হয়েছে। সেই বনে

থাকতে থাকতে তোমার বেটাছেলেদের পুজো করার রূপও একদিন দেখলাম—জগজ্জননীর পুজো—অত আলো, অত ঘটা—কিন্তু তোমার মেয়ের রূপের কাছে অতগুলো বেটাছেলের চোখে যেন সব মিথ্যে হয়ে গেল। সে রাতেও বিপদ আমাদের কাছে উপকারের বেশ ধরেই এসেছিল দাদু, জানোয়ারের মতনই আমরা বনে পালিয়ে বাঁচলাম। তুমি জান সব কথাই, কিন্তু ভুলেছ আজ অন্ধ উপকারের মোহে পড়ে। তুমি ভুলতে পার দাদু, তোমার মেয়ে বইত নয়, কিন্তু আমার যে মা—পুরুষের শাসন ব্যবস্থা, পুরুষের সমাজ ব্যবস্থা, পুরুষের অত বড়াইয়ের বীরত্ব—পুরুষের শিক্ষা, ধর্ম-ব্যবস্থা—এইসবের মাঝখানে আমার মায়ের এই লজ্জার জীবনের কথা আমি কী করে ভুলি বলো? আজ আর এক উপকার দেখা দিয়েছে—তাকে আমি সন্দেহের চোখে না দেখি তো কে দেখবে দাদু?…আমার মার রূপ গেছে আজ ওদের লালসার নজরে-নজরে পুড়ে কুৎসিত হয়ে, মা আমার পরিত্রাণ পেয়েছে; তেমনি মেয়ে আছে—এইবার আমার পালা—আমি কি সাধ করে জিগ্যেস করলাম দাদু—উপকারটা করছে কেন? মায়ের জ্বালা যে এইবার আমার শরীরে নেমে আসবার পালা। শুধু মা-ই তো নয়, এত অল্প বয়সে আমি আরও অনেককে যে মায়ের মতনই ধ্বংস হয়ে যেতে দেখলাম—আর কিছু নয়, শুধু মেয়েছেলে হয়ে জন্মাবার জন্যে—পুরুষদের খোরাক হয়ে।…তাদের সবার একটিমাত্র দোষ, তারা পুরুষের ঠোঁটের হাসিকে চিনতে পারে নি, সর্বনাশের অভিসন্ধিটাকে উপকারের আগ্রহ বলে ভুল করেছিল।"

জাহ্নবী চুপ করিল। অম্বিকাচরণ একটি কথা বলিল না, শুধু দক্ষিণ হাতটা ধীরে ধীরে জাহ্নবীর পিঠের উপর টানিয়া যাইতে লাগিল। একটু পরে আবার কথা কহিল জাহ্নবীই, বলিল—"দাদু, তোমার মিষ্টি হাত বুলানোয় মনে হচ্ছে—কথাগুলি একদমে বলে যেতে তোমার নাতনির যে মেহনৎটা হ'ল, সেইটেই তোমায় ভাবিয়েছে বেশি। আসল কথাগুলো কিন্তু আমলে আন নি, হয়তো বিশ্বাসই করলে না।"

বৃদ্ধের হাতের টানগুলো একটু দ্রুত হইয়া গেল, অধরের কোণে সেই দুর্বল, অপ্রতিভ হাসিটা উঠিল জাগিয়া, মাথাটা নিচু করিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল—

"এনেছি বৈকি আমলে দিদি, কথাগুলো যে কত সত্যি তা আমার মতন আর কে বুঝবে বল ? তবে, কথা হচ্ছে…"

"হ্যাঁ. বলো না।"

"বলছি, তুই যা বল্লি তুই-ই কি তার সবটুকু বিশ্বাস ক'রে বললি ?"

"অবিশ্বাস থাকলে বলব কেন দাদু ?"

"না…না, এই তোর দাদুও যে তাদের মধ্যে…আর—আর আমার মেয়ে বলেই যে ভুল'তে পেরেছি—তোর মা বলে তুই পারছিস না—করিস এসব কথা বিশ্বাস দিদি ?"

মিনিট খানেক কোন উত্তর জোগাইল না জাহ্নবীর মুখে ; কিন্তু মনের তারটা এমনই চড়া সুরে বাঁধা হইয়া গেছে যে অনুশোচনাও ঠাঁই পাইল না বেশিক্ষণ, বলিল—"সে তো বললাম দাদু—যে…"

"হ্যাঁ, তা বলেছিস—তা বলেছিস, মনেই ছিল না—বললি তো এখন আমি না-বেটা ছেলে, না-মেয়েছেলে—শুধু একটা কিছু হয়ে রয়েছি…ঠিক…"

"দাদু, যেটা ধরবার নয় সেইটাই ধরে ব'সে রইলে এত কথার মধ্যে ?—কথা-গুলায় যেমন ক্লেশ আছে, তেমনই একটু যেন বিরক্তিও আছে।

অম্বিকাচরণ বলিল—"না, না, রাগ করিস নি।…রাগের জন্যে বলিনি, আজকাল কেমন হ'য়েছে গুছিয়ে বলতে পারি না।…বলছিলাম—সবই হয়তো একরকম নয়…ওই ব্রজলাল ছেলেটির কথাই ধরি—আমার কেমন মনে হয় ভগবান বাইরেটা দেখা বন্ধ ক'রে দিয়ে আমায় একেবারে ভেতরটা দেখবার…

"ওঠ, দাদু, সন্ধ্যে হয়ে এসেছে।" বলার সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া পড়িয়া দক্ষিণ হাতটা ধরিল জাহ্নবী ; পাও বাড়াইল।

চৌকাঠ পার হইতে হইতে নিতান্ত যেন মন রাখিবার জন্যই অম্বিকাচরণ একবার বলিল—"গেলেই হয় ছেড়ে এ-বাড়ি—দিদি উঠুন সেরে একটু—সত্যি, কার মনে যে কি গলদ আছে…"

এই ভাবেই চলিল। দিদিও ভালো হইয়া উঠিল না, বাড়ি ছাড়াও হইল না; দুঃস্থ, নিঃসম্বল পরিবারটি দিন দিনই যেমন অধিকতর নিশ্চেষ্ট হইয়া ব্রজলালের আশ্রয়ে গিয়া পড়িল, তেমনি আবার ধীরে ধীরে তাহাকেও নিজেদের মধ্যে আত্মসাৎ করিয়া লইতে লাগিল—প্রীতিতে, কৃতজ্ঞতায়, এমনকি আশা আর স্বপ্নেও।

অবশ্য জাহ্নবী ছাড়া, যাহাকে লইয়া স্বপ্ন। তাহার ঘৃণার মধ্যে এতটুকু নাটকীয়তা কোন কালেই ছিল না, তাহার উপর যাহাকে ঘৃণা, তাহার কাছ থেকেই এই প্রতিদিনের পরাজয়, সে যেন নিজের আগুনে নিজেই দগ্ধ হইতে লাগিল। মুখের কথা হইয়াছে—"দেবে না তো কি, করবে না তো কি—বাড়ির ভাড়া যখন দিচ্ছে না।..."এ যেন ওর মস্ত বড় একটা আবিষ্কার, মনে করে হয়তো চেষ্টা করিয়া এখন ষোল আনা বিশ্বাস করে কথাটা, তবুও এধরণের নেওয়ার মধ্যে কোথায় যে একটা আত্ম-প্রবঞ্চনা আছে, সেটা ওর মনে খচ্ খচ্ করে; এক শুধু ওকেই নিশ্চেষ্ট থাকিতে দেয় না।

নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়াটা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, যদিও স্পষ্ট কথা-বার্তার ভাগটা ক্রমেই আসিতেছে কমিয়া। মেয়েকে যে শোধরানো যাইবে না এটা ওরা ধরিয়াই লইয়াছে, আর এই ধরিয়া লওয়ার মধ্যে মায়ের মনে আসিয়াছে একটা বিরাগ, দিদিমার মনে ঔদাসীন্য, শুধু দাদুর মনে আছে একটা স্নেহমিশ্রিত আতঙ্ক, একটা নিরুপায় ব্যাকুলতা।

এই বোঝাপড়া আরও একটু স্পষ্ট হইল। একদিন সন্ধ্যার একটু আগে নারায়ণী দেখিল মেয়ে কাপড়টা একটু গুছাইয়া পরিয়া পায়ে জুতা আঁটিতেছে। বেশ একটু বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন করিল—"কোথায় বেরুচ্ছিস মনে হচ্ছে?"

জাহ্নবী উত্তর করিল—"একটু ঘুরে আসি।"

"অবাক করলি! ঘোরবার জায়গা বড়!"

"এদিকটা আর তেমন কি? ভদ্রলোকের বাস বেড়েছে।"

নারায়ণী ব্যঙ্গের স্বরেই বলিল—"কিন্তু দরকারটা কি ঘোরবার এই অবান্ধব জায়গায়? চাকরি তো···"

"পেলে কোরব বইকি মা, তুমি তো জানই সেটা।"

পাশে অন্নদাঠাকরুণের ঘরে গলা বাড়াইয়া বলিল—"দিদিমা, একটু ঘুরে আসি কাছাকছি থেকে; এক্ষুণি আসছি; দাদু, আসি।"

বাহির হইয়া গেলে নারায়ণী বলিল—"দেখলে তো পিসিমা?"

অন্নদাঠাকরুণ উত্তর করিল—"আমায় আর কি বলছিস?—বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া হয়ে বসে রয়েছি, নইলে সোমত্থ মেয়ের এত বাড়!"

পাশ ফিরিয়া শুইয়া রহিল। অম্বিকাচরণ কিছু বলিতে সাহস করিল না, গোটা দুই চাপা কাশিতে শুধু যা একটু প্রকাশ পাইল।

চাকরির জন্যই বাহির হওয়া জাহ্নবীর। লোক বাড়িয়াছে জায়গাটায়, যতদূর শোনা, সব কলিকাতার দিকেরই, যদি ছোট ছেলেমেয়ে পড়াইবার টুইশান পায়। বাহির হইয়া একেবারে উত্তর দিকে পা বাড়াইল, দক্ষিণ দিকটা ব্রজলালের আস্তানা বলিয়া যেমন এ পর্যন্ত কখনও যায় নাই, আজও গেল না। কিন্তু যাহা ভাবিয়া বাহির হওয়া সেটা সম্ভব হইল না, রাস্তাতেই পা জড়াইয়া যাইতে লাগিল, বাড়ি বাড়ি জিজ্ঞাসাবাদ করা তো একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। একটু যে ঘুরিয়া বেড়াইল সে যেন নিজের জড়তার সঙ্গে লড়াই করিয়াই, তাহার পর সন্ধ্যার আগেই বাড়ি ফিরিল।

কিন্তু ছাড়িল না, দু'একদিন বাদ দিয়া দিয়া ক্রমে এটা একটা রুটিনে দাঁড় করাইল। তাহার পর হঠাৎ একদিন চাকরিও জুটিয়া গেল।

সেদিন বেড়াইতে বেড়াইতে স্টেশন পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছিল, ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। স্টেশন থেকে কিছু দক্ষিণ-পশ্চিমে সেই পুরাতন জঙ্গলে একটা অংশ এখনও দাঁড়াইয়া আছে, বেশ নির্জন এখানটা; এটা পার হইয়া অল্প অল্প করিয়া নূতন পল্লীটা আরম্ভ হইয়াছে, জাহ্নবী এইখানে আসিয়া বড় রাস্তাটা

ছাড়িয়া দিয়া ভেতরের দিকে প্রবেশ করিল, বড় রাস্তায় খাকী পোষাকের প্রাদুর্ভাব একটু বেশি। একটু যাইতেই দেখে প্রায় আধ বুড়ো গোছের একটা চাকর একটা বছর আটেকের মেয়ের হাত ধরিয়া এদিক ওদিক চাহিতেছে। একটু অস্বাভাবিক মনে হওয়ায় গিয়া প্রশ্ন করিল—"কি চাও গা তুমি?"—

"দিদিমণিকে নিয়ে বাসায় যাব।"

"তা যাচ্ছ না কেন?"

সন্ধ্যের পর ভালো দেখতে পাইনে, আর নোতুন এলুম কিনা, আজই কাজ নিলুম যে।"

"কোথায় বাসা? কার বাসা?"

"হুই ঐদিকে।"—দক্ষিণদিকে আঙুল দেখাইল।

"কার বাসা?"

চাকরটা নাম জানে না, মাথা চুলকাইতে লাগিল।

"কে তোমার বাবা খুকু?"

খুকি নামটা বলিতে বাড়িটা চিনিল। জাহ্নবীদের বাড়ির ওদিকেই, তবে খুব কাছেও নয়, খুব দুরেও নয়; একটা ছোট নূতন বাড়ি, গেটওলা, পেতলের ফলকে নামটা লেখা আছে, ডাক্তার একজন।

লোকটাকে বলিল—"এস আমার সঙ্গে।"

মেয়েটির হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল।

বাসা থেকে খানিকটা এদিকেই দেখা হইল ভদ্রলোকের সঙ্গে, বিলম্ব দেখিয়া খোঁজে বাহির হইয়াছে।

বয়স প্রায় ষাট, নিজে বলিলও, লাঠির সহযোগে চলার ভঙ্গিতেও বোঝা গেল। ছাড়িল না জাহ্নবীকে, বাসায় লইয়া গেল। নিজে সঙ্গে করিয়া দিয়া আসিবে।

বাড়িতে পরিবারের মধ্যে আর শুধু স্ত্রী; বয়স দেখিয়া বোঝা গেল দ্বিতীয় পক্ষের, তবে কর্তার তুলনায় স্বাস্থ্য আরও খারাপ; একরকম চিররুগ্নই মনে হইল।

এইখানেই চাকরি হইল জাহ্নবীর। মেয়েটিকে বিকাল বেলা পড়াইবে, তাহার পর চাকর সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে লইয়া যাইবে। মাহিনা ভালোই, পঞ্চাশ টাকা।

কি ভাবিয়া জাহ্নবী নিজের সঠিক পরিচয় দিল না, বাড়ির প্রকৃত ঠিকানাও নয়। সঙ্গেও আসিতে দিল না ভদ্রলোককে ; তিনি কোমর বাঁকাইয়া লাঠির ভরে নামিবার পূর্বেই তাঁহাকে না নামিবার জন্য মিনতি করিতে করিতে লঘু পদে বাহির হইয়া গেল।

প্রথম চাকরিতেই সাক্ষাৎভাবে জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা অর্জন হইল, দিন দশেকের ভিতরেই, ঐ জীর্ণ বৃদ্ধের কাছেই। চাকরি ছাড়িয়া দিল জাহ্নবী।

কিন্তু একটা কাজ হইল, আর তাহার গুরুত্ব জাহ্নবীর জীবনে খুব বেশি। আর একটা বড় দিক-পরিবর্তন হইল।

ভদ্রলোকের স্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজটা আসিত। জাহ্নবীও পড়িত, তবে খবরের চেয়ে বিজ্ঞাপনের দিকেই ঝোঁকটা থাকিত বেশি। এই কয়দিনেই সাত-আট জায়গায় দরখাস্ত করিয়া দিয়াছিল, তাহার মধ্যে বেশির ভাগই ছিল পোস্ট বক্সের ঠিকানা, যাহাতে বিজ্ঞাপনদাতার নিজের নাম ঠিকানার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকে না।

চাকরি ছাড়ার সপ্তাহখানেক পরের কথা, একদিন ব্রজলালের চাপরাশি গোছের যে লোকটা আছে, সে একখানি খামে ভরা চিঠি আনিয়া জাহ্নবীর হাতে দিল, বলিল ডাকে আসিয়াছে! এবাড়িতে এই প্রথম চিঠি, অন্নদাঠাকরুণ প্রশ্ন করিল—"চিঠি কোথা থেকে এল ?"

নারায়ণী ভিতরে ভিতরে আঁৎকাইয়া উঠিয়াছিল, তবু সামলাইয়া লইবার জন্য বলিল—"তোর স্কুলের নয়তো জানু ?"

জাহ্নবীর মুখের ভাবটা অদ্ভুত। খামটা উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিল, পোস্ট অফিসের ছাপ রহিয়াছে, কিন্তু শুধু এখানকারই পোস্ট অফিসের। ছিঁড়িয়া ভিতরের চিঠিটা পড়িতে পড়িতেও তাহার মুখে অনেকগুলা বিভিন্ন ভাবের আলোছায়া খেলিয়া গেল। সেটা কিন্তু ঠিক করিয়া লইয়া মুখ তুলিয়া

বলিল—"কি বললে মা?···ও,··· হ্যাঁ স্কুলেরই চিঠি, একটি বন্ধু মেয়ে দিয়েছে।"

মিথ্যা বলিল। চাকরির চিঠি; একেবারে নিয়োগপত্র নয়, দেখা করিতে বলিয়াছে। আর একটা ব্যাপার যাহা জাহ্নবীকে বিশেষভাবে পুলকিত করিল, তাহা এই যে, চাকরিটা এই নূতন কলোনিতেই কোথাও। জায়গাটা এক হিসাবে অর্ধ-সামরিক, (যদিও সামরিক, কর্তৃপক্ষের নিষেধেই গোরা বা দেশী সৈন্য এদিকটা একেবারেই মাড়ায় না) তাই রাস্তাগুলার নম্বর দেওয়া। চিঠির ঠিকানায় রহিয়াছে কলোনি আর রেল স্টেশনের নামে, সতেরো নম্বর রাস্তা, বাড়ি বা আফিসের একটা নাম দেওয়া আছে 'ভিকট্রি লজ' পাশে বন্ধনীর মধ্যে 'মিলিটারী কন্ট্রাক্‌টারস্'···এ-সব ভালো ব্যাঙ্ক কাগজের চিঠির শীর্ষে পরিষ্কার ভাবে ছাপা, চিঠির একেবারে ওপরে পলতোলা অক্ষরে রাঙা কালিতে একটি ইংরাজী V—অক্ষর বসানো। একটা জায়গায় একটু আটকাইল, চিঠির নিচে স্বাক্ষরটায়; পুরা নাম নয়, প্রথম অক্ষরটা P বা B বা D—যে কোন একটা হইতে পারে, দ্বিতীয়টারও প্রায় সেই অবস্থা; পদবীটাও ব্যানার্জি, মুখার্জি, চ্যাটার্জির যে কোন একটা মনে করিয়া লওয়া যায়। খুবই খারাপ হাতের লেখা। চিঠিটা টাইপ করা, শুধু শেষের একটা পংক্তি হাতে লেখা, সেটাও কতকটা আন্দাজে পড়িতে হইল।

বার দুয়েক পড়িয়া চোখ তুলিতে দেখে নারায়ণী চোখের কোণে চাহিয়া আছে। সেই আংশিক দৃষ্টির মধ্যেই অনেকখানি উৎকণ্ঠা, চোখাচোখি হইতেই শোধরাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া বলিল— "তোর সেই অণিমা মাসির কোন খবর আছে?—যার কথা এত বলিস···"

"না, কিছুই লেখেনি তো"—বলিয়া জাহ্নবী পাশের ঘরে চলিয়া গেল, একটু পরেই গিয়া পুকুরের ধারে শানের বেঞ্চিতে বসিল।

স্বাধীন জীবনের প্রথম সাফল্য, অন্তত সাফল্যের সূত্রপাত। ভিতরে ভিতরে প্রথমটা খুব পুলকিত হইলেও, স্থিরভাবে চিন্তা করার পর দেখা গেল, দুশ্চিন্তা ও নৈরাশ্যের কারণও যথেষ্ট আছে।—সামরিক ব্যাপারই নয়তো সমস্তটাই? একেবারে এতটা সাহস করা ঠিক হইবে কি?

কার্শিয়াঙে থাকিতেই 'ওয়াকাই' (W.A.C.I) নামক মেয়ে বাহিনীর সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনিয়াছিল, তা ভিন্ন একবার পা বাড়াইলে ফেরা যাইবে কি ? সামরিক আইনও নাকি বড় হৃদয়হীন।...যদি কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানই হয়—বাঙ্গালীর, না পাঞ্জাবীর, না অন্য কোন জাতের ? সব ব্যবসায় তো বাইরের লোকের হাতে শোনা যায়।

মনটা ক্রমেই ম্লান হইয়া আসিতেছে, আনন্দের সূচনাতেই অকারণে যেন কান্না ঠেলিয়া আসিতেছে, কর্মের আহ্বানেই কেমন একটা অহেতুক ক্লান্তি। মালতী ফুল পড়িয়া আছে শানের ওপর, ঘাটের কাণায়—আরও ঝরিয়া পড়িতেছে, এক মুঠো কুড়াইয়া লইয়া জাহ্নবী খেলার ছলে লুফিতে লাগিল, তাহার পর কি মনে হওয়ায় স্থির দৃষ্টিতে সেগুলার দিকে চাহিয়া রহিল : চোখ দুইটা ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিয়াছে—এই রকম ঝরিয়া পড়াই কি ফুলের অমোঘ পরিণতি ?

কিন্তু ভাবের বিলাসে ফুটিবার মতো অবস্থা জীবনে পায় নাই জাহ্নবী, এ দুর্বলতাটুকু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাটাইয়া উঠিল। বিকাল হইয়া আসিতেছে, অফিস বন্ধ হইয়া যাইবে ; যে-লক্ষ্মী নিজে হাঁটিয়া ঘরের দুয়ারে আসিয়াছেন, তিনি ফিরিয়া যাইতে পারেন।

জাহ্নবী উঠিল, কি ভাবিয়া, অথবা জোর করিয়াই বেশি কিছু না ভাবিয়া অপেক্ষাকৃত একটা ভালো শাড়িই পরিল, তাহার পর রোজ যেমন একবার সবাইকে মুখের কথা বলে সেইভাবে বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

অভ্যাস হইয়া গেলেও ও বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে দু একটা মন্তব্য খসেই তিনজনের মুখ থেকে, আজ কিন্তু কেহই কিছু বলিল না। বলার সব কিছু যেন শেষ হইয়া গিয়াছে। একটি মৌন দুশ্চিন্তা ঘরের মধ্যে থম্‌থম্‌ করিতে লাগিল।

বাড়ির উত্তর দিকটায় গেল প্রথমটা, ভগবান এমন করেন যে ঐ দিকটাতেই থাকে অফিসটা ! এমন কিছু বড় জায়গা নয়, তবুও অনেকখানি সময় লাগিল, কিন্তু সত্তেরো নম্বর রাস্তা নাই এদিকে। ঠিকাদারদের কারখানা গোটা দুই মিস্ত্রিল, কিন্তু সেগুলা 'ভিক্‌ট্রি লজ' নয়।

দিন গড়াইয়া চলিয়াছে, সন্ধ্যা আসিয়া পড়িবে ; আর অত সঙ্কোচ ভয় করিয়া ফল কি ?

উত্তরের দিকটা ছাড়িয়া দক্ষিণমুখী হইল। জিদ চাপিয়া যাইতেছে, অদৃশ্য কাহার চ্যালেঞ্জটা যেন সদর্পে হাত পাতিয়া লইয়াছে জাহ্নবী। রাস্তার নম্বর আছে কিন্তু বড় গোলমেলে—হয়তো নিজের মনের অবস্থার জন্যই গোলমালটা বাড়িয়া যাইতেছে—সাত নম্বরের রাস্তাটা দশ নম্বরের মধ্যে কোথায় কি করিয়া মিলাইয়া গেছে ; তের নম্বরের পরেরটা চৌদ্দ নম্বর নয়, কোথা হইতে কি করিয়া একুশ আসিয়া সেটাকে স্থানচ্যুত করিয়াছে। শুনিয়াছে মিলিটারিতে সবই গোলমাল করিয়া রাখিতে চায়, এও তাই নাকি ? আর সব চেয়ে দুর্লভ হইতে হয় কি সতেরো নম্বরটাই ?

ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। জুতার অভ্যাস নাই ততটা, আর সেই প্রায় বছর খানেক আগেকার জুতাই তো—কয়েক স্থানে পা কাটিয়া গেছে। কিন্তু খোঁড়াইয়া কাটা পা কে একটু স্বস্তি দিবার উপায় নাই।

চলিতে যে পারিতেছে জাহ্নবী সে শুধু জিদের ওপর। দরকার হয় সেনা-ছাউনির দিকেও যাইবে।—হয়তো সতেরো নম্বর ঐ দিকেই আছে, আজ চরমই হইয়া যাক।

ঊনত্রিংশ

বড় রাস্তা থেকে পশ্চিমে একেবারে শেষের দিকের রাস্তাটা সতেরো নম্বর। হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল জাহ্নবী। এদিকটা বসতিও পাতলা ; এর একটু পরেই উত্তর-পশ্চিম ঘেঁষিয়া মাঠ আর জঙ্গল। যেমন মনে হইল এই রাস্তাটাই বোধ হয় নূতন কলোনিটার সীমান্ত-পথ, জায়গাটাকে বেষ্টন করিয়া গেছে। একটা দিক ছাউনির পানে চলিয়া গেছে, একটা দিক উত্তরে অর্থাৎ জাহ্নবীদের বাড়ির পানে। কোনদিকে যাইবে ? উত্তরেই চলিল জাহ্নবী ; সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব নাই, 'ভিক্‌টি্‌লজ' এদিকে না পায়, কাল তখন ছাউনির কাছাকাছি দেখিবে।

অনেকটা হাঁটিতে হইল, বেশ ভালো করিয়া দেখিয়া দেখিয়া চলিতে হইতেছে। গোটাতিনেক ঠিকাদার কারখানাও আছে—হয়তো অসামরিক, কেন না প্রাইভেট বাড়িও তুলিতেছে অনেকে। সন্ধ্যা নামিল, এখন খোঁজার উৎসাহ নাই আর, বাড়ি পৌঁছিলে বাঁচে! এমন সময় রাস্তাটা উত্তর থেকে পূর্বে ঘুরিয়া একটু অগ্রসর হইতে এত তপস্যার 'ভিক্‌ট্রি লজ' দেখা দিল। নূতন দোতালা বাড়ি, দেয়াল দিয়ে ঘেরা বড় হাতার মধ্যে; একদিকে বাগান, একদিকে ঠিকাদারির মালপত্র; গেটের থামে শ্বেত পাথরের ফলকে ইংরাজীতে লেখা আছে 'ভিক্‌ট্রিলজ'; বাড়ির মাথায়ও লোহার বা কাঠের একটা লাল রঙের 'V'। লোকটা ধূর্ত আছে—ইংরাজের হইয়া লড়াইয়ের জন্য তুকতাক করিতেছে—আজকাল এ অক্ষরটার চারিদিকেই ছড়াছড়ি। এত দুঃখের মধ্যেও একটু হাসি ফুটিল জাহ্নবীর ঠোঁটে।

যাক্‌, অন্ততঃ বাড়িটা দেখা রহিল। আর মনে হয় তাহাদের বাড়ির খুবই কাছে; কাল আসিয়া দেখা করিবে।

দুই-পা অগ্রসর হইয়া খেয়াল হইল খোঁজটা যদি লইয়া যায় ক্ষতি কি? এখনও সন্ধ্যার আলো জ্বলে নাই। বাড়ির কাছে আসিয়া পড়ায় সাহসও বাড়িয়াছে একটু, তাহা ছাড়া, লোকজনও আছে মন্দ নয়; আর ইতস্তত না করিয়া গেটের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল, জুতায় ক্ষতবিক্ষত পা দুইটাকে আরও নির্যাতিত করিয়া গট্ গট্ করিয়া গিয়া বাড়ির বারান্দায় উঠিল, একটা লোককে প্রশ্ন করিল—"সাহেব বাড়ি আছেন?"

"হ্যাঁ, চা খাচ্ছেন, আপনি বসুন এসে।"—পাশের একটা ঘরের পর্দা তুলিয়া ধরিল। জাহ্নবী দুইপা আগাইয়া গেল, তাহার পর বলিল—"থাক, বাইরেই বসছি।"

একটা কৌচে বসিয়া পড়িল। লোকটা বলিল—"খবর দেব?"

"দেবে?...তা দাও, তবে তাড়া নেই এমন।"

খবর পাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যে-লোকটা পর্দা ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল সে ব্রজলাল। জাহ্নবী নমস্কারের জন্য হাত তুলিয়াই

উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল ; সেটা কোনরকমে সারিয়া লইল, কিন্তু মিনিট খানেক তাহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না। তাহার পর শুষ্ক কণ্ঠে বলিল—"আপনিই! ...তা আগে বলেন নি কেন?"

ব্রজলাল ঠিক অতটা বিস্মিত নয়, তবে একটু অপ্রতিভ, বলিল—"দরখাস্তটা যে আপনারই তা কি আন্দাজ করতে পেরেছিলাম?"

"আমার ঠিকানায় 'কেয়ার অব্' ক'রে আপনার নামটাই দেওয়া ছিল, কেন না আমাদের তো কেউ এখানে চেনে না ; অবশ্য 'কনট্রাকটার' কথাটা ছিল না।"

"বসুন।"

নিজেও একটা চেয়ারে বসিল, বলিল—"ব্রজ বসু তো আরও অনেকে থাকতে পারে ;—নামটা অসাধারণ নয়...তবু আমার একটু খটকা লেগেছিল, কিন্তু আপনার দরখাস্ত দেওয়া এতই অসম্ভব বলে মনে হ'ল, ঠিক করলাম ও আমি নই, অন্য কোন ব্রজলাল ব্যানার্জি, চিঠিটা ডাকে ফেলে দিলাম।"

"যখন দেখলেন চিঠিটা আপনার হাতেই আবার ফিরে এল...থাকগে ওসব কথা, ইন্টারভিউএ ডেকেছেন, আমায় দিয়ে আপনার কাজ হবে?"

অপ্রতিভ ভাবটা এখনও কাটে নাই ব্রজলালের, আগের কথার জের ধরিয়াই বলিল—"আপনি বড় ঘুরেছেন মনে হচ্ছে, অনেকক্ষণ আগে একবার ও-বাড়ি গিয়েছিলাম, শুনলাম বেরিয়েছেন।"

"হ্যাঁ, হ'ল ঘুরতে একটু। জায়গাটা জানা তো ছিল না।"

"সে কি! এখানে আসবার জন্যেই ঘুরেছেন?"

"হ্যাঁ, কক্ষণও আসবার ইচ্ছে হয় নি, বাড়ির এদিকটা তাই একেবারেই জানতাম না ; নতুন বাড়ির মতোই অচেনা।"

তাহার পর বেশ একটু ব্যঙ্গের সহিতই বলিল—"এখনও বিশ্বাস করা শক্ত যে একটা বাড়িরই এক পিঠে ধ্বংস, এক পিঠে 'ভিক্‌ট্রি'। ...যাক ওসব, যা বলছিলাম, আমায় দিয়ে আপনার কাজ হবে?"

ব্রজলাল ব্যঙ্গটা গায়ে না মাখিয়া এবারেও পূর্বের কথার জের ধরিয়া অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল—"মোস্ট্ আনফরচুনেট্! আমায় মাফ করবেন।"

মুহূর্ত কয়েক চুপ করিয়া বলিল—"কাজের কথা—আপনি তো জানেন কি কাজ আমার।"

"তাহ'লে ডাকাই ভুল হয়েছিল, আমি শর্টহ্যাণ্ডও জানি না, টাইপিংও জানি না। বিজ্‌নেস্ করস্‌পণ্ডেস্ সম্বন্ধে মাত্র একটু ধারণা আছে—একটা বই পড়তাম হাতের কাছে পেয়ে—বেশ ভালো লাগত।"

"কতদূর পড়েছেন ?···মানে ইংরিজীটা ?"

"খুব মন্দ জানা নেই ; জুনিয়ার কেম্ব্রিজ পড়ছিলাম।"

"কোথায় ?"—বেশ বিস্মিতভাবেই চাহিল ব্রজলাল।

"সে-খবরটা কি দরকারী ?"

এই আঘাতটুকুতেই ব্রজলাল একেবারে রুক্ষ কাজের কথায় আসিয়া গেল, বলিল—"না, তেমন আর কি ?···কথাটা হচ্ছে, কাজটা কি আপনি চান ?"

"চাই বলেই যদি দিতে যান তো, চাই না ; মানে, অনুগ্রহের কথা নেই এতে। যদি কাজ চলবে মনে করেন তা'হলেই রাখুন ! দরকার আমাদের যে আছে সেটা তো জানেনই।"

ব্রজলালও খোঁচা দিবার সুযোগটা ছাড়িল না, বলিল—"দরকার যখন আছে, থাকুন। কাজ আমার চলতে পারে—চলবে। শর্টহ্যাণ্ড জানা যে চাই এমন নয়, তাড়াতাড়ি ডিকটেশন নিতে পারলেই চলবে ; টাইপিং-ও অভ্যেস হ'য়ে যাবে। ততদিন হাতের লেখাতেই চলবে।"

একটু চুপচাপ গেল ! তাহার পর কথাবার্তাকে চালু করিবার জন্য জাহ্নবী জিজ্ঞাসা করিল—"তাহ'লে ?···"

ব্রজলাল হঠাৎ খুব অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে, একটা কথা বলা ঠিক হইবে কি না বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না, শেষে একটু ঘুরাইয়া বলিয়াই দিল—"একটা প্রশ্ন আপনিই করবেন ভেবেছিলাম—আমি বেটাছেলে না নিয়ে লেডি-ক্লার্ক নিচ্ছি কেন। বিজ্ঞাপনে তো সেরকম কিছু উল্লেখ ছিল না, অনেক বেটাছেলে দরখাস্তও করেছে···"

একজন যে এ-প্রশ্নটা করিতে পারে এই বিস্ময়েই জাহ্নবী বিমূঢ়ভাবে ব্রজলালের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।—সে-ই বলিয়া চলিল—মুখটা কঠিন—

তবে কঠোর বা নিষ্ঠুর নয় ; যেন নির্জলা ব্যবসায়ের কথা—বিজ্‌নেস্—টাকা-আনা-পাই—ভাবুকতার ভয়ে লুকানো বা এড়ানো চলে না ; তবু সাধ্যমতো পর্দা রাখিয়াই বলিল—"দেখলাম এতে আমার বিজ্‌নেসের দিক থেকে ভালো···. মেয়ে-ক্লার্কে আফিসের একটু শ্রী আসে···সব আফিসেই একটা স্টাইল আজকাল।"

নির্বিকারভাবে মুখের পানে চাহিয়া রহিল যেন কোন মারোয়াড়ী পার্টির সঙ্গেই কোন সর্ত ঠিক করিতেছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অনেকরকম আবেগই জাহ্নবীর মনে উঠিয়া মিলাইয়া গেল, মুখটা কয়েকবার রাঙা হইয়া উঠিয়া আবার রক্তহীন হইয়া গেল, তাহার পর আবার ধীরে ধীরে সহজ ভাবটা ফিরিয়া আসিল, যেন ঠিক করিয়া লইয়াছে এ যা' জীবন, এতে অত স্পর্শকাতর হইলে চলিবে না। বেশ সহজভাবেই বলিল—"ওটা আপনার বিজ্‌নেস্ পলিসির কথা, ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমায় না জানালেও চলত।"

"অ্যাকাউন্টেন্ট বাবু আছেন, আরও দু'জন কেরানি, তবে এটা হ'ল পার্সনাল এ্যাসিস্‌টেন্টের কাজ আর কি। হয়তো আমি নেই, কেউ এল—হয়তো কোন সাহেবই, মিলিটারিও হোতে পারে—আপনাকেই কথাবার্তা কইতে হবে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করতে হবে···"

"খুব শক্ত হবে না ; এরকম চান্স্ তো হবেও কম ?"

ব্রজলাল বেশ একটু নরম হইয়া গেল, বলিল—"চান্স্ নাও হতে পারে, সেই চেষ্টাই থাকবে আমার, তবুও বলে রাখলাম।"

"ধন্যবাদ। তবে একটা কথা, বাইরে যেতে হবে না আমায় ?"

আরও নরম হইয়া গেল ব্রজলাল, যেন কঠিন কথাগুলা বলার শক্তি সঞ্চয়ের জন্যই কঠিন হওয়া দরকার ছিল এতক্ষণ ; বলিল—"সেটা কি আমিই হোতে দোব জাহ্নবী দেবী ? বিজ্‌নেস্ উঠিয়ে দিতে হ'লেও তা হবে না।"

"ধন্যবাদ। মাইনে ?"

"একশ' পঁচিশ থেকে দেড়শ রেখেছি বিজ্ঞাপনে, দেড়শ'ই দোব আপনাকে।"

একটু ভাবিল জাহ্নবী, তাহার পর বলিল "এখন যা অবস্থা তাতে আমার কাজের মূল্য একশ' পঁচিশও হোতে পারে না, আপনি একশ'ই দেবেন।"

—দুইটা কাজ হইল, একটা যে ভাবালুতা ব্রজলালের মধ্যে ঠেলিয়া উঠিতেছিল তাহার মুখে থাবা দেওয়াও হইল, আর দুজনের মধ্যে একটা স্পষ্ট সীমা নির্দেশও করা হইল। ব্রজলাল আবার গোড়ার দিকের মতো একটু অপ্রতিভ হইয়া গেল।

জাহ্নবী উঠিয়া দাঁড়াইল। করজোড়ে বলিল—"নমস্কার। তাহ'লে কাল থেকেই আসবো তো?"

"নমস্কার। হ্যাঁ, কাল থেকেই বৈকি।...ওদিক দিয়ে ঘুরে কেন?—এই ঘরের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যান না।"

"কি এমন দরকার?"—বলিয়া জাহ্নবী বারান্দার সিঁড়িতে পা নামাইল; তাহার পর আরও দুইটা ধাপ নামিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"হ্যাঁ, ভুলেই যাচ্ছিলাম, একটা বিশেষ অনুরোধ আমার,—আমি যে আপনার এখানে চাকরি করছি, বাড়ির কেউ জানবেন না।"

ত্রিশ

নিয়োগ করিয়া লইবার পর লেডি ক্লার্ককে দিয়া অফিসের শ্রী ফুটাইবার কিন্তু কোন তাগিদ দেখা গেল না ব্রজলালের। দোতলার ঘরগুলি উঠিয়াছে মাত্র, ইতিমধ্যে ছুতার-মিস্ত্রিদের অন্য দিকে কাজ পড়িয়া যাওয়ায় দোর-জানালা বসে নাই; ব্রজলাল তাড়াতাড়ি একটা ঘর ঠিক করাইয়া লইয়া তাহাতেই জাহ্নবীর জায়গা করিয়া দিল।

আসল অফিসটা নিচে, বাড়ি থেকে আলাদা একটা লম্বা টানা হলঘর, তাহার একদিকে কাঠের পার্টিশন-দেওয়া একটি প্রকোষ্ঠে ব্রজলাল নিজে বসে, সাহেব সুবো আসিলে বসায়, বাকিটার মাঝখানে ছোটখাট অপেক্ষাকৃত দামী জিনিসের গুদাম, একেবারে শেষ দিকটায় থাকে একাউন্টেন্ট মজুমদার মশাই আর তাহার সহকারী; মজুমদার প্রৌঢ়, মোটা, যেমন শরীরে তেমনি পোষাকে জবরজং গোছের; তবে কাজে বিচক্ষণ বলিয়া ব্রজলাল

তাহাকে এবং তাহার চারিদিকের অপরিচ্ছন্নতাকে বরদাস্ত করিয়া আসিতেছে, মেয়ে-কেরানি অধিষ্ঠিত করিয়া সংস্কারের কোন চেষ্টা করিল না।

শুধু তাহাই নয়, জাহ্নবীর নিচে নামিবার প্রয়োজনীয়তাই কমাইয়া দিল অনেক। বারো-তেরো বছরের একটি আফিস-বয় নিয়োজিত করিল, নামটা উদ্ধব। ডিক্‌টেশন দিবার সময় শুধু জাহ্নবীকে নিচে ডাকে, যতটা সম্ভব একেবারেই সব চিঠি লিখাইয়া লয়, সেগুলো পরিষ্কার করিয়া লেখা হইলে তাহার দস্তখতের জন্ত ছেলেটাই ওপর হইতে লইয়া আসে। কয়েক দিন গেল, কিন্তু জাহ্নবী এমন একদিনও দেখিল না যে, ব্রজলালের কামরায় লোক রহিয়াছে অথচ তাহাকে ডাকা হইয়াছে। একদিন এমন পর্যন্ত দেখা গেল, আরদালি একটা কার্ড আনিয়া হাতে দিলে ব্রজলাল একটু ইতস্তত করিয়া নিজেই উঠিয়া গেল এবং নিজের বসিবার ঘরে লইয়া গিয়া লোক-টার সঙ্গে কথাবার্তা কহিয়া আসিল। ওর পর্দা ঠেলিয়া যাওয়ার ফাঁকে জাহ্নবী দেখিল লোকটা সামরিক অফিসার একজন, ইংরাজ কি দেশী ঠিক বুঝিতে পারিল না।

কৃতজ্ঞ হইবারই কথা, কিন্তু এই দিন দশ লইয়া ওর ভেতরে ভেতরে একটা কিছু যে জমা হইতেছিল, সেইটাই যেন ফুটিয়া বাহির হইল এই উপলক্ষ্যটুকু ধরিয়া। ডিক্‌টেশন দিতে দিতে উঠিয়া গিয়াছিল ব্রজলাল, ফিরিয়া আবার আরম্ভ করিতে যাইবে, জাহ্নবী কলমটা খাতার ওপর রাখিয়া দিয়া বলিল—'একটা কথা আমি বলতে চাই।'

মুখটা খুব গম্ভীর ; ব্রজলাল প্রশ্ন করিল, 'কি বলুন ?'

"অ্যাপয়েন্ট্ করবার সময় বলেছিলেন আমায় দিয়ে অফিসের শ্রী ফোটাবেন, তা ঘরই আলাদা করে দিলেন, তাও ওপরে ; বেশি যাতে ওঠা নামা না করতে হয় তার জন্তে বয়টাকে খরচ করে রেখেছেন—খোঁজ নিয়ে জানলাম ও ছিল না আগে ; বলেছিলেন আমি অফিসে এলে আপনার বিজনেস বাড়বে—তার মানেটা নিশ্চয়ই বুঝে বলেছিলেন, কিন্তু দেখলাম আমি রয়েছি বলেই লোকাটাকে আপনি ওদিকে নিয়ে গেলেন,—এ-সব আমি ঠিক বুঝছি না।"

এ কটা দিন বেশ নিরুপদ্রবে কাটিয়াছে, বলিয়াই ব্রজলাল আরও বেশি বিস্মিত হইল, আহতও হইল কম নয়, বলিল—"কেন করছি সেটা সত্যিই আপনি বুঝতে পারছেন না জাহ্নবী দেবী? বলুন।"

জাহ্নবী যেন একটু নরম হইল, আস্তে আস্তে কলমটা তুলিয়া লইয়া বলিল—"লেখান্। আমি বলি চাকরি একটা চুক্তি। চুক্তি মতোনই কাজ হলে আর গোল থাকে না। আপনার ক্ষতিই বা কেন করব, আপনি আমার বেশি ভালোই বা কেন করতে যাবেন?"

কিন্তু এইভাবেই চলিল এর পরেও—ওপরে আফিস, ওঠানামা কম, ডিক্‌টেশন লওয়ার সময় তৃতীয় জনের অসান্নিধ্য। এর যে একটা মন্দ দিক থাকিতে পারে সেটুকুকে মাত্র এইভাবে দুটি কথায় সতর্ক করিয়া দিয়া ভালো দিকটাই লইয়া রহিল জাহ্নবী।

ঘরটি বেশ লাগে। কাজ এমন বেশি কিছু নয়, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে শেষ হইয়া যায়; বাকি সময়টুকু টাইপ করা অভ্যাস করে, ক্লান্তি আসিলে বই পড়ে, বই দেখিয়া দেখিয়া শর্টহ্যাণ্ড শেখে, তাহাতেও ক্লান্তি আসিলে নিজের মনের সঙ্গে কাটায়। একটি আলমারিতে অনেকগুলি বই আছে—আফিস চালানো সংক্রান্ত, নানা জাতীয় চিঠিপত্র লেখা—আফিস থেকে আরম্ভ করিয়া প্রেমপত্র পর্যন্ত; পাঁচ ভল্যুমের একটি ছোটখাট বিশ্বকোষ। মনে হয় ব্রজলাল সমস্ত বই-ই ওপরে রাখাইয়া দিয়াছে, যেটা দরকার হয় বা পড়িবার সখ হয় কাগজের চিরকুটে নাম লিখিয়া ওপর হইতে আনাইয়া লয়; ওটাও যেন জাহ্নবীর কর্তব্যের অঙ্গ একটা। দিন পনেরো পরে আর একটি নূতন আলমারি উঠিল ওপরে, তাহার পর কিছু ভালো ভালো নভেল, নাটক, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী কিনিয়া আসিল, ইংরাজী-বাংলা দুই-ই, যেন হঠাৎ লাইব্রেরীর সখে পাইয়া বসিয়াছে ব্রজলালকে।

জাহ্নবীর মনটা বিদ্বিষ্ট হইয়া ওঠে ভেতরে ভেতরে—এই হীন তোষণনীতি, সূক্ষ্মভাবে উপঢৌকন দেওয়া, পুরুষের হাতের এই সূক্ষ্ম অস্ত্র, বঁড়শির মুখের টোপ—এ সব জাহ্নবী খুব চেনে, অবশ্য পরের অভিজ্ঞতায়, আজ নিজের অভিজ্ঞতায় মিলাইয়া দেখিতেছে। কিন্তু আর বলে না কিছু। বইগুলি

গুছাইয়া নম্বর দিয়া তুলিয়া রাখে, পড়েও কিছু কিছু, তবে বেশি সময়ই লইয়া থাকে টাইপ-করা, তাহার পর কাজের পড়া। একটা রাস্তা পাইয়াছে, সুযোগ একটা, তাড়াতাড়ি যতটা পারে শিখিয়া লইতেছে। তাহার হেতুটা জাহ্নবীর মনে খুবই স্পষ্ট—এখানে বেশি দিন থাকা চলিবে না। এত তোষণের আসল উদ্দেশ্যটা ব্যক্ত হইবার আগেই মানে মানে সরিয়া পড়িতে হইবে।

বাড়িতে জানে সবাই চাকরির কথা, নিয়মিত দশটা থেকে চারিটা পর্যন্ত অনুপস্থিত—লুকাইবার জোও নাই, লুকাইবার কোন রকম ইচ্ছাও নাই জাহ্নবীর। পিসি-ভাইঝি দু'জনের মুখ গম্ভীর, অম্বিকাচরণ একটু একান্তে পাইলে কিছু যেন বলিবার চেষ্টা করে, কিন্তু যথেষ্ট সাহস সংগ্রহ করিতে পারে না বলিয়াই মাঝে মাঝে কাশিয়াই ক্ষান্ত হয়। চাকরিটা যে আসলে কি সেটা অবশ্য বলে নাই জাহ্নবী,—গুটি কয়েক ছোট ছেলেমেয়ে পড়ায় ঘণ্টা দুয়েক করিয়া দুইটি আলাদা আলাদা বাড়িতে, পঞ্চাশ টাকা পাইবে। অন্নদাঠাকরুণ আর নারায়ণী যে পুরোপুরি বিশ্বাস করে নাই সেটা ঠিক। অবিশ্বাস করিবার অবশ্য তেমন কিছু নাই, তবে ওদের মনের ধারণা—এ যা মেয়ে সব পারে। একদিন একটু অসুস্থতার জন্য ঘণ্টা খানেক আগেই ফিরিয়া উঠান হইতে শুনিল অন্নদাঠাকরুণ বেশ রাগিয়া বলিতেছে—"তুমি চুপ করে থাকো অম্বিকে, নাতনির হয়ে ওকালতি করতে এসো না, তোমার আদরেই এইটি হয়েছে।"

একটু পাশে গিয়া দাঁড়াইল জাহ্নবী।

অম্বিকাচরণ বলিল—"না, তা বলছিলাম না, বলছিলাম অন্যত্র আর কোথায় চাকরি করবে?"

"বেশ, ছেলে পড়ানই মানলাম; কিন্তু দেশে এত মাস্টার-মাস্টারনি থাকতে লোকে ঐ সতের বছরের একটা সোমথ মেয়েকে ডেকে যে আদর করে চাকরি দিতে যায়, কেন শুনি?...আমায় বকিও না; উপায় নেই, বিছানায় পড়ে পড়ে দেখে যাচ্চি—দেখতে হবে বলেই বেঁচে আছি, চুপটি করে দেখে যেতে দাও।"

আজকাল অল্পতেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, চুপ করিবার পর একটু সময় দিয়া জাহ্নবী গিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

আর একদিন শুনিল সলা-পরামর্শ; শান্ত কণ্ঠেই, হয়তো তর্কের অংশটা আগে হইয়া গেছে। কানে যাইতে দোরের পাশে দাঁড়াইয়া রহিল জাহ্নবী।

অন্নদাঠাকরুণ বলিতেছে—"হবে না কেন নারাণ?—স্ব-ঘর, টাকা পয়সার অভাব নেই, মেয়ের তোর রূপ আছে, তিনজনে মিলে ধরে পড়লে রাজি হয়ে যেতে পারে।...আর আমার সম্বন্ধে আটকায় না বলে বলছি,—কেন, মেম-সাহেবদের মতন দিগ্বিজয় করে ঘুরে বেড়াচ্ছিস, আজকাল লেখাপড়া জানা ছেলে মেয়ের মধ্যে শুনতে পাই আপনিই লব্ হচ্ছে, আপনিই ব্যবস্থা করে বিয়ে হচ্ছে; তাই না হয় হোক না, এ ধিঙ্গিপনার চেয়ে তো সে ভালো।...হবে! বলে ঝগড়া করেই ফুরসং নেই, দেখা হলেই ফোঁস, দেখা হলেই ফোঁস!"

নারায়ণী বলিল—"আর তাও বলি পিসিমা, ভালো ঐ যতদিন একটিকে না বিয়ে করে ঘরে এনে তুলছে, তারপর এই যে মাথার পর একটি ছাদ আছে, রোদ-বিষ্টি থেকে পরিত্রাণ পাচ্ছি সবাই, সেটুকুও যাবে ঘুচে। ও বুঝবে সে সব?"

জাহ্নবী এ-সব গায়ে মাখে না। এই ধরণের মেয়েদের মধ্যে, বিশেষ করিয়া এই অবস্থার মধ্যে যে এই ধরণেরই আশা-আতঙ্কের কথা হইবে এটা মানিয়া লইয়াছে। ঐ তাহার মা, কী কটু অভিজ্ঞতা তাহার নিজের জীবনে! জাহ্নবী যতদিন থেকে জানে কী অসম্ভব অবস্থার মধ্যে কি কঠোর সঙ্কল্পে নিজেকে বাঁচাইয়া যাইতে হইয়াছে তাহাকে, কিন্তু আজ মেয়ের সামনে যে সেই বিপদই আসিয়া থাকিতে পারে সেটা দেখিতে পায় না কেন?—বিস্মৃতি? লোভ? যুদ্ধে ক্লান্তি?...বিবাহ অবশ্য সে করিবে না, সে বিবাহিত অবিবাহিত জীবন অনেক দেখিয়াছে; এক একবার ইচ্ছা হয় এই রকম আলাপে যোগ দিয়া মাকেই প্রশ্ন করে—বিবাহের পর তাহার স্বামীরও তাহার বাবার মতোই যদি বৈরাগ্যোদয় হয়, তাহার মায়ের মতো তাহাকেও আবার কচি মেয়ের হাত ধরিয়া যদি অকূলে ভাসিতে হয়?—হয়তো আরও খারাপ অবস্থায়?...

না হয় একদিন অম্বিকাচরণকেই বলে—"দাদু, তোমাদের চাঁদে হাত বাড়াবার কথা এক আধদিন কানে গেছে; এক কাজ করো না, তোমাদের ব্রজবাবুকে না হয় বলেই দেখো না।"

পরিণামটা কি রকম হইবে ভালো রকমই জানে জাহ্নবী, একটি উত্তরেই তিনজনের মুখ কালি হইয়া যাইবে। যে-মেয়েকে সামনে আগাইয়া দিয়া লোকে বিজ্‌নেস্‌ বাড়াইবার স্বপ্ন দেখে, সে-মেয়েকে নিজের জীবন-সঙ্গিনী করে না।...বেশ রূঢ় আঘাতেই তিনজনের মোহভঙ্গ দেখিতে সাধ হয় জাহ্নবীর, ওর মনে হয় বড় বেশি দরকার সেটা।

যাই হোক, কিছু বলে না মুখ ফুটিয়া। শুধু তাহাই নয়, যতই দিন যাইতে লাগিল ওর মনে বেশ একটি প্রসন্নতা জাগিয়া উঠিতে লাগিল। টাইপিংটা বেশ আয়ত্ত হইয়া আসিতেছে ধীরে, শর্টহ্যাণ্ডের অভ্যাসটাও। ইংরাজী ওর প্রায় মাতৃভাষার মতোই, বোর্ডিংয়ে ক্রমাগতই ইংরাজীতে কথা বলিয়া বলিয়া লেখার দিকটাও ভালো, ব্রজলাল কয়েকদিনই প্রশংসা করিল, আরও উৎকর্ষের চেষ্টা করিতেছে। একটি স্বাধীন জীবনের স্বপ্ন দেখে জাহ্নবী, এই অশুভ করুণা থেকে মুক্ত। ওদেরও মুক্ত করিবে ; আজ অসহায়, তাই ওরা কৃপাজীবী ; তাই এই মোহ, হীন উচ্ছাশা।

জাহ্নবীর মনটা ভালো থাকে, ছোট কথাগুলা ধরে না। এমন কি, লঘু রহস্যে মা আর পিসিমার গাম্ভীর্য ভেদ করিবার চেষ্টা করে মাঝে মাঝে, অবহেলায় নিজের মুখ ভার করে না সব সময়।

আরও প্রসন্নতার কারণ মাসটি শেষ হইয়া আসিতেছে, নিজের প্রথম উপার্জন হাতে আসিবে। ওর প্ল্যান ঠিক হইয়া আছে। সেই উপার্জন দিয়া ও নিজেদের মুক্তি কেনা আরম্ভ করিবে এই সামনের মাসের গোড়া থেকেই।

একত্রিশ

কেতাদুরস্ত অফিস নয় বলিয়া মাইনা দিবার তারিখ তেমন কিছু ছিল না, অ্যাকাউন্টেন্ট, সুবিধামতো যাহাকে যেভাবে খুশি দিত। এবারে মাসের শেষ তারিখেই ব্রজলাল তাহাকে ডাকিয়া বলিয়া দিল পরদিন পয়লা তারিখেই সবার মাহিনা হাতে পৌঁছিয়া যাওয়া চাই। লোকটি চারিদিকেই হিসেব রাখে, বিশেষ বিশেষ স্থলে মুখটা একটু নিচু করিয়া চশমার উপর

দিয়া একনজর দেখিয়া লইবার একটা অস্বস্তিকর অভ্যাস আছে, নিতান্ত একটি খণ্ডমুহূর্তের জন্য। ব্রজলাল দৃষ্টিটাকে গ্রাহ্য না করিয়া বলিল—"ঠিক করে রাখবেন—সবারই একদিনে—আজ এর, কাল ওর—এ বখেরা রাখবেন না—আরদালি-পিওন—ওদের বড় কষ্ট হয়, গরীব মানুষ।"

মজুমদার মশাইয়ের আরও দু'একটি মুদ্রাদোষ গোছের আছে।—নিজের চেয়ারে গিয়া বসিয়া মোটা লেজার বইটা খুলিল, তাহার পর মসৃণ পাতার ওপর হাতটা একবার বুলাইয়া লইয়া বলিল—"আর্দালি—পিওন!"·· মজুমদার অনেক দেখতে হবে এখনও!

—ভ্রূজোড়াটা একটু কপালে ঠেলিয়া উঠিল, তাহার পর লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

মাহিনাটা ওপরে পৌঁছিলে জাহ্নবী না লইয়া নামিয়া আসিল, ব্রজলালের কামরায় গিয়া বলিল—"একটা অনুরোধ আছে, আমার মাসটা যদি চার তারিখ থেকেই ধরেন দয়া করে; আমি চার তারিখেই জয়েন করেছিলাম।

কণ্ঠে একটু আবদারের ভাবও আছে।

ব্রজলাল অ্যাকাউণ্টেণ্টকে ডাকিয়া পাঠাইল, উপস্থিত হইলে বলিল—"ইয়ে, মজুমদার মশায়, বলছিলাম তাহলে শুধু এঁর মাইনেটা চার তারিখেই দেবেন—মানে পুরো একমাসের মাইনে আর কি।"

মজুমদারের দৃষ্টি একবার চশমার ওপর দিয়া উঁকি মারিল দুজনের মুখের দিকেই।

যে-আনন্দে নূতন নিয়ম গড়াভাঙা করিল ব্রজলাল, সেটা কিন্তু টিকিতে পারিল না বেশিক্ষণ। চার তারিখে মাহিনাটা লইয়া জাহ্নবী আবার কামরায় নামিয়া আসিল। একটা চেয়ার টানিয়া, বসিয়া পাঁচখানি দশ টাকার নোট ব্রজলালের সামনে টেবিলের ওপর রাখিয়া বলিল—"ধারগুলা শোধ করতে দিন এবার আস্তে আস্তে।"

আজকাল জাহ্নবীর মনটা একটু প্রফুল্ল দেখে বলিয়া ও নামিলে ব্রজলাল একটু দীপ্ত লইয়া ওঠে; তরুণের আব্দারে আরও একটু প্রশ্রয়ই পাইয়াছিল,

—একেবারে যেন নিভিয়া ছাই হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত গলা দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না, তাহার পর ঢোঁক গিলিয়া বলিল—"একি কোরছেন?…কেন সেদিনকার কথা কি ভুলে গেলেন?—আপনি যে বললেন, আমিই বরং আপনাদের বাড়িতে আছি, ভাড়া দিতে হবে, বাড়ি ভাঙাচোরা করেছি ব'লে খেসারত দিতে হবে…"

একরকম শেষ করিতে না দিয়াই মুখের ওপর স্থির স্পষ্ট দৃষ্টি তুলিয়া জাহ্নবী প্রশ্ন করিল—"কথাটা মেনে নিচ্ছেন আপনি?"

ব্রজলাল থতমত খাইয়া যাবার সঙ্গে সঙ্গে জাহ্নবী নরম হইয়া বলিল—"না, সে সব তর্কের কথা থাক্; নিন, টাকাটা দয়া ক'রে—নেবেন মাসে মাসে, না হলে কাজ করতে পারব না। আর এইটেতে একটা দস্তখত…"

একটা রেভিনিউ টিকিট মারা টাইপ করা রসিদ আগাইয়া ধরিল। ব্রজলাল আর কিছু বলিল না, রসিদটাতে দস্তখত করিয়া নোট কয়খানা টানিয়া লইল। পরাজয়ের অপমানে বুকটা ওঠানামা করিতেছে।

জাহ্নবী নির্বিকারভাবে ছোট্ট একটি ধন্যবাদ দিয়া স্প্রিংএর দরজা ঠেলিয়া বাহির হইয়া গেল।

ব্রজলালের এই বেদনাটুকু কিন্তু সঙ্গেই যেন অভিশাপ হইয়া জাহ্নবীকে অনুসরণ করিল।—

সফলতায় মনটা খুব প্রসারিত করিয়া দিয়াছে, জাহ্নবী মা-দিদিমার বিমুখতার কথা ভুলিয়া সমস্ত ব্যাপারটিকে গোড়া থেকেই সুন্দর-শোভন করিয়া তুলিবে মনে করিল। অন্নদাঠাকরুণ বালিশে ঠেস দিয়া পা দুটি সামনে ছড়াইয়া অম্বিকাচরণ আর নারায়ণীর সঙ্গে গল্প করিতেছে; ও প্রবেশ করিয়াই বাকি পাঁচখানি নোট তাহার পায়ের কাছে রাখিয়া পায়ের ধূলা লইয়া হাসিমুখে বলিল—"আমার প্রথম মাইনে দিদিমণি।"

অম্বিকাচরণের পায়ের ধূলাও লইয়া মার পায়ের দিকে হাত বাড়াইয়াছে, অন্নদাঠাকরুণ একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিল—"সরা নারাণ, শীগ্‌গির সরা বলছি তোর মেয়ের উপার্জনের টাকা, নইলে লাথিয়ে ফেলে দেব

আমি—ও টাকা লক্ষ্মী নয় অলক্ষ্মী!···বটে! অন্তে গোরু মেরে জুতো দান ক'রলেই যত দোষ হয়—না?···সরা বলছি!···

একেবারে হঠাৎ উগ্র আবেগে বাহির হইয়াছে, এই ক'টি কথা বলিতেই ঝিমাইয়া বালিশে মুখ থুবড়িয়া পড়িল। জাহ্নবী কাঠ হইয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, লজ্জায় অপমানে কান দুইটা যেন আগুন হইয়া গেছে, মায়ের মুখের পানে চাহিতে পারিতেছে না, দাদু যে অন্ধ, জাহ্নবীর মুখটা দেখিতে পাইতেছে না, এটা যেন কত সান্ত্বনার কথা আজ।

কিন্তু অপমান ঘাড়ে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার মেয়ে নয়, যেন ঝাড়িয়া ফেলিয়াই গট্ গট্ করিয়া বাহির হইয়া গেল এবং একটু পরেই বাড়ির মধ্যে দিয়া ব্রজলালকে সঙ্গে করিয়া আবার প্রবেশ করিল; অন্নদাঠাকরুণের দুর্বল শরীরে প্রভাবটা কি হইবে একবার ভাবিল না, ব্রজলালের দিকে ঘাড়টা ফিরাইয়া বলিল—"আপনি বলুন এঁদের যা-তা জায়গায় চাকরি করি কি না—আমায় এঁরা বিশ্বাস ক'রতে পারছেন না—আমার রোজগার অলক্ষ্মী—লাথিয়ে ফেলে দেবার···জিগ্যেস কোরছ না কেন যে আম্মার এটা ভদ্রসংসারেই ছেলে-মেয়ে পড়িয়ে উপার্জন করা টাকা কিনা—আমি মন্দ, কিন্তু উনি তো সৎ তোমাদের চোখে—বাড়ি দিয়েছেন, চিকিৎসা করাচ্ছেন, খেতে পর্যন্ত দিচ্ছেন···"

ব্রজলাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল,—এই রাগ, তাহার ওপর এই মিথ্যাচারের সাক্ষী করিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনা, আবার ডাকিয়া আনিয়া অযথাই তাহাকে কটাক্ষ করিয়া এই সব কথা,—কোন্ দিক দিয়া সামলাইবে বুঝিয়া উঠিতেছে না। তাহার পর হুঁস হইল অন্নদাঠাকরুণ মুখটা থুবড়িয়া পড়িয়া আছে; এদিকটা ছাড়িয়া দিয়া তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া প্রশ্ন করিল—"শরীরটা আবার খারাপ হয়েছে নাকি আপনার?"

জাহ্নবীর হয় নাই হুঁস, আবার শুরু করিতে যাইতেছিল, ব্রজলাল একটু বিরক্তভাবেই চাহিয়া বলিল—"অন্ততঃ এঁর অবস্থাটাও দেখে একটু চুপ করুন, পড়িয়ে এসে জুতোটুতোও তো ছাড়েননি এখনও।"

সাক্ষী দেওয়া হিসেবে ঐটুকুই বলিল, এবং মিথ্যাটুকু বলিতে হইল বলিয়া চোখের কোণে একটু তিরস্কারও করিতে ছাড়িল না।

অন্নদাঠাকরুণ আজকাল বাঁচিয়াই আছে ঔদাসীন্যের জোরে, তাহা না হইলে এ অবস্থার সঙ্গে ওর প্রকৃতির কখনও খাপ খাওয়াইতে পারিত না; মাথা একটু ঘুরাইয়া ক্লান্তকণ্ঠে বলিল—"না, শরীর খারাপ হবে কেন? যা খারাপ আছে, তাই।…আমারই দোষ, রাগটা হয়ে পড়ে হঠাৎ, ঐ রাগেই তো খোয়ালুম সব, নইলে অন্ততঃ নিজের দাদার ভাতেও তো থাকতে পারতাম এই শেষ বয়সে।"

জাহ্নবী আস্তে আস্তে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

পরদিন জাহ্নবী আসিতে ব্রজলাল একটা চিরকুটে লিখিয়া পাঠাইল—"একটা দরকার আছে, ওপরেই ভালো হয়; আপত্তি না থাকলে আসি।"

উত্তরে জাহ্নবী লিখিল—"আসুন"।

ব্রজলাল উদ্ধবকে একটা ছুতো করিয়া ওপরে পাঠাইয়া দিল আগে, তাহার পর নিজে গিয়া উপস্থিত হইল। একটি চেয়ারে বসিয়া অল্প একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—"কথাটা বোধ হয় আন্দাজ করতেই পারছেন।"

"কালকের ব্যাপারটা তো?"

"না, শুধু কালকের নয়; অনেকদিন থেকেই যা হচ্ছে—এই ধরুন আমাকেই বা কি করতে হবে? এই দেখুন না কালকে তো ঐটুকুই হয়নি—আমাকেও পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে দিলেন।…রসিদ নিলেন যেন আমি অস্বীকার করব।"

জাহ্নবী একটু হাসিয়া বলিল—"ওটুকুতে রাগ করলেন কেন? আমিও তো যখন আপনার আফিস থেকে মাইনে নিলাম, অ্যাকাউণ্টেণ্ট বাবু দস্তখতটা নিয়ে নিলেন টিকিটের ওপর; পালিয়ে যাবার ভয়েই নয় তো?"

ব্রজলালও হাসিল, তাহার পর বলিল—"থাক, হার মানলাম; কিন্তু একটা কথা বিশ্বাস করুন—আমি যেটুকু করছি তা একেবারে নিজের স্বার্থে, এতে উপকারের নাম গন্ধ নেই—আমায় ভগবান সম্বল দিয়েছেন একটু, কিন্তু বোধ হয় তার বদলেই নিজের বলতে সবাইকেই নিয়েছেন। এদিক দিয়ে দেখছে

গেলে ওঁরা যে আমার সেবা নিয়ে আমার বাড়িতে রয়েছেন তাতে ওঁরাই বরং আমার উপকার করছেন।"

জাহ্নবী আবার সেইভাবেই একটু হাসিয়া বলিল—"আমায় বাদ দিচ্ছেন কেন? আমিও তো নিচ্ছি—যাকে আপনি সেবা বলছেন।"

অর্থাৎ হাসিয়া কথাগুলাকে হালকা করিয়া দিতে চায়।

ব্রজলাল বলিল—"ওদের মতন করে আপনি যে নিতে পারেন নি, তার অনেক প্রমাণ আগেও আছে, তারপর সবচেয়ে বড় প্রমাণ—চাকরি নিলেন।"

জাহ্নবী চুপ করিয়া রহিল।

ব্রজলাল বলিল—যাক্, আমায় যখন কেটে বাদই দিচ্ছেন তখন আমার আর কিছু বলতে যাওয়া মানায় না, কেন না ওসব তখন একেবারে আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়ে পড়ে। আমি শুধু এই জন্যেই বলছি যে যদি এইরকম অশান্তি খিটিমিটি লেগে থাকে তো দিদিমাকে বাঁচানো শক্ত হবে; একটা কিছু উপায় হয় না?"

"উপায় হয়ে গেছে ব্রজবাবু, আমি যখন তাঁদের বাঁচাতে পারলাম না তখন মারবার চেষ্টাও করবো না আর; কালকের ব্যাপারে ঠিক করে ফেলেছি।"

"বুঝলাম না কথাটা।"

"ভিক্ষে নেওয়াটাকেই আমি মরা ভেবেছিলাম, তাই চাকরি নেই ওঁদের বাঁচাবার জন্যে! দেখছি তা হবার নয়, আমারই ভুল। তাহ'লে যেমন চলছে তেমনি চলুক। আর মাইনে থেকেও কাটান দিতে যাব না ঠিক করেছি। যদি জিগ্যেস করেন কেন?" উত্তর হচ্ছে, "ওঁদেরই থাকা, খাওয়া চিকিৎসার ধার শোধ দিতে যাচ্ছিলাম তো।"

এবার ব্রজলাল একটু চিন্তিত ভাবে চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল—"আরও যেন খারাপই হল।"

"কেন?"

"নিজেকে আলাদা করে নিলেন।"

"নিলেও যা ভয় করছেন তা করব না; আলাদা থাকবও না, আলাদা খাবও না। মন জিনিসটা খুব সুবোধ ব্রজবাবু, তাকে যা বোঝানো যায়, তা

সে বোঝে। যখন ফাঁকি দিয়ে জোড়াতালি দিয়েই থাকতে হবে, তখন তাকে বোঝালেই হবে আপনার বাড়িতে, আপনার রান্না ঘরে আমার অধিকার আছে—চাকরি বিশেষে লোকে খাওয়াও তো পায়, ফ্রী কোয়ার্টার্স'ও তো পায়, এ তাই বলেই ধরে নেবো।"

এবার একটু বেশিক্ষণ চুপচাপ গেল। ব্রজলাল মাথা নিচু করিয়া জুতার আগাটা আস্তে আস্তে মেঝেয় ঘষিতে লাগিল, তাহার পর এক সময় উঠিয়া চিন্তিতভাবে বলিল—"হ'ল সবই; কিন্তু কোথায় যেন একটু গলদ থেকে গেল।"

জাহ্নবীও দাঁড়াইয়া উঠিল, উত্তর করিল—"গলদই যে এর সবটা; আপনি ঐখানটাই করছেন ভুল।"

বত্রিশ

অফিসে নিজের ঘরটিকে জাহ্নবী ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছে। নূতন, ছোট-খাট, ছিমছাম আর বেশ নিরিবিলি, অথচ সেই নিরিবিলির মধ্যে বসিয়া চারিদিকটা বেশ দেখা যায়। জানলাগুলার অর্ধেক পর্যন্ত একরকম হালকা সবুজ রঙের জালী পর্দা আঁটা; হাওয়া আটকায় না, তবে বাহিরের দৃষ্টি আটকায়, যেটা খুব দরকারী ছিল, কেন না মেয়ে কেরানি আসার সংবাদটা ছড়াইয়া যাওয়া পর্যন্ত গেটের ভিতর পা দেওয়ার পর সবার দৃষ্টি একবার না একবার ওপরে নিক্ষিপ্ত হয়ই হয়। সবচেয়ে ভালো লাগে একটি মৃদু সবুজ আভা ঘরটিকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে; অল্প পরিসর লইয়া চমৎকার একটি স্নিগ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি হয়, বাহিরের জীবন বাহিরে ছাড়িয়া রাখিয়া জাহ্নবী সেই পরিবেশের মধ্যে প্রবেশ করে।

অন্ততঃ সেই চেষ্টা তাহার, তবে জীবনের একটা অংশ থেকে একটা অংশ বাদ দেওয়া তো অত সহজ নয়। যতক্ষণ কাজের মধ্যে থাকে বেশ থাকে, কতকটা ভালো থাকার জন্যই অফিসের কাজ ফুরাইলে নিজের কাজের মধ্যে ডুব দেয়; তবুও ক্লান্তি এক সময় না একসময় আসেই; ঘরে একটা সোফা আছে, সেটাকে টানিয়া লইয়া জাহ্নবী জানলার ধারে বসে। কখনও বসে,

বাড়ির দিকেই। উঠানের ও-ধারটায় ওদের তিনখানি থাকিবার ঘর, নূতন করিয়া তোলা তো দূরের কথা মেরামত পর্যন্ত হয় নাই, সেই রকম জীর্ণ আছে। এখানে বসিয়া বসিয়া কারণটা বড় অদ্ভুত লাগে জাহ্নবীর—ব্রজলালের ইচ্ছা আছে, সামর্থ্যতো ষোল আনাই আছে, হাত দেয় না শুধু জাহ্নবী একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে বলিয়া। শুধু জাহ্নবী,—দাদু নয়, মা নয়, এমন কি দিদিমা পর্যন্ত নয়···কত বদলায় মানুষ!—এই এক বছর আগে নিদারুণ দুঃখ দৈন্যের মধ্যে ওরাই ছিল কি, আর আজ সুখের স্পর্শে, আর সেই সুখকে বাঁধিয়া রাখিবার আগ্রহে কত নামিয়া গেছে।···দোষ দেয় না জাহ্নবী, অবস্থা! অন্নদা-ঠাকরুণ জানে তাহার সম্পত্তি লুন্ঠিত, তবু এখন সেই লুটেরার কাছেই মাথা নোওয়াইয়া পড়িয়া আছে, নিরুপায়ভাবে পড়িয়া পড়িয়া তাহারই পক্ষে যুক্তি রচনা করিতেছে।···উপায় কি?

বাড়িতে এই ব্যাপারটা লইয়া রাগারাগি করিয়াছে, বিদ্রূপ করিয়াছে, কিন্তু এখানে এইরকম অলস অবসরে যখন স্থির মনে চিন্তা করে তখন সে ভাবটা আর থাকে না। তাই বলিয়া মনটা যে হাল্কা হয় এমন নয়, রাগের জায়গায় একটা আতঙ্ক ধীরে ধীরে আত্মপ্রসার করে—সে আরও অস্বস্তিকর। অবস্থা মানুষের জীবনে যখন এতই প্রবল—সিংহীকে মেষে পরিণত করিতে পারে, তখন জাহ্নবীর নিজের ভবিষ্যৎই কোনদিকে কে জানে? এই তো সে নিজেও ঐ লুণ্ঠকেরই অন্নদাসী, অবস্থাগতিকেই নয় কি? না হয় চাকরিই করে, অর্থাৎ অনুগ্রহ নয়, উপার্জন; কিন্তু অন্তরের সঙ্গে চায় কি এই লোকটার সহিত একছাতের নিচে থাকিয়া এর অর্থ উপার্জন করিতে। নিরুপায় বলিয়াই নয় কি?

তাই আতঙ্ক হয় জাহ্নবীর···পুরুষের একটি মাত্র রূপ আছে, লোভাতুর—বিত্তের লোভ, রূপের লোভ—সেইলোভকে চরিতার্থ করিবার জন্য তাহার আছে সহস্রবিধ ফন্দি,—আজ পর্য্যন্ত এই দেখিয়া আসিল জাহ্নবী; অন্য রূপ নাই পুরুষের; হয় না,—মায়ের পলাতক জীবনে দেখিল, নিঃসঙ্গ অরণ্য-জীবনের চারিদিক ঘেরিয়া এই রূপই দেখিল, বোর্ডিঙের শুচিতা নষ্ট করিল—সেও এই রূপই, আজ যখন প্রত্যক্ষভাবে তাহার সামনাসামনি আসিয়া

দাঁড়াইয়াছে তখন কি অন্য রকম হইবে? পাইবে কোথায় অন্য রূপ, এক যদি সেটা মুখোস না হয়?

জাহ্নবী চিন্তার মাঝেই মনে মনে চঞ্চল হইয়া ওঠে; মনে হয় ওদিকে দয়া উদারতা—এই সবের বাহ্যিক আবরণের নিচে আয়োজন সব ঠিক, অবস্থার ফেরে অনেকটা কাছাকাছি আসিয়াই গেছে জাহ্নবী, অবস্থা আর একটু প্রতিকূল হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে নিজের সঙ্কল্প থেকে ঝরিয়া পড়িবে।

প্রত্যক্ষ কারণ নাই থাকুক, এই আতঙ্কেই দেয় মনটা তিক্ত করিয়া। এই রকম চিন্তার মাঝখানে যদি নিচে থেকে কাজ লইবার জন্য ডাক পড়ে, হঠাৎ একটা জিদে, খানিকটা অবাধ্যতায় পাইয়া বসে জাহ্নবীকে। অযথা দেরি করিয়া নামে, কোন কোন বার তাগাদা আসার পর; কাজ নেয় অপ্রসন্ন মুখে, ব্রজলাল যদি নিতান্ত ভদ্র কৌতূহলবশেই কারণ জিজ্ঞাসা করিল—শরীরটা ভালো আছে তো, কিংবা মন—এমন একটা রূঢ় উত্তর দিয়া বসে কখন কখন যাহাতে তাহার মনটা অনধিকার-চর্চার সঙ্কোচে নিজের মধ্যে গুটাইয়া যায়।

কোনদিন হয়তো বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বসিল। বাড়ির দিকে মায়ের নজরে পড়িয়া যাইবার ভয়ে পর্দাটা সব সময়েই থাকে টানা, এদিকে বসিলে ভালো করিয়া দেখিবার জন্য পর্দা গুটাইয়া বসে জাহ্নবী, শুধু সোফাটা রাখে জানলা থেকে খানিকটা দূরে ঘরের মাঝামাঝি।

সামনের প্রশস্ত উঠানটায় কর্মব্যস্ততা। মাস তিনেক আগে যখন কাজ নেয় জাহ্নবী, তাহার তুলনায় এখন কাজ প্রায় দ্বিগুণের অধিক হইয়া গেছে। কলিকাতার শহরতলী থেকে আরম্ভ করিয়া এই জায়গারও চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল উত্তর পর্যন্ত চার পাঁচটা জায়গায় কাজ হইতেছে ব্রজলালের, কেন্দ্র এই। সমস্ত উঠানটা কাঠ, লোহালক্কড় আরও সব অন্য রকম মাল-মসলায় গাদা। ছয়-সাতটা লরীতে মালপত্র নিত্য যাওয়া আসা করিতেছে, তাহার মধ্যে গোটাচারেক ব্রজলালের। কত লোক খাটে! কত লোকের যাতায়াত!—নানা জাতের নানা অবস্থার; কেহ নিজে বড় ঠিকাদার, কেহ ব্রজলালের অধীনেই ঠিকা লইয়াছে কোন বিশেষ মাল জোগান দেবার। মাঝে মাঝে মিলিটারি বিভাগের

সাহেবও আসে দু-এক জন, নূতন ঠিকার কথাবর্তা কহিতে। এসবের জন্য অবশ্য ব্রজলালকেই গিয়া ধর্ণা দিতে হয়, তবে ওদেরও কেহ কেহ আসে মাঝে মাঝে। মোটের ওপর জায়গাটা সর্বদাই সরগরম।

ভালোই তো, এর মধ্যে দৃষ্টিকটু কি আছে? কিন্তু দ্রষ্টা তো মানুষের চোখ নয়, মন; জাহ্নবী বেশ আনন্দ পায় না। ঈর্ষা নয়; ওর স্বভাবের মধ্যে ঘৃণা আছে, আক্রোশ আছে, কিন্তু ও জিনিসটা নাই। আর একটা লোক উন্নতি করিতেছে বলিয়াই যে তাহার ওপর ঘৃণা বা আক্রোশ হইবে এমন দুর্বলতাও নাই ওর মধ্যে। আসলে এই ধরণের উন্নতিটাই ওর অস্বস্তিকর বোধ হয়। মনে হয় এ যেন প্রচণ্ড ক্ষুধায় একটা মানুষ অতি দ্রুত আর ক্রমাগত আহার করিয়া করিয়া বিকৃত কলেবর হইয়া উঠিতেছে—মনটা হইয়া আসিতেছে শুষ্ক; জীবনে শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তির একটি মাত্র অনুভূতি লইয়া মানুষটা ক্রমেই একটা জড়পিণ্ডে পরিণত হইয়া চলিয়াছে।

সত্যই হইতেছে তাহাই। চিঠিপত্র সব জাহ্নবীর হাত দিয়াই আসে যায়, —ক্রমাগতই টাকা—টাকা; যে কাজগুলা ধরিয়াছে সেগুলা ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া কি করিয়া আরো টাকা আসে, আরও কি করিয়া নূতন কাজ ধরা যায়, সেই কথা। বুদ্ধিটা প্রখর, তা ভিন্ন দেখিয়া দেখিয়া আজকাল বোঝেও অনেক কিছু—ওর মনে হয় এও যে উপার্জন, এর সবটা নিষ্কলুষ নয়, টাকাগুলা সবটা সোজাপথে আসিতেছে না, ঐ যে সাহেবগুলা আসে ওদের যাওয়া আসার সঙ্গে এ উপার্জনের একটা প্রচ্ছন্ন যোগ আছে। লড়াই হইতেছে, দেশ বিপন্ন, ওরা এই ভাঙা হাটে লুণ্ঠনে মাতিয়া উঠিয়াছে—ইংরাজ, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মারোয়াড়ী, ভাটিয়া। পুরুষ-জগতের একটা নবতর পরিচয় পাইতেছে জাহ্নবী।

ব্রজলাল বদলাইয়া যাইতেছে। একটা উৎকট নেশায় থাকে আচ্ছন্ন—ঐ টাকার নেশা। আর এমন কিছু স্পষ্ট প্রমাণ না পাইলেও জাহ্নবীর মনে হয় ওর কতকগুলা যে গুণ ছিল—অর্থাৎ ভেতরের উদ্দেশ্য যাহাই থাক, বাহিরে বাহিরে যেগুলাকে গুণ বলিয়া মনে হইত—সেগুলাও যেন ধীরে ধীরে ওর চরিত্র থেকে বিদায় লইতেছে। ওদের বাড়ির সঙ্গেই ব্যবহারের কথাটা ধরা যাক, ব্যবস্থা

সেইরকমই আছে, যায়, খোঁজ লয়, কিন্তু কোথায় কিসের যেন অভাব থাকিয়া যাইতেছে। জাহ্নবীর দিক থেকে দেখিতে গেলে ভালই হইতেছে, ওতো চায়ই একটা ব্যবধান আসিয়া পড়ে; কিন্তু এর গোড়ার কথা উদ্ভট উপার্জনের নেশা—এইটাই অস্বস্তি জাগায় মনে।

ইতিমধ্যে একদিন নিজের মাহিনাটা বাড়াইয়া লইল, টাইপ-করা বেশ ভালোই শিখিয়াছে, শর্টহ্যাণ্ড চলনসই একরকম, বলিল—"এবার দেবেন বাড়িয়ে মাইনেটা?"

ব্রজলাল একটু লজ্জিতভাবে মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"দেখুন ভুলটা! আপনি তো অনেকদিন থেকেই টাইপ করে যাচ্ছেন, ডিকটেশনও নিচ্ছেন শর্টহ্যাণ্ডে। আমারই নিজের থেকে বলা উচিত ছিল। নাঃ, দিন দিন অকেজো হয়ে যাচ্ছি, আর কিছু মনে থাকে না।"

"তার জন্যে আর হয়েছে কি? আমি তো নিতামই না এর আগে; এই মাস থেকেই মনে হ'ল ওটা পাওনা হয়েছে আমার।"

"তাও বটে, আপনি এবিষয়ে আবার বড্ড বেশি খুঁতখুঁতে!"

অ্যাকাউন্টেণ্টকে ডাকিয়া লইয়া বলিল—"মজুমদার মশায়, এমাস থেকে এঁর মাইনেটা দেড়শ হ'ল, নোট করে রাখুন।"

জাহ্নবী বলিল—"না, একশ পঁচিশ।"

"কেন? শিখেছেন তো দুটোই।"

"এখনও তেমন হাত খোলেনি।"

ব্রজলাল একটু অপ্রতিভই হইল, এ্যাকাউন্টেণ্টের দিকে চাহিয়া বলিল—"শুনলেন তো? ত'হলে তাই; উনি আবার এবিষয়ে ওভার কন্‌সেন্‌শাস্!"

নিজের চেয়ারে বসিয়া মজুমদার মশাই দূর থেকেই চশমার ওপর দিয়া ব্রজলালের কক্ষের পানে চাহিল একটু, তাহার পর খাতার গায়ে দুইবার টানা হাত বুলাইয়া নিজের মনেই বলিল—ওভার-কন্‌সেন্‌শাস্!—কিনা, বাছার কোমল বক্ষে বিবেকদংশন সয় না; মরে যাই—মরে যাই!"

তেত্রিশ

এর মধ্যে একদিন একটা নূতন ধরণের যোগাযোগ ঘটিয়া গেল,—এক বাড়িতে একই স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া প্রায় একই অবস্থার মধ্যে কাটাইতে গেলে যা না ঘটিয়াই পারে না।

রবিবার, অফিসে ছুটি। ছুটি থাকিলেও ওদিকে কাজ হয়; মিলিটারি কাজ, সবই জরুরী, সবেতেই তাড়াহুড়া, পড়িয়া থাকিবার জো নাই। কিন্তু আজ সকাল থেকে বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় ওদিকেও লোকজন একেবারে আসে নাই।

জাহ্নবী আফিসের আলমারি থেকে যে-বইটা আনিয়াছিল, রবিবারের ওপর আবার বর্ষার নিষ্ক্রিয়তায় সেটা তাড়াতাড়ি শেষ হইয়া গেল। একটু এদিক-ওদিক করিয়া কাটাইল,—ঘরের জিনিসপত্র একটু নাড়াচাড়া করিয়া, একটু উল বুনিয়া, মাঝে মাঝে বর্ষণ দেখিয়াও। কিন্তু আজ যেন বইয়ের দিকে মন টানিতেছে, বিশেষ করিয়া, ঝোঁক ধরিয়াছে শেলী পড়িতে।…জাহ্নবীর জীবনে শেলীর সঙ্গে ওতপ্রোত হইয়া আছে ডোরার স্মৃতি—রুক্ষ, কঠোর; শেলীর কথা মনে হইলে মনে পড়িয়া যায় ডোরা ওকে একটা ব্রত দিয়াছে, কাব্য থেকে মনটা বিমুখ হইয়া যায়।

আজ অবিশ্রান্ত বর্ষায় সবই যেন সিক্ত, কোমল করিয়া তুলিয়াছে, মনে হইতেছে ডোরা তাহার জীবনের ট্রাজেডি লইয়া নিজেই যেন একটা কাব্য, বড়ই করুণ, মর্মান্তিক। আজ ডোরার দেওয়া কাব্যগ্রন্থখানি যেমন নিজের দিক থেকে তেমনি ডোরার দিক থেকেও বড় টানিতেছে মনটা।

মা, দাদু, দিদিমণি—সবাই নিদ্রামগ্ন; বইটা লইয়া আসিবে।

আছে আফিসের আলমারিতে, ওর নিজের আরও কতকগুলি বইয়ের সঙ্গে; কাজের মধ্যে যখন অবসর হয় টানিয়া লইয়া পড়ে। এ বছরে বৃষ্টির এইটাই যোটে দ্বিতীয় দিন, এখনও ছাতা কেনা হয় নাই, রাস্তা দিয়া না গিয়া বাড়ির ভেতরে ভেতরেই যাইতে হইল। দক্ষিণদিকে নতুন ঘরগুলোর সঙ্গে

ঢাকা বারান্দাও হইয়াছে, শুধু এইটুকু যে খোলা রকের ওপর দিয়া যাইতে হইবে, তাহার জন্য জাহ্নবী একটা গামছা পাট করিয়া মাথা ও পিঠের খানিকটা পর্যন্ত ঢাকিয়া লইল।

আফিস ঘরে গিয়া দেখে আলমারির পাল্লা দুইটা খোলা; তাহার মানে ব্রজলাল আসিয়া বই লইয়া গেছে। চাবিটা থাকে আলমারির মাথায়, সে যখন আসে প্রায়ই আলমারিটা এইরকম হাট-আদুরে করিয়া যায়, পরদিন আফিসে ঢুকিয়া জাহ্নবী বন্ধ করে, এইরকম অনবধানতার জন্য একটু বিরক্তও হয়।

বইটা বাহির করিল। বৃষ্টির দৃশ্যটা এখান থেকে আরও ভালো লাগিতেছে। দোতলা ঘর, তার তিনদিকে জানালা, অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়, তাহার ওপর বর্ষা জিনিসটাই ওর লাগে ভালো। একবার মনে হইল এখানে বসিয়াই পড়ে বইটা। সেই সঙ্গে এ চৈতন্যটাও রহিয়াছে যে, এই বাড়িতেই, নিচে, নিঃসম্পর্কিত একটি যুবা রহিয়াছে, হয়তো একটু আগেই আসিয়াছিল বই লইবার জন্য। তাহার পর বাড়িটাও আজ অন্যদিনের হিসাবে জনবিরল; সময়টাও দুপুর, চাকর-বাকর যাহারা আছে তাহাদের বিশ্রামের অবসর। কি করিবে ভাবিতে ভাবিতেই সোফাটা টানিয়া রাস্তার দিকে একটা জানলার সামনে আনিয়া রাখিল; তাহার পর চলিয়াই যাইবে স্থির করিয়া আলমারিতে চাবি দিতে যাইবে, এমন সময় সিঁড়িতে চটি জুতার শব্দ হইল।

জাহ্নবী চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু পথ একটি, নিরুপায় হইয়া নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

একটা সুযোগ কিন্তু নিজে হইতে হইয়া গেল। উদ্ধব, অর্থাৎ অফিস-বয় হিসাবে যে ছোকরাটাকে রাখা হইয়াছে সে এই বাড়িতেই থাকে। অন্য সময় ফাইফরমাইস খাটে, এমন কি মনটা যদি সে রকম হালকা রহিল তাহাকে দিয়া নকলও করায় ব্রজলাল। নিচের সিঁড়িতে থাকিতেই তাহাকে ডাক দিয়া বলিল—"উদ্ধব, সিগারেটের টিনটা ফেলে এলাম, নিয়ে আয়, দেশলাইটাও।…অ্যাকাউন্টেন্টবাবুর মতন করে আনবি।"

আরও গোটাপাচেক সিঁড়ি ভাঙিতেই ব্রজলালের দৃষ্টি ঘরের মাঝে পড়িল,

একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া ফিরিয়া যাইবার জন্য মুখ ফিরাইতে জাহ্নবী দুই পা আগাইয়া গিয়া বলিল—"আপনি আসুন, দরকার থাকে…নিশ্চয় আছে; আমার হ'য়ে গেছে, আমি যাচ্ছি।"

গায়ে গা ঘেঁষিয়া নামা চলে না বলিয়াই অপেক্ষা করিয়া রহিল।

ব্রজলালও দাঁড়াইয়া রহিল। খানিকটা সঙ্কোচ আছে, কিন্তু তাহার সঙ্গে নিতান্তই অনিবার্যভাবে একটু মুগ্ধ ভাবও রহিয়াছে দৃষ্টিতে। কিন্তু সেটা মুহূর্তের জন্য, সামলাইয়া লইয়া বলিল—"না, এমন কিছু দরকার নেই—বই নিতেই এসেছিলাম; আপনিই থাকুন না; একটা নিয়ে গেছলাম এক্ষুণি ভালো লাগল না।"

"বদলে নেবেন তো?"

"হাঁ…তা না হয়…ইয়ে, আপনি ভিজে গামছাটা এখনও নামান নি গা থেকে।"

জাহ্নবী হঠাৎ গামছাটার মতোই রাঙা হইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি নামাইয়া লইয়া বলিল,—"এই দেখুন ভুল!…আসুন আপনি, আমি যাই। আপনি এখানে ব'সে প'ড়তেই তো আসছিলেন।"

কতকটা উহাকে উঠিয়া আসিতে বাধ্য করিবার জন্যই, নিজে আগাইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই হাতের গামছাটা মুখে চাপিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

উদ্ধব পেটে একটা কাপড় জড়াইয়া তাহার ওপর জামাটা পরিয়া একটা ভুঁড়ি করিয়াছে, হাতে সিগারেটের টিন আর দেশলাইয়ের বাক্সটা লইয়া অ্যাকাউন্টেন্ট মজুমদার মশাইয়ের মতো একটু একটু হাঁপাইতে হাঁপাইতে দুলিতে দুলিতে উঠিয়া আসিতেছে।

ব্রজলালও দেখিয়াই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গেই, বোধ হয় নিজের পদমর্যাদার কথা স্মরণ করিয়া গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—"হতভাগা! তোকে কে এমন ক'রে…"

নিজেই সে মিনিট দুতিন আগে ফরমাস করিয়াছে, জাহ্নবী শুনিয়াছেও

সেটা মনে পড়িয়া যাওয়ায় হাসি-হাসি মুখটাতে একটু অপ্রতিভ ভাব লইয়া চুপ করিয়া গেল।

একটু অস্বস্তিকর অবস্থা দাঁড়াইল বটে, কিন্তু হঠাৎ ও অবস্থায় দুজনের দেখা হওয়ার অস্বস্তিটা কাটিয়া গেল। ব্রজলাল সিগারেটের টিন আর দেশলাইয়ের বাক্সটা লইয়া একটু ধমকের সুরে বলিল—"যা, ঠিক হয়ে আয় বলছি।"

পেটে হাসি গুরগুর করিতেছে; সেটাকে মুক্তি দিবার জন্যই জাহ্নবী হাসিতে হাসিতে বলিল—"একটা আস্ত ভাঁড়! যোগাড় করলেন কোথা থেকে? শুনেছি সবার নকল নাকি সবার কাছে করে।"

ব্রজলালও যেন একটু সহজ হাসি হাসিয়া বাঁচিল, বলিল—"ঐ রোগে এর আগের চাকরিটা গেছে হতভাগার। একটা যাত্রার দলে গানটান শিখত আর অধিকারীর তামাক সাজত। সে বেচারী দেখে একদিন দলের মধ্যে বুড়োর মতন কুঁজো হয়ে ব'সে কাশতে কাশতে তার তামাক খাওয়ার নকল করছে; তাড়িয়ে দিলে।···শুনেছি আমার নকলও নাকি করে সবার কাছে···।"

অনুচিত জানিয়াও হাস্য-তরল মুখে জাহ্নবী বলিয়া ফেলিল—"তা, এখানকার তো আপনিই অধিকারী।"

নিজেও আবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া ফেলিল, ব্রজলালের চাপা হাসিটারও এবার মুক্তভাবে বাহির হইয়া আসিতে বাধিল না।

এর মধ্যে অন্যমনস্কভাবে উঠিয়াও আসিয়াছে ওপরে; হাসির বেগটা প্রশমিত হইলে বলিল—জ্বালা হয়েছে এক—হতভাগাকে নিয়ে!···আপনি যদি যান তো দাঁড়ান, এমন করে ভিজতে ভিজতে যাবেন না, ছাতা কেনা হয়নি এখনও, রেন-কোটটা আনতে বলি আমার।···উদ্ধব!"

"থাক ও হাঙ্গাম; আবার কারুর নকল ক'রতে ক'রতে আসবে,—হয়তো আমারই রেনকোট পরার নকল করবে কোনদিন।"

আবার খানিকটা হাসি ছলছলিয়া উঠিল। উদ্ধব ভুঁড়ি ঘুচাইয়া দিয়া চৌকাঠের ওদিকে আসিয়া দাঁড়াইল; আধপাগলা গোছের, প্রশ্রয়ও পায় সবার কাছে, বেশ সপ্রতিভ, প্রশ্ন করিল—"ডাকছিলেন?"

ব্রজলাল জাহ্নবীর পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"যাবেনই—এক্ষুণি ?"

দৃষ্টিটাতে একটু সলজ্জ মিনতি আছে ; সেটা জাহ্নবীর পছন্দ হইল কিনা বোঝা গেল না, অন্ততঃ যদি অপছন্দই হইয়া থাকে তো, এই যে সখ্য সদ্য হাসির হাওয়া বহিয়া গেল, সেটা সে ভাবটাকে স্পষ্ট হইতে দিল না। তবু প্রশ্নটা করিয়া একটু সঙ্কোচে পড়িয়া গেল ব্রজলাল, একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিল—"ও, হাঁ ঠিক, একটু বসুন, আপনার একখানা চিঠি আছে।"

উদ্ধবকে ফরমাস করিতে যাইতেছিল, "না, আমার দেরাজেই আছে, ও পাবে না।"—বলিয়া নিজেই ত্রস্তপদে নামিয়া গেল।

যে খামটা আনিয়া হাতে দিল তাহার মাথায় কলিকাতার একটি সওদাগরি অফিসের নাম ছাপা রহিয়াছে। চাকরি সংক্রান্ত চিঠি, ভিতরে হয়তো নিয়োগের কথাই আছে, না হয় সাক্ষাৎকারের জন্য আহ্বান, তবু প্রত্যক্ষভাবেই ব্রজলালের হাত হইতে লইতে হইল বলিয়া জাহ্নবী বেশ দীপ্ত হইয়া উঠিতে পারিল না। এমন কি খুলিতেও পারিল না খামটা ; দৃষ্টি নত করিয়া কতকটা নির্লিপ্তভাবে সেটা বার দুই উল্টাইয়া পাল্টাইয়া একটা কিছু বলিবার প্রয়োজনে প্রশ্ন করিল—"এল কবে চিঠিটা ?"

ব্রজলাল একদৃষ্টে জাহ্নবীর আনত মুখটা নিরীক্ষণ করিতেছিল, একটুও না ভাবিয়া উত্তর করিল—"এই আজই সকালের ডাকে।"

কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা,—এক আধ দিন নয়, তিনদিন আগে আসিয়াছে চিঠিটা। ব্রজলাল ইচ্ছা করিয়াই পাঠাইয়া দেয় নাই। দিবার একটি সুযোগ খুঁজিতেছিল, হাস্যপরিহাসের মধ্যে ভুলিয়া গিয়াছিল, তারপর হঠাৎ মনে হইল আজকের মতো সুযোগ আর আসিবে না।

অপরাধ নয়, কিছু নয়, জানিয়া শুনিয়াই ব্রজলালের কারখানার ঠিকানা দিয়াছিল দরখাস্তে, তবুও দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে জাহ্নবী, দৃষ্টিটা বারেবারেই নত হইয়া যাইতেছে ; এক সময় বলিল—"তাহলে যাই আমি এবার।"

ব্রজলাল বলিল—"একটু বসুন জাহ্নবী দেবী। একটা কথা,—আপনার কোনরকম অসুবিধে হ'চ্ছে কি এখানে ? চিঠিটা চাকরির দরখাস্তের উত্তরে এসেছে বলে মনে হচ্ছে, তাই জিগ্যেস করলাম।"

জাহ্নবী একটু নিরুত্তর থাকিয়া বলিল—"অসুবিধে আর কি ? তবে মানুষে উন্নতিই তো চায় নিজের।"

উত্তর প্রত্যুত্তর কোন্ পথে অগ্রসর হইবে এই মেয়ের সঙ্গে যেন জানাই ছিল ব্রজলালের, সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করিল—"কত দেবে ওরা ?—নিশ্চয় বিজ্ঞাপনে ছিল সেটা ?"

"যা পাচ্ছি প্রায় তাই।"

"আমি আরও পঞ্চাশ টাকা দোব।...না, এতে অপরাধ নেবার কিছু নেই, একজন ভালো কেরানী আবার আফিসের পুরানো লোক, সব জানে শোনে, তাকে রাখবার জন্যে তো সব প্রতিষ্ঠানের মালিকই চেষ্টা করে।"

"চেষ্টা করতে বাধা কি ? তবে থাকা না থাকা তো তার নিজের ইচ্ছে। আপনি যখন তর্কই করছেন, তখন বলতে হয়—মাইনেই তো সব নয়, একটা ভালো নামজাদা আফিসে কাজ করা..."

তিন দিন থেকে ভাবিতেছে, এসব যুক্তিরও খণ্ডন ছিল ব্রজলালের কাছে, কিন্তু কি ভাবিয়া আর সেদিকে গেল না। বলিল—তর্কের কথা থাক জাহ্নবী দেবী ; কিন্তু অনুরোধ করতে তো বাধা নেই ?—আপনি যাবেন না—দরখাস্ত করাও ছেড়ে দিন—আর কিছুর জন্যে না হোক ওঁদের তিনজনের মুখ চেয়ে থেকে যান। এতো আর তর্ক করা হ'ল না।"

তর্কের চেয়ে ভাবাবেগ আরও অস্বস্তিজনক, জাহ্নবী সেইটাকেই এড়াইবার জন্য ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"একপক্ষের হয়ে ওকালতি তো তর্কই—তা যেভাবেই করা হোক না কেন।"

"তাহলে সোজা কথাটাই জিগ্যেস করি—আপনি এ অ্যাটিচিউড্ নিয়েছেন কেন আমার ওপর ?—সেই একেবারে গোড়া থেকেই ? কোন মতেই তা যাচ্ছে না !"

"গোড়া থেকে সমস্ত ইতিহাসও তো আপনি জানেন...আপনারই সৃষ্টি সেটা।"

"ও ! আপনি বাড়ি নেবার কথা ধরে বসে আছেন ?"

ক্ষণমাত্র চিন্তা করিল, তাহার পর বলিল—"বেশ বাড়ি আমি লিখে দিচ্ছি..."

"কাকে ?"—প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্টি উগ্র হইয়া উঠিল জাহ্নবীর।

ব্রজলাল ব্যথিতভাবে বলিল—"এই দেখুন, এই ভুলই ক'রে যাচ্ছেন বরাবর আপনি, দিদিমার বাড়ি দখল করেছি বলছেন, ফিরিয়ে দোব অন্য কাকে ?"

ভুল হোক, ঠিক হোক, জাহ্নবীর সন্দেহটা ঘুচিল বলিয়া মনে হইল না, সেও ব্যথিত আবেদনের কণ্ঠেই বলিল—"আমি যাই ব্রজবাবু, বোধ হয় আমরা দু'জনের কেউই চাইছি না, তবু ব্যাপারটা যেন অপ্রিয় হয়ে পড়ছে ক্রমে। একটা অনুরোধ আপনাকে কয়েকবারই করেছি—আমাদের মধ্যে অফিসের সম্পর্কটাকেই বড় ক'রে রাখুন, গোল মিটে যাবে।...আমি যাই এবার।"

ব্রজলাল ডাকিল—"উদ্ধব !"

"না, রেন-কোটের দরকার নেই।"—বলিয়া সোজাভাবে প্রত্যাখান করিয়া জাহ্নবী নামিয়া গেল।

চৌত্রিশ

বাড়ি গিয়া জাহ্নবী খামটা ছিঁড়িয়া ফেলিল। নিয়োগপত্রই, যতশীঘ্র সম্ভব গিয়া কাজ আরম্ভ করিতে লিখিয়াছে।

কিন্তু তেমন উৎসাহ পাইতেছে না তো! টাইপে, শর্টহ্যাণ্ডে একটু রপ্ত হইবার পর এদিকে কয়েকদিন থেকে নানাস্থানে দরখাস্ত ছাড়িয়া আসিতেছে বিজ্ঞাপন দেখিয়া দেখিয়া, কোথাও চাকরি পাইলে কি করিয়া নূতন জীবন আরম্ভ করিবে, সে সব লইয়া বেশ একটু কল্পনা-বিলাসীও হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু কাজ যখন পাইল, তখন বাস্তবের একেবারে সামনাসামনি হইয়া মনটা নিরুৎসাহই হইয়া পড়িল। এই নিশ্চিন্ত নীড়ের যে একটা মোহ আছে, সেটা এই প্রথম বুঝিল জাহ্নবী।

আরও একটা ব্যাপার হইল। চিঠির তারিখের ওপর নজর পড়িতে দেখিল আজ থেকে পাঁচদিন আগে লেখা। ডাকের আজকাল গোলমাল হয়, তবু পাঁচদিন লাগিল কলিকাতা হইতে এইটুকু আসিতে! অস্বাভাবিক মনে হওয়ায় সন্দেহবশেই খামটা উল্টাইয়া দেখিয়া জাহ্নবীর ভ্রূ দুইটা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। এখানকার পোষ্ট আফিসের তারিখের মোহরটা অস্পষ্ট, তবু আজ, কাল বা

পরশুর যে নয় একটু ভালো করিয়া দেখিতে সে-বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না জাহ্নবীর। আজ বারো তারিখ, অর্থাৎ দুই সংখ্যায়, কাল এগারো, পরশু দশ—অথচ অস্পষ্ট হইলেও এক সংখ্যায় তারিখটা রহিয়াছে মোহরে; নয়, আট এমন কি সাত হইতেও বাধা নাই বিশেষ। চিঠিটা তাহা হইলে এ কয়দিন ব্রজলাল আটকাইয়া রাখিয়াছিল। জাহ্নবীর গাটা ঘৃণায় শিরশির করিয়া উঠিল। নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য এরা এতটা নামিতে পারে! কে জানে হয়তো এভাবে নষ্টও হইয়াছে কত চিঠি—এইটেই যে প্রথম তাহার মানে কি?

কিন্তু ঐ পর্যন্তই; সদ্য সদ্য মনটা বিমুখ হইয়া উঠিলেও, এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিল না ব্রজলালকে। একটা এইধরনের অবজ্ঞা তাহার মনে লাগিয়া রহিল যে, পুরুষ—যাহারা অত কদর্য, অত অন্যায় বিনা দ্বিধায় করিতে পারে, এটুকু তাহাদের কাছে অতি সামান্য কথা, দেখিয়া না দেখাই ভালো জাহ্নবীর পক্ষে।

কিন্তু দরখাস্ত দিতে লাগিল—যেন নিজের দুর্বল মনের শাসন হিসেবেই চিঠি আসিতে লাগিল, পাইতেও লাগিল হাতে হাতে, ব্রজলাল আর আটকাইয়া রাখিল না,—কোনও চিঠিতে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আহ্বান, কোনটাতে কাজের জন্যই, লড়াইয়ের বাজারে সব আফিসেই লোকের অভাব; দুএক জায়গা থেকে তাগাদাও আসিল। জাহ্নবী গেল না, শুধু নূতন বিজ্ঞাপন দেখিয়া দরখাস্ত ছাড়িতে লাগিল, মনের দুইটা দিকে যেন অস্পষ্ট কি লইয়া দ্বন্দ্ব চলিতেছে। একসময় নিজেই ক্লান্ত হইয়া এটুকুও ছাড়িয়া দিল।

এদিকে ব্রজলাল যে জাহ্নবীর ভয়েই সুবোধ সুশীল হইয়া পড়িল এমন নয়, তাহার অবসর কোথায় এ সবের জন্য? প্রখর কর্মস্রোতে প্রবল উদ্দীপনায় গা ঢালিয়া দিয়াছে—শুধু কাজ আর টাকা। ব্যাধিগ্রস্ত বিরাট পৃথিবীটা মৃত্যু শয্যায়, লুটিয়া লও তাহার ধন-দৌলত-সম্পত্তি—যে যত পার।...জাহ্নবীর ঐ চিঠিটা আসায়, খেয়ালের বশেই ওটুকু করিয়া বসিল। তাহার পর বর্ষায় সেই মন্দির দ্বিপ্রহর চারিদিকের পৃথিবী থেকে আড়াল করিয়া কয়েকটি স্বপ্ন-মুহূর্তও আনিয়াছিল সেদিন; কিন্তু সে তো স্বপ্নই,

সঙ্গে সঙ্গে তো ভাঙিয়াই গেল, না ভাঙিলে জীবনটা কি হইতে পারিত, অত ভাবিবার ফুরসৎ নাই ব্রজলালের।...পার্টি দেওয়া, পার্টিতে যাওয়া, বড় বড় হোমড়া-চোমড়াদের উপঢৌকন, নূতন নূতন কনট্রাক্ট—দূরে কাছে; ঘোরাঘুরিতে মোটর ক্লান্ত হইয়া পড়ে আজকাল—একটার জায়গায় তিনটা খাটাইতে হইতেছে—কলিকাতা, পানাগড়, রাঁচি; আসামেও কি একটা মহাযজ্ঞের গন্ধ নাকে আসিতেছে—সে নাকি টাকার অন্নসত্র—কি করিয়া এক কোণে একটু জায়গা পাওয়া যায়?

মাঝে মাঝে আসেও শিথিলতা, অবসাদ, হয়তো নিস্পৃহতাই;—মানুষেরই দেহ-মনতো। সেই সব দুর্বল মুহূর্তে বর্ষায়-আড়াল করা দুটি মানুষের দুপুরটুকু দাঁড়ায় বৈকি সামনে আসিয়া। মনে হয় যে অমন করিয়া উচ্ছল হাসি-কৌতুকের মধ্যে নিজকে মুক্ত করিয়া দিতে পারে, সে হয়তো সত্যই এত কঠোর নয়, তাহার আরাধনা হয়তো একদিন হইতে পারে সফল, জীবন হয়তো একটা নূতন সার্থকতার সন্ধান পাইতে পারে। কিন্তু সে ক্ষণিক; সে-শিথিলতায় মনটা নব উদ্যমের জন্য একটু জিরাইয়া লয় মাত্র।

এই সময় দেশের ওপর একটা নূতনতর বিপদ আসিয়া পড়িল। কয়েক মাস থেকেই কাগজগুলা অনুমান করিতেছিল দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। সেটা বাস্তবের রূপে আসিয়া উপস্থিত হইল। যেখানে এপাতায় ওপাতায় অল্প বিস্তর আলোচনা ছিল, সেখানে আর সব খবরকে ঠেলিয়া এই আলোনাই প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। চাল হঠাৎ দুর্মূল্য হইয়া উঠিতেছে—দশ বারো টাকা থেকে পনেরো ষোলয় ঠেকিয়াছিল, দেখিতে দেখিতে কুড়ি বাইশ হইয়া গেল; তাহার পর ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ; পূর্ববঙ্গে জায়গায় জায়গায় আশি টাকা মণে উঠিয়া গেছে।...মানুষ মরিতেছে, মরার চেয়েও যা ভীষণ, যা অমানুষিক—লোকে পুত্র কন্যা বেচিতেছে, স্ত্রী পর্যন্ত; কেহ কেহ বা সব ছাড়িয়া পলাইতেছে।...ছায়াটা যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই তাহার গতিবেগ বাড়িতেছে—দ্বিগুণ, চতুর্গুণ, ততই সে-ছায়া অধিকতর ভয়াবহ রূপ লইয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে।

জাহ্নবী যেন অভিভূত হইয়া পড়িতেছে। নিজের অভিজ্ঞতা আর চিন্তাধারা লইয়া সে এখানে একা; হয়তো সারা পৃথিবীতেই তাহার একটি মাত্র সঙ্গী আছে—ডোরা, তাই কাগজে যাহা পড়ে তাহা লইয়া শুধু নিজের সঙ্গেই আলোচনা করিয়া যেন দিশেহারা হইয়া পড়ে। তবুও তাহার প্রত্যক্ষ নয়, এখানকার চারিদিকের জীবনযাত্রা তো আগেকার মতোই সহজ,—সেই সুসজ্জিত মিলিটারি, ঠিকেদারি কাজের সেই অপ্রতিহত গতি, ফিসফিসানির মতো একবার কানে আসে জিনিসপত্র নাকি মহার্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু আহারে-ব্যসনে তো কোন ত্রুটি দেখে না।

একদিন নিচে ডিক্‌টেশন লইতে গিয়া ব্রজলালকে প্রশ্ন করিল—"কাগজে আজকাল যা' সব বেরুচ্ছে দেখছেন ?"

ব্রজলাল একটু যেন লক্ষ্য করিয়া মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"কি সব ?"

"এই চালের অবস্থা সম্বন্ধে···দুর্ভিক্ষ···"

মিলিটারির সঙ্গে মিশিয়া ব্রজলালের ধরন-ধারন আজকাল সাহেবঘেঁষা হইয়া আসিতেছে, সে সহসা সিগরেটশুদ্ধ বাঁ হাতটা চিতাইয়া বলিল—"ফুঃ, আপনিও এসব ননসেন্স করেন ?—তিলকে তাল করা ছাড়া কাগজগুলোর তো আর কাজ নেই। হ'লে এখানে বাদ থাকতো ? কই, দেখছেন ? এত বড় লড়াইটা যাচ্ছে ওরা কি জিনিসপত্রও একটু মাগ্যি হতে' দেবে না ?···কান দেবেন না ওদের প্রপাগাণ্ডায়।"

হয়তো খানিকটা সত্য ব্রজলালের কথা—চারিদিকেই তো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু কৌতূহল থাকিলেও উত্তরটুকু দিবার ভঙ্গীতে জাহ্নবীর আর কোন প্রশ্ন করিতে কেমন একটা বিতৃষ্ণা ধরিয়া গেল। কাজটুকু লইয়া ওপরে উঠিয়া গেল।

বিকালে আজকাল রোজই বেড়াইতে যায়, এক জায়গায় বসিয়া একটা চিন্তারই ভার অসহ্য হইয়া ওঠে, পাঁচটা জিনিস দেখাশোনার মধ্যে তবু কতকটা হাল্কা মনে হয়। লোকের নজরটাও গা-সওয়া হইয়া গেছে, গ্রাহ্য করে না। তাহা ছাড়া দু'তিনটা ছোটখাট ব্যাপারের পর সমস্ত

এলাকাটায় মিলিটারি আইন খুব কড়া হইয়া গেছে, বেয়াদবির ভয় একেবারেই নাই। অবশ্য ছাউনির ও-দিকটা মাড়ায় না জাহ্নবী। ফিরিয়াও আসে দিনের আলো থাকিতে থাকিতে।

আজ স্টেশনে একটু বিলম্ব হইয়া গেল। একটা মিলিটারি এ্যাম্বুলেন্স ট্রেণ আহত সৈন্যদের লইয়া পশ্চিমের দিকে যাইতেছে; সব ঢাকা ঢোকা, তবু বাহিরের আবরণটা দেখিয়া জাহ্নবী কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল; যখন গাড়িটা ছাড়িয়া গেল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গেছে। একটু চিন্তিতই হইয়া পড়িল, হাঁটিয়া না গিয়া একটা রিক্‌শা ভাড়া করিল।

স্টেশন আর নূতন বসতির মাঝামাঝি খানিকটা জমি পড়িয়া আছে। লোকেরা জঙ্গল কিছু কিছু পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এমন সময় সমর বিভাগের নির্দেশেই আর বাড়ি তোলা বন্ধ হইয়া যায়। রিক্‌শাটা খারাপ, বারদুয়েক চেন খুলিয়া গেল। এই জায়গাটায় যখন পৌঁছিয়াছে, তখন বেশ অন্ধকার। নিষ্প্রদীপের সময়, তায় মিলিটারি এলাকা, শুধু রাস্তাটা দেখাইবার জন্য লম্বা নলের মধ্য দিয়া মাঝে মাঝে এক একটা ক্ষীণ আলোকচক্র। জাহ্নবীর বেশ ভয় করিতে লাগিল।

রাস্তার ধারেই একটা খুব পুরানো অশ্বত্থগাছের গুঁড়ি দাঁড়াইয়া আছে, ডালপালা প্রায় সবই কাটা, মাত্র গোটা চারেক লাগিয়া আছে। জমি থেকে আধ হাতটাক ওপরে কুড়ুলের কোপের একটা লম্বা গভীর ক্ষত, এই অবস্থাতেই এদিকে জঙ্গল কাটা হইয়া যায়। সব মিলাইয়া এমনই একটা বিকট দৃশ্য, অস্বস্তি জাগায় মনে। এইখানে আসিয়া রিক্‌শাওয়ালা হঠাৎ ব্রেক কষিয়া নামিয়া পড়িল। জাহ্নবী বেশ একটু চকিত হইয়া প্রশ্ন করিল—"কি হ'ল?"

"হাওয়া নেই চাকায় মেমসাব।"

জাহ্নবী ভয়ে-রাগে একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিল, বলিল—"এমনি টেনে নিয়ে চলো, নয়তো…"

"দু' মিনিট মেমসাব।"—লোকটা টায়ারগুলা টিপিয়া দেখিয়া পেছনের একটায় হাওয়া দিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

জাহ্নবীর বুকটা ধক্‌ধক্‌ করিতেছে; এসব সত্য, না, ভাঁওতা মাত্র?—এই

যে একটা না একটা ছুতা করিয়া নামা, অন্ধকার বাড়িতে দেওয়া! করিবার কিছু নাই বলিয়াই নিরুপায় ভাবে বসিয়া আছে, এমন সময় হঠাৎ একটা দৃশ্যে—"উঃ মাগো"—বলিয়া একেবারে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। গাছটার আড়াল থেকে জমাট অন্ধকারের মতোই একটা মেয়েছেলের আকৃতি অল্প কুঁজা হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। মাত্র কোমরে এক টুকরা ছেঁড়া কাপড়, মুখটা ঘিরিয়া ঝাঁপা শুকনো একরাশ চুল, চোখ দুইটা ব্ল্যাক-আউটের আলোর মতোই একেবারে ভেতরের দিকে জ্বলিতেছে।

"কি হ'ল মেমসাব?"—বলিয়া রিক্‌শাওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর নিশ্চিন্ত কণ্ঠে একবার—"ওঃ। এই?"—বলিয়া মেয়েছেলেটাকেই প্রশ্ন করিল—"তা, মেমসাব এখন করবেন কি?"

সে ততক্ষণে দু' তিনবার জাহ্নবীর পায়ে হাত দিয়া আরম্ভ করিয়া দিয়াছে —"খেতে দাও—খেতে দাও কিছু—একটা মেয়ে গেছে আজ সকালে—খেতে দাও, দাঁড়াতে পারছি না—কচিটা যাবে এবার—দুধ নেই যে একরত্তি···"

—নিজের শুষ্ক স্তনের একটা টানিয়া ধরিল।

হাঁপানি রোগীর মতো টানা হ্রস্ব কথা, গলা একেবারেই উঠিতেছে না, মাথাটা লুটাইয়া লুটাইয়া পড়িতেছে। হঠাৎ গুঁড়িটার ওদিকে একটা ক্ষীণ শব্দ উঠিল—যেন পাখির বাচ্চার আওয়াজ, কিন্তু বেশি টানা। স্ত্রীলোকটা একটু ঘুরিয়া চাহিয়া বলিল—"ঐঃ, ম'রছে—মেয়েটাও ঐ রকম শব্দ ক'রে···"

জাহ্নবী বিমূঢ় হইয়া বসিয়া আছে, 'মরছে'—বলিতে যেন হঠাৎ তাহার চেতনা হইল, সেই ঝোঁকেই কিছু না বুঝিয়া তাড়াতাড়ি নামিতে যাইতেছিল, স্ত্রীলোকটা দুর্বল হস্তে তাহার আঁচলটা ধরিয়া ফেলিল, বলিল—"আর কি হবে? —গেছে—আওয়াজ নেই—ঐ হয়···আমায় খেতে দাও না···"

ক্ষমতা নাই বলিয়া মৃত্যুটাকে আমল দিল না, কাঁদিল না; কিন্তু আঘাতটাতো লাগিয়াছে ভেতরে ভেতরে?—টলিতেছে; জাহ্নবী তাহাকে তাড়াতাড়ি রিক্‌শার পা'দানিতে বসাইয়া দিল।···একটা মাত্র সতেরো-আঠারো বছরের মেয়ে সে, কিন্তু পৃথিবীটার অনেক কিছুই দেখিয়াছে এর মধ্যে; সেই দেখাটা কাজে আসিল আর একবার। জাহ্নবী সচেতন হইয়া উঠিল।

রিক্‌শাওয়ালাকে প্রশ্ন করিল- তোমায় বিশ্বাস করতে পারি ?—বাড়িতে কে কে আছে ?"

"মা, একটা বুড়ো কাকা, বৌ, দু'টো মেয়ে, একটা "

"হ'য়েছে—মানে দুঃখ বোঝ। এক কাজ করো, রিক্‌শাতেই গিয়ে স্টেশনের কাছের দোকান থেকে যা পাও নিয়ে এস—শীগ্‌গির—আগে দেখবে ভাত, হোটেল আছে, এই নাও।"

একটি টাকা বাহির করিয়া দিল, তাহার পর কি ভাবিয়া আর একটা, রিক্‌শাটা ঘুরিলে প্রশ্ন করিল—"কতক্ষণ লাগবে ?"

"এই···দশ-বিশ মিনিট।"

"আমি বখ্‌শিস দোব, সাহেবকে ব'লেও দেওয়াবো।"

তাহার পর ঠোঁটে আসিলেও যে-কথাটা এতক্ষণ রুখিয়া রাখিয়াছিল, সেটাও বলিয়া ফেলিল—"তোমার সব্বার শপথ রইলো—যাদের যাদের নাম করলে !"

স্ত্রীলোকটি বসিয়া পড়িয়াছে। জাহ্নবী প্রশ্ন করিল—"কি হয়েছে তোমাদের —বাড়ি কোথায় ?

এই সময় স্টেশনের দিক থেকে গোটা দুই মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল, বোধ হয় কোন ট্রেণ আসিয়াছে, তাহার মিলিটারি যাত্রী ছাউনিতে যাইতেছে। জাহ্নবী বলিল—"চলো, গাছের ওদিকে।"

নিজেই তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। তলায়ও ঝোপঝাপ আছে, দুজনে আড়াল হইয়া বসিল। একটা ছেঁড়া কাঁথার উপর একটা শিশু পড়িয়া আছে; কিন্তু মায়ের মতো জাহ্নবীর মনও যেন শক্ত কাঠ হইয়া গেছে, একবার চাহিয়া লইয়া বলিল—"হ্যাঁ, যা জিগ্যেস করছিলাম—দুর্ভিক্ষ নাকি ?···একটু চুপ করো, আগে মোটর ছুটো যাক।"

মোটর চলিয়া গেলে, স্ত্রীলোকটি মাথা তুলাইয়া বলিল—"ছি আকাল···"

"কোথা থেকে আসছ ?···এখানে কেন ?"

"বায়নোন, বদ্ধমান—যাচ্ছি কোলকোতা...পারবনি আর ···"

"একা ?"

"না, এই দুই পাঁচ ঘর।"—হাত তুলিয়া পাঁচটা আঙ্গুল দেখাইল।

"তারা কোথায়?

"এগিয়ে গেল—শুধু আমরা তিন ঘর পারলুম নি—তিন ঘরে এক পাঁচ চার জন ছিনু—ঐ উকে নিয়ে—কিছু খেতে দেবে নি আমায়?—কিচ্ছু?"

"নিয়ে আসছে—এলো বলে।"

"কিচ্ছু দেও, ও আর এসবে নি।"

জাহ্নবী আবার যেন নিজের ওপর সংযম হারাইতেছে; বুঝিতেছে একে বকানো ঠিক হইতেছে না; তবু নিজের উগ্র কৌতুহলটাকে চাপিতে পারিতেছে না। "ও এসবেনি" বলায় আবার সচকিত হইয়া উঠিল। স্ত্রীলোকটি আরও ঝিমাইয়া পড়িতেছে, ঝোঁকের মাথায় সেটা লক্ষ্য করে নাই; একটা কিছু পেটে পড়া দরকার, কিন্তু কি দিবে?

তাহার পর মনে পড়িল স্টেশনের স্টলে চকোলেট কিনিয়াছে. কার্শিয়াংএর একটা পুরানো অভ্যাস। গোটাচার বাহির করিয়া দুইটা হাতে দিয়া বলিল—"আসবে বই কি; ততক্ষণ এই দুটো চিবোও তো. গলাটা একটু ভিজবে।"

খাওয়ার অমন বীভৎস রূপ দেখে নাই কখনও জাহ্নবী—অদ্ভুত চোখের দৃষ্টি—অদ্ভুত চিবানো—দাঁতে সাঁটিয়া যাইতেছে, তাহারই মধ্যে কোন রকমে টানিয়া ছিঁড়িয়া খানিকটা তাড়াতাড়ি পেটে চালান দিতে হইবে।

হাত পাতিল—"আর আছে?—দেও—বেশ।"

জাহ্নবী আর দুইটা দিল। যে ভাতের জন্য মরিতেছে তাহার হাতে চকোলেট দেওয়া—কেমন যেন অদ্ভুত মনে হইতেছে। বোর্ডিঙে থাকিতে একদিন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ফরাসী বিপ্লবের আগের গল্প প্রসঙ্গে এই ধরনের কথা বলিয়াছিলেন—রাজকুমারী প্রাসাদের নিচে ক্ষুধা-বিক্ষুব্ধ জনতা দেখিয়া নার্সকে প্রশ্ন করিল—"ওরা কেন অমন করছে?" উত্তর হইল—"ওদের রুটি নেই, খেতে পায়নি।" রাজকুমারী বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল—"তা রুটি নেই তো কেক্ খায় না কেন?

(If they have no bread, Why can't they eat cakes).

কেক্ উহাদের অভিজাত খাদ্য ; কথাটা নাকি সাহিত্যে-ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া গেছে।

"আর আছে? দেও—দেও।"—শেষ করিয়া আবার হাত পাতিল। খালি পেটে ঠিক হইবে কিনা বুঝিতে না পারিয়া জাহ্নবী বলিল—"না, চারটে ছিল ; ভাত এসে পড়লো বলে···হ্যাঁ, সে ন'জনের আর সব কোথায়?"

"ই বনেই আছে—ইদিকে-সেদিকে।"

"বনে!"—প্রশ্নটা করিয়া এতক্ষণে হুঁস হইল, বলিল—"ঠিক তো, জিগ্যেস করতে ভুলে গেছি—তুমিই বা জঙ্গলের মধ্যে কেন?"

"ভালো জায়গায় ঢুকতে দেয় না—উদিক পানে গেছনু—হাওয়া গাড়ি ক'রে বাইরে দিয়ে এল—আমরা ক'জন আবার ফিরে এনু।"

কী ভয়ঙ্কর! কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল জাহ্নবী ; মুখে কথা যোগাইতেছে না।

"তোমার স্বামী নেই?"

"ছেল, পাল্যেচে।"

"কবে?"

এই সময় রিক্‌শাটা আসিয়া উপস্থিত হইল, কাহাকেও না দেখিয়া ড্রাইভার ঘন্টি বাজাইবার সঙ্গে সঙ্গে জাহ্নবী বাহির হইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল—"পেলে কিছু?"

"হ্যাঁ, ভাত ডাল আর তরকারি।"

একটা শালপাতায় মুড়িয়া নিজের গামছায় বাঁধিয়া আনিয়াছে। জাহ্নবী বলিল—"দুমুঠো খেয়ে নাও, তারপর আমাদের ওখানে চলো···হ্যাঁ, চলো চলো—ও ছেলে আর কি করবে?—ভগবান নিয়েছেন। এই লোকটি ব্যবস্থা ক'রে দেবে'খন, কিছু বখশিস দিয়ে দেব আরও।"

স্ত্রীলোকটি অমন অবস্থাতেও আতঙ্কে সোজা হইয়া বসিল, একটা গ্রাস মুখের কাছে তুলিয়া থামিয়া ব্যাকুল ভাবে বলিল—"না মা, যেতে বলুনি—ওরা দেখে ফেলবে—পারবোনি যেতে—আবার গাড়ি ক'রে ফেলে দিয়ে এসবে—লক্ষ্মী মা আমার, শহরে যেতে বলুনি—তারা দেখে ফেলবে···"

আতঙ্কে এত ক্ষুধার মধ্যেও খাইতে ভুলিয়া গেছে। জাহ্নবী স্থির ভাবে চাহিয়া রহিল, কণ্ঠ স্তব্ধ হইয়া গেছে। মানুষের আতঙ্ক। মানুষের সীমানা থেকে পলাইয়া অরণ্যভূমি আশ্রয় করা—এ সেও বোঝে, সমস্ত বাল্যকালটা এই আতঙ্কে কাটিয়াছে তাহার, একাদিক্রমে সে তিন বৎসর বাহিরের মুখ দেখে নাই। সে, তাহার মা আরও তিন বৎসর—এই অরণ্যেই। সেটা ছিল মানুষের—পুরুষের অন্য একটা বিভীষিকার রূপ, আজ এ অন্য। মানুষ নাকি দেবতার মূর্তিতে গড়া!—বিভীষিকার কত অনন্ত রূপই ধরিতে সক্ষম এই দেবরূপী দানব!

কি রকম ক্লান্তি বোধ হইতেছে, মাথাটা হঠাৎ বারদুয়েক ঘুরিয়া উঠিল, জাহ্নবী চেষ্টা করিয়া সামলাইয়া লইল,—"বেশ তুমি যাও তা'হলে, আমি আবার আসবো, কাছাকাছি থেকো লুকিয়ে।"

ব্লাউসের ভিতর হাত দিয়া দুইটা টাকা তুলিয়া আবার সঙ্গে সঙ্গেই ছাড়িয়া দিল,—অনাথার হাতে টাকা দেখিলে এই রিকৃশাওয়ালাই আবার পশু হইয়া উঠিবে!

পঁয়ত্রিশ

রিকশায় করিয়া জাহ্নবী একেবারে বাড়ির দক্ষিণ দিকটাতেই প্রবেশ করিল, ব্রজলাল যেদিকটায় থাকে। রিকৃশাওয়ালার হাতে ভাড়ার অতিরিক্ত একটা টাকা দিয়া বলিল—"তোমার বখশিস।"

অন্যমনস্ক হইয়া গেট দিয়া আগাইয়া আসিয়াছে, লোকটা একটু পাশে পেছন দিক থেকে ডাকিল,—"হুজুর, মেমসাব!"

জাহ্নবী ফিরিয়া দাঁড়াইতে একটু কাঁচুমাচু করিয়া বলিল—"বলেছিলেন সাহেব বাহাদুরকে দিয়েও বখশিস করাবেন···দাঁড়াচ্ছি।"

জাহ্নবী একটু ভাবিল, তাহার পর বলিল—"আমি দিয়ে দিচ্ছি তাঁর হয়ে। আর দেখ, একটা কাজ করতে পারবে?"

"হুকুম করুন মেমসাব।"

"তোমায় বিশ্বাস করতে পারি বলেই বলছি—এই আর দুটো টাকা, কাল সকালে—মানে, দিনের বেলায় আর কি, যখন তোমার সুবিধে, ঐ মেয়েটিকে কিছু কিনে খাইয়ে দেবে—ভাতই, আর যদি কেউ চোখে পড়ে এই রকম, তাকেও। তারপর আর আমি ব্যবস্থা করছি।"

"দেন হুজুর···কিন্তু···কথা হচ্ছে···", যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও টাকা দুইটা হাত পাতিয়া লইল!

জাহ্নবী প্রশ্ন করিল—"কি?"

"দেব কিনে যদি লুকিয়ে টুকিয়ে থাকে। কথা হচ্ছে মিলিটারিদের মানা হুজুর, ওরা নাকি বলে, দিলে থুলে আরও জুটবে, শহর নোংরা করবে। তা একটা টাকা লেন—আরগুলো কে কোথায় আছে···"

টাকাটা ফিরাইয়া দিতে গিয়া আবার বলিল—"না হয় থাক্, দেখি।"

জাহ্নবী বুঝিল লোভে পড়িয়া গেছে লোকটা, অথচ টাকা দুইটা হাতে লওয়া পর্যন্ত ভালোই ছিল। কিন্তু সেদিকে তেমন মন না দিয়া শুধু বলিল—"হ্যাঁ, দেখো।"

বারান্দায় পা দিতে আফিস ঘরের দিক থেকে হঠাৎ একটা হাসির হর্‌রা উঠিল। তাহা হইলে ব্রজলাল নাই নিশ্চয়। উদ্ধবটা চাকর-বাকরদের সামনে কাহারও নকল করিতেছে। তবু আগাইয়া গিয়া প্রশ্ন করিল—"সাহেব বাড়ি নেই?"

সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল, পাচক বামুনটা বলিল—"আজ্ঞে না।"

"কখন আসবেন?"

"আজ রেতে বাইরেই থাকবেন; কাল দিনমানে তাঁরও পাক করতে বলে গেছেন।"

—

পরদিন ব্রজলাল আফিসে আসামাত্র জাহ্নবী উদ্ধবকে দিয়া একটা কাগজে লিখিয়া পাঠাইল—"আপনার ফুরসৎ আছে কি?—তা'হলে একবার আসি, আমার নিজের একটু কাজ আছে।"

ব্রজলাল উত্তর দিল—"ফুরসৎ আছে কিন্তু একজন পদস্থ মিলিটারি কর্মচারি আসতে পারে যে-কোন সময়েই।"

জাহ্নবী লিখিয়া পাঠাইল—"তা'হলে যদি দয়া করে একবার ওপরে আসতে পারেন, তবে ভালো হয়।

ব্রজলাল আসিয়া সোফাটায় বসিলে বলিল—"আমি কাল থেকে আপনাকে খুঁজছি—একটা কাজ—আপনাকে দিতেই হবে একটু সময়, আপনি ভিন্ন কারুর দ্বারা হবে না।"

এমন জিদ, আবদার আর অনুরোধের সমন্বয় জাহ্নবীর মধ্যে এই প্রথম দেখিল ব্রজলাল, একটু আগ্রহের সহিত কহিল—"বলুন।"

"কি ক'রে যে আরম্ভ করব···কাল দুর্ভিক্ষের চেহারা দেখলাম—নিজের চোখে—এইখানেই।"

আগ্রহটা নিভিয়া গিয়া মুখের চেহারাটা একটু অন্যরকম হইয়া গেল ব্রজলালের, জাহ্নবীর কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নাই। কাল সন্ধ্যায় যাহা যাহা দেখিয়াছে, যাহা যাহা শুনিয়াছে স্ত্রীলোকটির কাছে, সমস্ত বলিয়া গেল; আবেগে, উত্তেজনায় অল্প অল্প কাঁপিতেছে। শেষ হইলে ব্যাকুল মিনতির সহিত বলিল—"আপনি কিছু করুন এদের জন্যে; আমি মেয়েছেলে—নিরুপায়, কি করতে পারি? তবু ইচ্ছে আছে করবার, কিন্তু আপনার সাহায্য না হলে হবে না—আপনিই বলবেন কিভাবে কি করতে হবে।"

ব্রজলাল আশ্চর্যভাবে চাহিয়া আছে, রীতিমতো খোশামোদ! অথচ নিজের উপকারের বিষয় এই মেয়েই বরাবর প্রতিবাদ করিয়া গেছে, ঝগড়া করিয়াছে।

থামিলে শান্ত নিরুদ্বেগকণ্ঠে বলিল—"আপনি বড় চঞ্চল হয়ে পড়েছেন জাহ্নবী দেবী। ওদের তো ব্যবস্থা হচ্ছে, গবর্ণমেণ্টও ব'সে নেই, লোকেরাও ব'সে নেই; রিলিফ দেওয়া হ'চ্ছে, লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে। ওরকম এক আধজন ছটকে যা রয়েছে—ঠিক জায়গায় গিয়ে রিলিফ নেবে না, যেন জোর করে মরবেই···"

জাহ্নবী হাঁ করিয়া শুনিতেছিল, যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না; বাধা দিয়া বলিল—"একি বলছেন আপনি!"

ব্রজলাল একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, বলিল—"না, আমি ঠিক তা বল   যথাসাধ্য করছি আমিও, ডিষ্ট্রিক্ট রিলিফ আফিসে কালও একটা চেক পাঠিয়ে দিলাম।···বলছিলাম যারা এইরকম ছুট্‌কে ছুট্‌কে রয়েছে তাদের আপনি মেয়েছেলে কোথায় খুঁজে খুঁজে বেড়াবেন ?"

"শুনছি কলকাতার রাস্তা ছেয়ে ফেলেছে এই রকম মানুষে।"

"মেনে নিলাম ;—যদিও এটা প্রোপোগাণ্ডা—ঐ বাংলা কাগজগুলোর। বেশ, সত্যি হলেও আমার কথাটাই দাঁড়াচ্ছে না কি ?—কলকাতা হেন জায়গায় আপনি এরকম মরা-আধমরাদের মাঝে দাঁড়িয়ে কি করবেন ?··"

দৃষ্টিতে অসহিষ্ণুতা লক্ষ্য করিয়া থামিয়া গেল। আর তো সে এক বছর আগেকার ব্রজলাল নয়, এখন বহুলোকের সঙ্গে কারবার, উপার্জনের পন্থা খুঁজিতে কত রকমের বাকচাতুর্য আয়ত্ত হইয়া আসিয়াছে, কথা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল—"হয়তো আমার কথাটা ঠিক মতো বুঝছেন না জাহ্নবী দেবী, হয়ত বা আমিই বোঝাতে পারছি না,—দুর্ভিক্ষ যে খানিকটা এসেছে, গবর্ণমেন্ট না-না করলেও দেশের লোক আমরা মানব কেন ? করবই যথাসাধ্য—আমাদেরই দেশ তো ? কিন্তু সাধ্যের অতীত করতে গেলে বিপদই বাড়বে নাকি ?—আরও জটিল হয়ে উঠবে নাকি ব্যাপারটা ? উদাহরণ দিয়েই বলি—জনকয়েক এই জঙ্গলে এসে রয়েছে বললেন না ? বেশ, একেবারে বড় দল হাতে না নিয়ে সেগুলোকে আগে বাঁচাই না, অন্তত চেষ্টা করি না। সংখ্যায় অল্প, সামলাতে পারা যাবে, একটা ট্রেণিংও হবে, আপনি যদি এই নিয়ে কাজ করতে চান।"

মনের দুর্বলতার জন্যই জাহ্নবী এ ভঙ্গী পরিবর্তনটা ধরিতে পারিল না, কৃতার্থ হইয়া বলিল—"সেই ভালো, সত্যি একজনকে দেখেই যেমন দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম···কিন্তু করবেন তো আপনিই সব, আমি নিমিত্ত মাত্র। প্রথমে একজন লোক দিয়ে ওদের খুঁজে পেতে বার করতে হবে।···মানুষ এ কি হয়ে উঠল ব্রজবাবু! তারই জাত বন ছেড়ে তার সামনে আসতে সাহস পায় না !"

ব্রজলাল অনেক চেষ্টায় কোন রকমে একটু হাসিল। জাহ্নবী উদ্দী-

পনার বশেই বলিয়া চলিল—"তা হলে ঐ ন'জনকে খুঁজে-পেতে নিয়ে আসুক...আমাদের বাড়িতেই নিয়ে আসুক, কি বলেন?...না, আপনার দিকটায় নয়, ভেতরে আমাদের দিকটায়।"

ব্রজলাল বেশ সহজভাবে হাসিয়া বলিল—"কেন, এই দিকেই ব্যবস্থা করে দিলে ক্ষতি কি? ওদিকে দিদি অমন অবস্থায় পড়ে রয়েছেন, তার ওপর একপাল...ওরাও রুগী তো, তার ওপর..."

জাহ্নবী উল্লসিত হইয়া উঠিল, তাহার পর কৃতজ্ঞ কণ্ঠে এক সম্পূর্ণ নূতন ধরনের তর্কের ভঙ্গীতে বলিল—"এতও ভুলতে পারেন আপনি!—বললাম, না। মিলিটারির লোকেরা ওদের দেখলেই বাইরে ফেলে দিয়ে আসছে,—আপনার এদিকটা যে একেবারে সদর।"

ব্রজলাল পৌরুষগর্বে ঘাড়টা একটু বাঁকাইল, বলিল—"আমি আশ্রয় দিলে মিলিটারির লোকেরা যে ঘাঁটাতে আসবে না সে জোরটুকুও নেই আমার জাহ্নবী দেবী?"

আজ নারীর মতোই এই পৌরুষটা মানিয়া লইল জাহ্নবী, বরং আশ্রিতা নারীর গৌরবের সঙ্গেই; একটু লজ্জিতভাবে হাসিয়া বলিল—"তাই নাকি আমি বলছি? চোখ বুজে থাকি না তো।...আপনার বাড়ি, আপনি ভেতরে রাখুন তাদের বা এদিকেই ব্যবস্থা করুন, আমার বলবার কি অধিকার?"

এদিকে ব্যস্ততার সময়ই পড়িয়াছে, তাহার ওপর আবার দিন দুই থেকে অতিরিক্ত ব্যস্ত আছে ব্রজলাল, প্রায় মোটরে মোটরেই কাটিতেছে; আজও মাত্র ঘণ্টা দুয়েক আফিস করিয়া নূতন মোটরটা লইয়া বাহির হইয়া গেল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে উদ্ধব ছুটিয়া ওপরে আসিয়া বলিল—"টেলিফোন এসেছে মিস্ সাহেব।"

জাহ্নবী প্রশ্ন করিল—"মজুমদার মশাই কোথায়?

উদ্ধব দক্ষিণ হাতের তেলোয় মাথাটা হেলাইয়া নাসিকা গর্জনের সহিত নিদ্রার অভিনয় করিল।

জাহ্নবী নামিবার পথে তাহার কানটা নাড়িয়া দিয়া নিচে গিয়া রিসিভারটা তুলিয়া লইল, প্রশ্ন করিল—"হ্যালো?"

ইংরাজীতেই কথাবার্তা হইল—"মিস্টার বোস কি আপনি ?"

"না, তিনি বেরিয়ে গেছেন। কি দরকার জানতে পারি কি ?"

"একটা লরি চাই, আমি এখানকার মিলিটারি ক্যাম্প থেকে বলছি। তাঁর অবর্তমানে আপনারা কেউ পাঠাতে পারবেন কি ?"

"পারব।"

"তাহলে অনুগ্রহ ক'রে পাঠিয়ে দিন প্যারেড গ্রাউণ্ডে। ধন্যবাদ।...হ্যাঁ, আর দেখুন···।"

"বলুন, শুনছি।"

"মিস্টার বোস এলে বলে দেবেন বন খুঁজে তাদের ঘিরে একত্র করা হয়েছে, কিন্তু ক্যাম্পের লরি বাইরে, তাদের সরিয়ে ফেলবার উপায় নেই, তাই তাঁকে এইটুকু অসুবিধায় ফেলতে বাধ্য হলাম।······আচ্ছা, ধন্যবাদ।"

মানেটা ঠিক বুঝিতে পারিল না জাহ্নবী। বাহিরে আসিতে মনটা অন্যদিকেও চলিয়া গেল,—দেখে স্প্রিং কপাটের বাহিরেই উদ্ধব একটা মুঠা মুখে আর একটা কানে লাগাইয়া তাহার টেলিফোনে আলাপের নকল করিতেছে। আর একবার কানটা টানিয়া দিয়া দ্রুত বাহিরে গিয়া ড্রাই-ভারকে লরি লইয়া যাইতে বলিল, তাহার পর ওপরে উঠিয়া গেল। আজ আবার ব্রজলাল একেবারে একরাশ জরুরী কাজ দিয়া গেছে।

আফিস থেকে বাহির হইতেই প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। স্টেশনের দিকে যাইবার জন্য একটা আগ্রহ লাগিয়া আছে। ওপর থেকে নামিয়া বারান্দায় আসিয়াছে, কালকের রিকশাওলাটা উঠানে আগাইয়া আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

জাহ্নবী ব্যস্তভাবে আগাইয়া আসিয়া বলিল—"এই যে, দিয়েছিলে কিনে ?—ক'জনকে পেলে ?"

"সকালে মাগীটাকে দিয়েছিলাম দুটি। দুপুরে একবার খুঁজবো—একটু নিরিবিলি থাকে, মিলিটারির নোকেরা গিয়ে বন হাতড়ে সবাইকে ধ'রে নিয়ে গেল হুজুর। আর উদিকে যেতেও পারব না, উদের লজর পড়েচে

—গরীব মানুষ, খেটে খেতে হয়, কাচ্চাবাচ্চা আছে।···এই পয়সা ক'টা হুজুর ; মাগীর জন্য বারো আনার ডালভাত কিনেছিলুম।"

জাহ্নবী নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল কিছুক্ষণ। টেলিফোনের কথাগুলার অর্থ এতক্ষণে উপলব্ধি হইতেছে—লোকটা বলিয়াছিল—"দে হ্যাভ্‌ বীন রাউণ্ডেড্‌ আপ"—বন খুঁজিয়া কাহাদের একত্র করা হইয়াছে—খবরটাই বা কাহার কাছ থেকে পাওয়া কিছুই বুঝিতে আর বাকী রহিল না জাহ্নবীর।

প্রশ্ন করিল—"লরিতে ক'রে নিয়ে গেল, না ?···কি রকম লরিটা ছিল ?"

"দেখিনি হুজুর, শুনলুম লরিতে ক'রেই চাপ্যে নে গেছে, মিলিটিরি ঢুকছে দেখে আর ও-তল্লাটে কে দাঁড়াবে বলুন ? আমি আবার প্রাতঃকালে ভাতটা দিলুম মাগীকে, কে দেখলে না-দেখলে···"

জাহ্নবী খুবই অন্যমনস্কভাবে মন্থর চরণে বাড়ির দিকে ঢুকিল, লোকটা বলিল —"পয়সা ক'টা হুজুর···"

জাহ্নবী দাঁড়াইল, তাহার পর কি মনে হওয়ায় দুই পা আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল—"তুমি সাধু সেজে পয়সাটা দিতে এসেছ হঠাৎ ?"

লোকটা প্রশ্ন শুনিয়া, বিশেষ করিয়া বলিবার কঠিন ভঙ্গীতে হতভম্ব হইয়া বলিল—"আপনি দিলেন হুজুর, বিশ্যেস করে, বেইমানি কি করে করব ? গরীব হই, কিন্তু···"

"মিলিটারিদের ভয়—মিছিমিছি সাধু সাজতে যেয়ো না। থাক্‌, ও টাকাটা আর···তোমাদের হাতে ছোঁওয়া ও-টাকা"—তীব্র ঘৃণায় মুখটা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল ; যেন ভাষার অভাবেই আর কিছু না বলিয়া জাহ্নবী ধীরে ধীরে ভেতরে চলিয়া গেল।

ছত্রিশ

রাগে ক্ষোভে ভিতরটা পুড়িয়া যেন অঙ্গার হইয়া যাইতেছে জাহ্নবীর ; একটা পুরুষকে সামনে পাইয়া ঐটুকু বলিতে পারিয়া তবু একটু শান্তি পাইল। আরও এইজন্য শান্তি পাইল যে লোকটা প্রকৃতই ভালো, সেই জন্য আঘাতটাও

তাহাকে আরও রূঢ় হইয়া লাগিয়া থাকিবে। কিন্তু একটা গরীব রিক্‌শাওলাকে দুটা কথা শুনাইয়া দিবার মূল্যই বা কি? বরং হাস্যকরই ব্যাপার। একসময় জাহ্নবী নিজের কাছেই লজ্জা অনুভব করিল।

একটা কিছু না করিতে পারিলে যেন আর বাঁচা যায় না। বাড়িতে আসিয়া কোন কিছুতেই যেন মন বসাইতে পারিতেছে না, চায়ের কাপটা হাতে লইয়া রকে পায়চারি করিতে লাগিল, সদরের দিকে কান পাতিয়া। কখন ব্রজলালের মোটরের শব্দ হইবে; যখনই আসুক, যে-অবস্থাতেই আসুক, একাই থাক্‌ বা কাহারও সঙ্গে—জাহ্নবী গিয়া আজ শেষ বোঝাপড়া করিবে তাহার সঙ্গে—এই নীচ মিথ্যাচারের জন্য, এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য, এই ধূর্তামির জন্য—এত বড় একটা অন্যায় করিয়া আশ মেটে নাই, আজ স্বভাবতই ওর স্টেশনের দিকে যাইবার উৎকণ্ঠা হইবে জানিয়া অযথা কতকগুলা কাজও চাপাইয়া গেছে!···বাঁ হাতে রেকাবির ওপর চায়ের কাপটা এক একবার কাঁপিয়া যাইতেছে; এক সময়ে অধরে স্পর্শ করিয়া দেখিল একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেছে চা'টুকু, সিকিভাগও পান করা হয় নাই তখন। রেকাবি শুদ্ধ বাটিটা জানালার তাকে রাখিয়া দিল।

সন্ধ্যা উৎরাইয়া গিয়াছিল, ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিল। ব্রজলালের আসার কোন লক্ষণই নাই; যতই না আসিতেছে, আক্রোশটা ততই যেন গুমরিয়া উঠিতেছে ভিতরে ভিতরে; কোন সাড়াশব্দ নাই, তবুও বারদু'য়েক ওদিক থেকে ঘুরিয়া আসিল, আবার সেইভাবে পায়চারি করিতে লাগিল। যেদিন ও কম কথা কয় সেদিন ওর বাড়ির কেউ ওকে প্রশ্নাদি করিতে সাহস করে না। বাড়িটা নিস্তব্ধ; এই সময় প্রায় রোজই অন্নদাঠাকরুণের গায়ে পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে গল্প করে জাহ্নবী, প্রায় সব বইয়ে পড়া গল্প, অম্বিকাচরণ থাকে, নারায়ণীও পাট সারিয়া আসিয়া বসে। আজ শুধু অম্বিকাচরণের আওয়াজ হইতেছে মাঝে মাঝে—শুকনো কাশি, অস্বস্তির মাঝে পড়িলে যাহা ওর একমাত্র সম্বল।

রান্নার হাঙ্গাম বাড়িতে একরকম নাই বলিলেই চলে, ব্রজলালের দিকেই হয় সেটা, তবে অন্নদাঠাকরুণের পথ্যটা নারায়ণীই নিজের হাতে করে,

খানচারেক লুচি, খুব হালকা করিয়া একটু মোহনভোগ, দুধ। এই রকম পায়চারি করিতে করিতে একবার রান্নাঘরের কাছে গিয়া জাহ্নবী বলিল—"মা, আমার জন্তেও এই দিকেই কিছু একটু করে দেবে আজ ?"

নারায়ণী একটু চুপ করিয়া রহিল,—তাহার পর বলিল—"তা না হয় দিলাম কিন্তু হয়েছে কি আজ ?"

"শরীরটা ঠিক নেই।"—বলিয়া জাহ্নবী চলিয়া আসিল।

আহার করা পর্যন্ত ঐটুকুই কথা হইল। আহার করিলও অনেক রাত করিয়া। হয়তো মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল একটা হেস্তনেস্ত না করিয়া করিবেই না আহার, কিন্তু বেশ বোঝা গেল ব্রজলাল আর আসিবে না রাত্রে।

ও-বাড়ির দেয়ালঘড়িতে যখন ঢং করিয়া একটা বাজিল তখনও জাহ্নবী জাগিয়া পড়িয়া আছে বিছানায়। কিন্তু আর পারিল না; অন্তত মাকেও একবার জানানো দরকার কত বড় নীচাশয়ের অন্ন তাহারা খাইতেছে, সেই সঙ্গে তাহার নিজের সঙ্কল্পটাও, না হইলে মনে হইতেছে পাগল হইয়া যাইবে। পাশাপাশি দুইটা ঘরের একটাতে শোয় জাহ্নবী আর অম্বিকাচরণ, একটায় অন্নদাঠাকরুণ আর নারায়ণী। উঠিয়া খুব সন্তর্পণে দরজাটা খুলিয়া জাহ্নবী বাহিরে আসিল। চিন্তা হইল, তোলে কি করিয়া মাকে ? বাহিরের হাওয়া লাগিয়া শরীরটা একটু স্নিগ্ধ বোধ হইল। জাহ্নবী ভাবিল, তাহা হইলে না হয় ঘর-বাহির করিয়া রাতটা কোনরকমে দিক কাটাইয়া, মাকে তুলিতে গেলেই অন্নদাঠাকরুণের নিদ্রা ভাঙিয়া যাইবার বেশি সম্ভাবনা।

একটু পায়চারি করিয়া মাথাটা ঠাণ্ডা করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে রকের উপর দিয়া দক্ষিণদিকে চলিয়া গেল, তাহার পর যেই ঘুরিয়াছে হঠাৎ উঠানের ওধারে নজর পড়িয়া যাওয়ায় মনে হইল পায়ের নখ থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্তটা ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া উঠিয়া পরমুহূর্তেই অসাড় হইয়া গেল।

নিছক ভৌতিক অনুভূতি একটা, এত বড় উৎকট ভয় জাহ্নবী জীবনে কখনও অনুভব করে নাই। জ্যোৎস্নারাত, তবে আকাশে একটা হালকা মেঘের আস্তরণ থাকায় জ্যোৎস্নাটা ম্লান। জাহ্নবী দেখিল সাদা কাপড়-পরা একটি

স্ত্রীলোকের মূর্তি এদিকে পিছন করিয়া সদর দরজা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভয় কিন্তু মুহূর্তমাত্রের, সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া চীৎকার করিতে যাইবে মূর্তি মুখ ঘুরাইয়া তাহাদের ঘরে দিকে চাহিল, সমস্তটা গেলেও জাহ্নবী চিনিল, তাহার মা নারায়ণী!

ভয় গিয়া এবার যে কি অনুভূতি এটা, জাহ্নবী যেন বুঝিয়াই উঠিতে পারিল না; মাঝরাতে সদর দরজার পাশে দাঁড়াইয়া নারায়ণী করে কি!

অর্গলটা খোলাই ছিল, নারায়ণী ভারী দরজার একটা পাল্লা খুব ধীরে ধীরে খুলিয়া চৌকাঠের ওদিকে একটা পা গলাইয়া আবার ঘরের দিকে একবার ফিরিয়া চাহিল, তাহার পর পাল্লাটা তেমনি সন্তর্পণে টানিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

জীবনের সবচেয়ে তীব্র যন্ত্রণার মুহূর্তে জাহ্নবী একদিকে হঠাৎ উগ্রভাবে সচেতন হইয়া উঠিল। দেখিবে; সব কিছুর জন্যই প্রস্তুত হইয়া উঠানে নামিয়া পড়িল। দরজাটা অল্প ফাঁক করিয়া প্রথমেই রাস্তার দিকে দৃষ্টি ফিরাইল, কাহাকেও না দেখিয়া দক্ষিণদিকে চাহিতেই নজর পড়িল নারায়ণী প্রায় শ'খানেক হাত দূরে পুকুরের ধারে ফুলগাছের আড়াল দিয়া হন হন করিয়া চলিয়া যাইতেছে। অন্য সন্দেহ গিয়া আবার আতঙ্ক আসিয়া মনটাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল—আত্মহত্যা নয়তো?

আস্তে আস্তে বাহিরে আসিয়া একটু নিচু হইয়া শানের বেঞ্চটার আড়ালে গিয়া বসিল। উৎকণ্ঠায় গলা শুকাইয়া আসিয়াছে, চীৎকার করিতে পারিতেছে না—এই অদ্ভুত স্তব্ধ রাত্রিটাকে শব্দিত করিয়া তুলিতে এক বিচিত্র ধরণের আশঙ্কাও জাগিতেছে মনে, হয়তো বিমূঢ়তারই একটা অন্যদিক। শুধু যেন সম্মোহিত হইয়া চাহিয়া আছে। নারায়ণী পুকুরের উত্তর কোণ ঘুরিয়া পশ্চিমে কয়েক পা যাইতেই জাহ্নবী সামলাইয়া লইল। বেঞ্চের আড়াল হইতে বাহির হইয়া সামনে অগ্রসর হইল; একটু গিয়া পা চালাইয়া দিল, অনেকটা দূরে চলিয়া গেছে নারায়ণী। জাহ্নবী যখন কোণটা ঘুরিল, নারায়ণী পুকুরের কিনারা ছাড়িয়া উত্তরমুখী হইয়াছে; ওদিকে খানিকটা পোড়ো জমির পর জঙ্গলটা অল্প অল্প করিয়া আরম্ভ হইয়া গেছে। জাহ্নবীও পুকুরের ধারে

না গিয়া সোজা পা বাড়াইল ; আর জোরে হাঁটা নয়, ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে, কয়েক পা যাইতেই পত্রমর্মরে নারায়ণী ফিরিয়া তাকাইল।

দুইজনে মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইল, জাহ্নবীর বুকটা হাপরের মতো ওঠানামা করিতেছে।

নারায়ণীই প্রথমে কথা কহিল,—"তুই,...জেগে ছিলি নাকি ?"

জাহ্নবী ঠিক উত্তর দিল না, তাহার মুখ দিয়াও তাহার মনের সবচেয়ে বড় প্রশ্নটাই বাহির হইল—"কোথায় যাচ্ছ মা ?...এত রাতে...এভাবে ?"

নারায়ণী একটু ভাবিল, তাহার পর বলিল—"চল্, এখানটা বড্ড ফাঁকা। বলব তোকে কোথায় যাচ্ছি, কিন্তু আমায় রুখতে যাসনি জানু, পারবিও না।"

সাঁইত্রিশ

দুইজনে আসিয়া ঘাটের বেঞ্চটাতে বসিল। নারায়ণী প্রশ্ন করিল—"কিন্তু তার আগে আমায় বল্‌তো আজ তোর হয়েছে কি, পড়িয়ে এসে পর্যন্ত যে..."

মাঝপথেই হঠাৎ ও প্রসঙ্গটা ছাড়িয়া দিয়া বলিল—"আচ্ছা ও থাকগে, শুনেই বা হবে কি ?...আজ আমার হঠাৎ মনে পড়ল জানু, আরও একটি মেয়ে আছে, আর তারই এখানে থাকবার কথা, আমাদের চেয়ে তার হক ঢের বেশি।"

জাহ্নবী বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল—"কে মা ?"

"দাঁড়া, আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না।...মেয়েটির কথা হঠাৎ মনে পড়েনি, যেদিন তোর দাদুর সঙ্গে প্রথম দেখা, সেইদিন থেকেই তাদের কথা গেঁথে রয়েছে আমার মনে। শুধু ব্রজর দিক দিয়ে ভেবে দেখলেও যে তাকে এখানে এনে ফেলা দরকার এই কথাটাই হঠাৎ আজ মনে হোল জাহ্নবী, নৈলে আমি যে একদিন বেরুবই এটা আমার অনেকদিন থেকেই এঁচে রাখা ছিল।"

"কিছু বুঝছি না যে মা।"

"বুঝলেও বিশ্বাস করা শক্ত হবে তোর পক্ষে। আমার শুধু বলে যাবার সময়টুকু আছে জানু, তুই শুনে যা। আমি এই বাড়িতে এসেছি পর্যন্ত আমার

মনে একদিক দিয়ে যে কী কষ্ট কী অশান্তি তা এক অন্তর্যামীই জানেন। আজ এই টানা সাত বছর ধরে আমি পাপের বোঝা বইছি, যতই দিন যাচ্ছে তিল তিল করে সে বোঝা বেড়ে যাচ্ছে। ভগবান জানেন কিন্তু মা, আমার শেষ পর্যন্ত প্রবঞ্চনা করবার মতলব ছিল না একেবারেই। শুধু তোর মুখ চেয়ে আমি দিন গুণছিলাম, মনে মনে আমার ঠিক ছিলই যে একদিন-না-একদিন পড়বই বেরিয়ে আমি। তোর মুখ চাওয়াও এই জন্মেই যে একটা যদি হিল্লে না করে যাই তোর, তো আমার মতন তোকেও ভেসে বেড়াতে হবে। মায়ের প্রাণ নিয়ে সেটা কি করে হতে দিতে পারি? কিন্তু নিশ্চয় তার মধ্যেও ছিল পাপ আমার মনে, তাই ভগবানের সইল না, নয়তো একটা রাজকন্মের যা কাম্য, তুই তা হাতের কাছে পেয়েও…"

"মা, ও যে কত নীচ, কত ছোট সেই কথা বলবার জন্মেই আজ…"

নারায়ণী শান্তভাবেই পিঠে হাতটা দিয়া বলিল—"চুপ কর জাহ্নবী; যাবার সময় আর আমার মনটা বিষিয়ে দেবার চেষ্টা করিস নি। আমি তোর মা-ই তো, পুরুষের ওপর তোর যে একটা বিদ্বেষ থেকেই যাবে এটা আমি জানি, শুধু ভাবি বাবাকেও তো দেখলি, বাবাও তো পুরুষ তবু তোর এ-মতি বদলায় না কেন। ব্রজ খারাপ নয় জান্থু, তবে খারাপ হয়তো হ'য়ে যাবে, কেন তা তুইও বুঝছিস আমিও বুঝছি। আশায় এমন করে ছাই পড়লে—ঐ বয়সের একটা ছেলে…"

সহ্য করা কঠিন হইয়া পড়াতেই জাহ্নবী একটু অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলিল—"ওর কথা বাদ দিয়েই বলো মা তুমি।…কাকে আনতে যাচ্ছ—এই এমন করে?"

"হ্যাঁ, কথা বেড়েই যাচ্ছে বটে,—আনতে যাচ্ছি তোর দাদুর নাতনিকে… আর মেয়েকে।"

"সে কি! আর আমরা?"

"কেউ নয় ওঁর।…বড় বিপদেই প'ড়েছিলাম সে-রাতে, তাই ভগবান মুখ তুলে একটু চেয়েছিলেন, নৈলে অমন যোগাযোগ তো হয় না জীবনে; ওটুকু দয়া তাঁর না হলে সেদিন যে কোথায় ভেসে যেতাম ভেবেও কুলকিনারা পাই না জান্থু। কিন্তু খুব তার প্রতিদান দিচ্ছি। সত্যি বলছি তোকে, এই সাত

বছর ধরে যখনই বাবা আমায় 'বন্দী' বলে ডেকেছেন, তোকে নাতনি বলে আদর করেছেন, আমার বুক ফেটে গেছে জান্থু। অন্ধ মানুষ, দেখতে পাচ্ছেন না; কথায় বিশ্বাস করে গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সাত বছর আগে হারানো মেয়ে-নাতনির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে আরও সাতটা বছর এইভাবে কাটানো কী বুক-ভাঙা এক কাণ্ড বলতো জাহ্নবী, এ পাপের আমার প্রাশ্চিত্তির আছে?

জাহ্নবী একেবারে অন্যমনস্ক হইয়া গেছে, প্রশ্নে একটু চকিত হইয়া বলিল—অ্যাঁ, দাদুর কথা বলছ?"

নারায়ণীও যেন নিজের ঘোরেই বলিয়া চলিল—হ্যাঁ, একে এই পাপই অসহ্য হয়ে উঠেছে তার ওপর এল ব্রজর ওপর এই অন্যায়। তুই ব্যাজার হচ্ছিস, তবু আমার তো এই শেষবার বলা, বলে নিতেই হবে।

ব্রজ আমাদের জন্য যা করেছে অতি বড় আপন জনও তা সব সময়ে করে না। এতো প্রমাণ দিয়ে বলতে হবে না, নিত্য-নিত্যই দেখছি আমরা। আমাদের খাওয়া পরা মানইজ্জৎ সবই ও নিজের করে নিয়েছে। প্রথমবারে বাবাকে না পেলে আমরা ভেসে যেতাম, এই দ্বিতীয়বারে ব্রজ না এসে পৌঁছুলেও আমাদের সেই অবস্থাই হোত। আর সবই ছেড়ে দে, শুধু যদি পিসিমাকে হারাতে হোত তো আমাদের দশাটা আজ কি হোত ভেবে দেখ একবার; আর এটাতো অস্বীকার করতে পারবি না যে ও না এসে পড়লে হারাতেই হোত পিসিমাকে। তুই বলবি—বাড়ি দখল করেছে। আমি আশ্চর্য হই পিসিমা যে পিসিমা তাঁরও এ ধারনাটা গেল, কিন্তু তোর মন থেকে মিটল না; আর আমার মনে হয় তোর যত আক্রোশ তার জড় ঐখানে। মা হয়েও আজ আমার বলতে হোল জান্থু, আমাদের দিক থেকে সবচেয়ে যা ভয়ের, যার জন্যে আমার সারাটা জন্ম ওদিকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে, ব্রজর মধ্যে তার কিছু না চিনি চোখের দৃষ্টিটা চিনি জান্থু, আজ আমার জিভে বাধলে চলবে না বলেই বলছি, আমার মেয়েকে নিয়ে যে ওর দৃষ্টিতে পাপ নেই এটা আমি তোকে দিব্যি ক'রেই বলতে পারি। আমার মেয়ে, আমায় তো চোখ খুলেই রাখতে হ'য়েছে অষ্টপ্রহর এই একটা বছর। ও কি চায় জানি কিন্তু সেই সঙ্গে এও জানি ও কিভাবে চায় সেটা।"

জাহ্নবী আবার ব্যথিত দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"মা !…"

নারায়ণী স্নেহভরেই দৃষ্টি নত করিয়া বলিল—"না মা, আমি আর কিছুই তোকে বলছি না। যেদিন থেকে বুঝলাম ও হবার নয় সেদিন থেকে তোকে তো বলিও নি আর কিছু। তবে বুঝেছি অন্যায় হচ্ছে, যা ক'রেই হোক আমাদের হোতেই ব্রজর জীবনটা নষ্ট হচ্ছে। তাই বেরিয়েছি; বাবার উপর অন্যায়, তার ওপর এই অন্যায়—এ দুটো অন্যায়ের চাপ আমার আর সইছে না জাহ্নু, একে তো কত পাপই না ক'রেছিলাম আর জন্মে যার জন্যে…"

এতক্ষণ একটানা বেশ বলিয়া আসিতেছিল, এইটুকু বলিতে গলাটা হঠাৎ ধরিয়া আসায় নারায়ণী চুপ করিয়া গেল।

নিস্তব্ধ শেষ-যাম রাত্রি, আকাশের সেই তরল মেঘাবরণ একটু গাঢ় হইয়া জ্যোৎস্নাটাকে আরও মলিন করিয়া তুলিয়াছে। এই বিষণ্ণ শান্তির মধ্যে অপরিসীম একটা বিক্ষোভের ঝড় বুকে লইয়া জাহ্নবী মৌনভাবে সামনে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তাহার জীবন, আজ সমস্ত দিনের অভিজ্ঞতা, তাহার পর রাত্রির এই রূপকথা যাহা সমস্ত জীবনটাকেই অর্থহীন, অবলম্বনহীন, শূন্যময় করিয়া দিল—সব মিলিয়া মনে একটা অদ্ভুত অসাড়তা আনিয়া দিয়াছে; চিন্তাটা যে কোথায় আরম্ভ করিবে, কি প্রশ্ন দিয়া আবার প্রসঙ্গটা তুলিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। কিন্তু অভিভূত হইতে দেয় না নিজেকে। ক্রমাগত একটার পর একটা সমস্যার মাঝখানে পড়িয়া এইটাই ওর চরিত্রগত হইয়া পড়িয়াছে। বরং গল্পটা শোনার মাঝে যেটুকু ভাবাবেশ আসিয়া পড়িয়াছিল, সেইটুকুও নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিল মন থেকে; যাহা শুনিল, যাহা বলিবার, চেষ্টা করিয়া সব একটার পর একটা গুছাইয়া লইল, তাহার পর প্রশ্ন করিল—"কিন্তু মা, আমরা কে? এমন অদ্ভুত মিলই বা কি ক'রে হোল দাদুর মেয়ে নাতনির সঙ্গে?"

"মিলটা নেহাৎই ভগবানের দয়া জাহ্নবী আগেই বলেছি তোকে; সেদিনের সবটুকুই দয়া তাঁর, ঐ গাড়িতে আমি উঠব, ঐ গাড়িতে বাবা তাঁর মেয়ের কথা বলে ভিক্ষে করবেন,—তাঁর দয়া না হ'লে কি করে এটা হয় মা? তবে মিল কি সত্যিই এতটা? অন্তত তোর বয়স নিয়ে একটু গোল বেধেছিল,

তারপর আমাদের চেহারা নিয়েও নিশ্চয়ই আছে গরমিল, সব খুঁত কিন্তু ঢেকে গেল চোখ নেই ব'লে বাবার। এও ভাবি আমাদের বাঁচাবেন বলেই যেন ভগবান আগে থাকতে বাবাকে মেরে রেখেছিলেন অমন দেবতুল্যি মানুষ!···আরও অমিল আছে জাহ্নবী, বাবার মেয়ে এয়োস্ত্রী, স্বামী সন্নিসী হয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, আমি বিধবা···"

"তাহ'লে আমি মা!"—উগ্র আতঙ্কে জাহ্নবী মাকে জড়াইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল,—যেন কী শুনিবে, কত বড় বাজ মাথার ওপর ভাঙিয়া পড়িবে এখনই!

নারায়ণী বাঁ হাতে কন্যাকে জড়াইয়া নিবিড় স্নেহে বুকে চাপিয়া ধরিল, বলিল—"ভয় নেই মা, তোকে কোলে নিয়েই আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম বেরুতে হয়েছিল—এর বেশি তোর জানবার দরকার নেই, মানুষের ওপর মন তোর আরও বিষিয়ে যাবে তা'হলে। তারপর থেকে আমি কি করে নিজেকে বাঁচিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি তুই জানিস, আর সেইটেই তোর মায়ের আসল পরিচয় জাহ্নবী। যাক, এটাও ছিল আমার একটা পাপের বোঝা মা, এই কপালের সিঁদুর, আমি এ বোঝাও আজ নামিয়ে দিয়ে তবে বেরিয়েছি, এই দেখ আমার কপাল।"

চিন্তার আবর্ত উঠিয়াছে জাহ্নবীর মনে, চেষ্টা সত্ত্বেও অভিভূত হইয়া পড়িতেছে, এক রাত্রে একসঙ্গে কতজনকে হারাইল! পিতা একজন ছিলেন স্বপ্নে, সে-স্বপ্নও মায়ের ললাট থেকে গেল মুছিয়া।

গেল যাক, জাহ্নবীকে আবার বাস্তবের মুখোমুখি হইয়া জাগিয়া উঠিবার শক্তি দাও হে ভগবান!···একটি প্রার্থনা, একটি সংকল্প লইয়া জাহ্নবী নির্বিকার নৈশ আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। এত কথার মধ্যে শুধু একটা জিনিস ওর মনে দাগ কাটিয়া বসিয়া গেছে—নারীর বৈধরূপ—পুরুষের সমাজে; এতদিন এমন প্রত্যক্ষ মূর্তিতে এটা চোখে পড়ে নাই তো! একটা যেন নূতন আবিষ্কার আবার।

নিঃশব্দ প্রহর বহিয়া চলিয়াছে। এক সময় জাহ্নবী মায়ের আলিঙ্গন থেকে বাহির হইয়া আসিল, বলিল—"তুমিও যেমন আমায় বাধা দাওনি মা,

আমিও দোব না; আর কিছু না হোক, দাদুর মুখ চেয়েও। কিন্তু যাবে কোথায়? কার কাছে? একটা বোধ হয় ভুল করছ মা—এই যে যোগাযোগ ভগবান ঘটিয়ে দিয়েছিলেন, দাদুর মধ্যে দিয়ে, এ জিনিস কি দুবার আসে জীবনে? অথচ ঐটেই যেন তোমার ভরসা,—খুঁজতে খুঁজতে এমনি করে তাঁদেরও যাবে পেয়ে নয় কি? বলনা।"

নারায়ণী উত্তর করিল—"সে আশাও যে নেই তা বলব না জাহ্নু; তবে আমি খুঁজব। আমার একটা বিপদ কেটে গেছে মা, রূপ—মস্ত বড় একটা বাধা পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন ভগবান, আমি নিশ্চিন্দি হ'য়ে খুঁজে বেড়াব তোর দাদুর মতোন..."

"ওঁর সাত বছর লেগেছিল, তার পরেও যা পেলেন তা ফাঁকি।"

"তা আর বুঝি না?—ফাঁকি তো আমিই দিলাম। কিন্তু এ ভিন্ন উপায় নেই মা, অনেক ভেবে দেখেছি। অবিশ্যি ব্রজর যে কিছু ক'রতে পারব ভরসা নেই—কি ভাবে আছে সে-মেয়ে, আছে কিনা—থাকলে কতদিন লাগবে..."

"আমি বলছিলাম মা..."

নারায়ণী ব্যগ্র মিনতিতে চাহিয়া বলিল—"না মা, আর পেছু ডাকিস নি জাহ্নবী, তোর দাদুর কথা ভেবেও।"

নারায়ণী উঠিয়া দাঁড়াইল। জাহ্নবীও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া তাহার আঁচল ধরিল, কহিল—"পেছু আমি ডাকছি না মা, শুধু বলছি উপায় একটা যদি ভালো থাকে এর চেয়ে..."

কথাটা শেষ করিবার আগেই জাহ্নবীর দৃষ্টি বাড়ির দরজায় নিবদ্ধ হইয়া গেল, শিশুর মতোই উৎকট ভয়ে নারায়ণীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, —"মা, ওকি!"

আজ ভূত দেখিবার পালা জাহ্নবীর; দরজার পাল্লা দুইটা অল্প ঠেলিয়া সেই অবকাশ পথে সমস্ত শরীরটা চাপিয়া একটা স্ত্রীমূর্তি—কঙ্কাল মূর্তি বলা ঠিক —জলন্ত ভাঁটার মতন দুইটা চক্ষু দিয়া অপলক দৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিয়া আছে।...চিনিতে অবশ্য দেরি হইল না, "পিসিমা!"—বলিয়া নারায়ণী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গেল, জাহ্নবীও সঙ্গে গিয়া দাঁড়াইল।

"কি ক'রছিস তোরা ?…মায়ে…ঝিয়ে এখানে…এত রাত্তিরে !"—অন্নদা-ঠাকরুণ কথা কহিল যেন বুকের মধ্যে কোথাও। গলা একেবারে বসিয়া গেছে, হাঁপাইতেছে, বলার চেষ্টাতে চোখ ঠেলিয়া ঠেলিয়া আসিতেছে, ঠোঁট দুইটা ফাঁক হইয়া গিয়া জিভটা একটু ঝুলিয়া পড়িয়াছে। হাত দুইটা আলগা হইয়া টলিয়া পড়িয়া যাইতেছিল, দুইজনে ধরিয়া ফেলিল, গায়ের উত্তাপ অনুভব করিয়াই নারায়ণী কপালে হাত দিয়া বলিয়া উঠিল—"গা যে পুড়ে যাচ্ছে তাতে পিসিমা ! এ কি, কখন উঠলে ? নামতে গেলে কেন ?"

অন্নদাঠাকরুণের সেই মনের রোগ—সুন্দরী ভাইঝি আর নাতনির রূপের আতঙ্ক। আজকাল অন্ন চিন্তা গেছে, বাড়ির চিন্তা আপনি না যাক্ তাড়াইয়াছে মন থেকে, এখন একমাত্র চিন্তা নারায়ণী আর তাহার মেয়ের রূপ। এই ওর মনের উপজীব্য এখন। রাত্রে এই চিন্তা লইয়া নিদ্রা যায়, ঘুম ভাঙিয়া গেলে ঘাড় তুলিয়া দেখে, হাত বুলায়—আছে তো নারায়ণী যথাস্থানে ?…এক একদিন ডাকিয়া তোলে, বলে—"দেখতো, ও-ঘরে জাম্নু যেন ডাকলে—হয়তো আমারই ভুল, তবু দেখ একবার…"

—খবর লয় আছে কি না।

আজ দেখিল নারায়ণী নাই। একটু অপেক্ষা করিল, নারায়ণী না ফেরায় উঠিয়া বসিল। উগ্র কৌতূহলে একটা অদ্ভুত উৎসাহ আসিয়া গেছে মনে, বিকৃত মনে একটা যেন বিকৃত উল্লাসই, কেননা সন্দেহ ফলিয়া যাওয়াও তো একটা সফলতাই নিজের, তা সে যে-সন্দেহই হোক না কেন।…আরও একটু বসিল, শরীরটা কাঁপিতেছে, তাহার পর চৌকি হইতে নামিয়া সোজা দরজার কাছে গেল। একটু দাঁড়াইতে হইল, শরীরটা আরও কাঁপিতেছে, গাটাও একটু একটু সির সির করিতেছে। কিন্তু পায়ে যেন সমস্ত শরীরের জোর গিয়া নামিয়াছে। ভেজানো দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিল, পাশেই অম্বিকাচরণের ঘর, দুয়ারে হাত দিতেই অমনি খুলিয়া গেল। একটু থামিল অন্নদাঠাকরুণ, কিন্তু কি ভাবিয়া আর প্রবেশ করিল না, ডাকিলও না কাহাকেও, হয়তো একটা কথা ছাড়িয়া আর কিছু ভাবিবার শক্তিও হারাইয়া ফেলিতেছে ; এদিকে যেমন শুধু আছে চলার শক্তিটা। খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল—রান্নাঘর, তাহার পাশের

ঘর, ওদিকে ছোট দেয়ালটার আড়াল ; এদিকে আসিয়া উঠানে নামিল, দুইটা বাড়ির মাঝখানে সেই টিনের দেয়াল—আগাগোড়া দেখিয়া গেল ; কোথায় একটা ফুলগাছের ঝোপ আছে—দুইটা বাড়ির মাঝের সেই গলিটা—নিশিতে পাওয়ার মতো করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—দেয়াল ধরিয়া ধরিয়া মাঝে মাঝে বসিয়াও পড়িতেছে, শরীরটা ক্রমেই অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, তাহার পর আবার মনে পড়িতেছে দেরি করিলে চলিবে না—কোথায় গেল, নারায়ণী ?—হয়তো মায়ে-ঝিয়েই !...

প্রায় ঘণ্টাখানেক এইভাবে বাড়িটার মধ্যে ঘুরিয়াছে অন্নদাঠাকরুণ, এক চলার তাগিদ আর খোঁজার তাগিদ ছাড়া কিছুর চেতনা যেন আর নাই, তাও কি জন্য চলা আর কি খোঁজা সেটুকুও মন থেকে মুছিয়া যাইতেছে মাঝে মাঝে। তাহার পর এক সময় হঠাৎ বাহিরের কথা মনে পড়িয়া গেল, উঠিয়া বসিয়া, দেয়াল ধরিয়া অন্নদাঠাকরুণ সদর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল, সেইখান থেকে শানের বেঞ্চে দুজনকে দেখিয়া সমস্ত স্মৃতি আবার জোয়ারের বেগে আসিয়া পড়িয়াছে।...কিন্তু তখন দেহের শক্তিতে একেবারেই ভাঁটা, পা ওঠে না, কণ্ঠে স্বর নাই ; মনের সমস্ত আবেগ দুটি চোখে জড়ো করিয়া, প্রাণপণে দরজার দুইটা পাল্লা চাপিয়া ধরিয়া অন্নদাঠাকরুণ পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

স্মৃতিচৈতন্যেরও এই ছিল শেষ বিকাশ, মায়ে-ঝিয়ে তাহাকে অচৈতন্য অবস্থাতেই লইয়া গিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। জাহ্নবীই ছুটিয়া গিয়া ব্রজলালকে তাহার ঘর থেকে ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার আসিল, মৃত্যুর সঙ্গে যুঝিবার সব আয়োজনই হইল জড়ো, সকলেই করিল প্রাণপণ ; কিন্তু অন্নদা-ঠাকরুণের চৈতন্য আর ফিরিয়া আসিল না। দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হইয়া গেল।

আটত্রিশ

জীবন আবার পূর্বের মতোই বহিয়া চলিল।

অন্নদাঠাকরুণের অবর্তমানে নারায়ণীর আর বাহিরে পা বাড়ানো চলিল না। জাহ্নবীরও ব্রজলালের গতিবিধির সমালোচনা বন্ধ রাখিতে হইল আপাতত; অন্তত প্রকাশ্যে। "ও যে কত নীচ তুমি জান না মা"—বলিয়া যে প্রসঙ্গটা আরম্ভ করিয়াছিল সেটা আর উত্থাপন করা চলিল না। মায়ের কাছে নিজেদের জীবনের ইতিবৃত্ত শুনিয়া জাহ্নবী হঠাৎ যেন একটি নূতন জগতের সামনে আসিয়া পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে, অন্নদাঠাকরুণও সঙ্গে সঙ্গে অপসৃত হওয়ায় আরও যেন অসহায় হইয়া পড়িল, এ অবস্থায় ভালো হোক মন্দ হোক সেই পুরাণোকেই জড়াইয়া থাকা ভিন্ন উপায় রহিল না। এও বুঝিল যে অন্নদাঠাকরুণের মৃত্যুতে নারায়ণী যে সঙ্কল্পটা আপাতত পরিহার করিল তাহার নিকট নূতন করিয়া অল্প কিছু আঘাত পাইলেই সেটা আবার জাগিয়া উঠিবে। কিছু প্রকাশ না করিয়া মনে মনেই এ যেন মায়ে-ঝিয়ে একটা রফা হইয়া রহিল।...একদিক দিয়া দেখিতে গেলে, অম্বিকাচরণ যে ওর নিজের মাতামহ নয় এই ব্যাপারটুকু ওদের সমস্ত জীবনটাকে আপাতত নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিল।

শোকটাও বড় কঠিন হইয়া লাগিয়াছে। কেহ না হইয়াও অন্নদাঠাকরুণ যে কত বড় আত্মীয় ছিল, রোগশয্যালগ্ন হইয়াও যে কত বড় অবলম্বন, অভাবের মধ্যে সেটা আরও ভালো করিয়া বুঝিল দুজনে। এই গভীর শোকের পাশে বড় সঙ্কল্পই, উদার সব পরিকল্পনাই যেন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইতে লাগিল—উভয়েরই।

এ ছাড়া আছে অম্বিকাচরণ; কি যে একটা করুণ দৃশ্য চাহিয়া দেখা যায় না। দিদিকে আগলাইয়া বসিয়াছিল, এখন যেন অভ্যাসের বশেই চৌকির সেই জায়গাটিতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে; কাজের মধ্যে ঘোরাফেরা করিতে করিতে নারায়ণী হয়তো শোনে একটি গাঢ় দীর্ঘশ্বাস পড়িল; কি করিবে, কি বলিয়া মনটা অন্তদিকে লইয়া যাইবে যেন নিজেই বুঝিতে পারে না।

একদিন জাহ্নবী আফিস থেকে আসিয়া নিজের ঘরে যাইবার পথে দরজা দিয়া দেখিল, অন্নদাঠাকরুণ যেখানটায় শুইয়া থাকিত, অম্বিকাচরণ, হাত দিয়া আস্তে আস্তে সেই জায়গাটা অনুভব করিতেছে। মনে হইল বসিয়া বসিয়া হয়তো তন্দ্রার ঘোর আসিয়া গিয়াছিল, হয়তো অর্দ্ধস্ফুট একটা স্বপ্ন মনের ওপর ছায়া বুলাইয়া গিয়াছে, দিদি যে নাই এটাতে একটা ক্ষণিক সন্দেহ আসিয়া গেছে। আগাইয়া গিয়া অনুযোগের কণ্ঠে বলিল—"তোমায় একটু বাইরে গিয়ে বসতে বলি দাদু—পুকুর ধারটায় বেশ ঠাণ্ডা এখন···বিছানায় হাত বুলোলে ফিরবে দিদিমণি?"

অম্বিকাচরণ অপ্রতিভভাবে হাতড়াইয়া নামিয়া পড়িল চৌকি থেকে, যেন কত বড় একটা গোপন অপরাধ ধরা পড়িয়া গেছে; একটু হাসিয়া বলিল "দেখো!···হাত বুলুচ্ছিলাম কে বল্লে?···দেখছিলাম সোজা ঐ দিক দিয়েই যদি নেমে যাই···"

এই সব মর্মন্তুদ দুঃখের কাছে স্ত্রী-পুরুষগত, সমাজগত বড় বড় সমস্যাগুলা নিতান্তই ক্ষুদ্র, নিতান্তই অবান্তর বলিয়া মনে হয়; বাড়ির চতুঃসীমা ছাড়িয়া মনটা আর বাহির হইতে চাহে না।

কিন্তু শোকও তো স্থায়ী নয়, কুয়াশার মতো এক সময় জীবনকে আচ্ছন্ন, অবসাদগ্রস্ত করিয়া রাখিয়া আবার ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল,—একটা ক্ষণিক অস্বচ্ছতার পর বোধ হয় আরও বেশি করিয়া স্পষ্ট। সর্বপ্রথমে দৃষ্টি গেল অম্বিকাচরণের দিকেই,—তাহার মেয়ে নাতনিকে আনিয়া দিতে হইবে। এও বড় মর্মান্তিক, বড়ই কঠিন, একেবারে নিজের মর্ম ছেঁড়াই তো; আত্মহত্যা! কি ক্ষতি? এই চলুক না; মিথ্যা সম্বন্ধ তো সত্যের আসনেই প্রতিষ্ঠিত এখন, কাজ কি তাহাকে সেখান থেকে টানিয়া নামাইয়া? তা' ভিন্ন যদি পাওয়াই যায় তাহাদের তো তাহার প্রভাব অম্বিকাচরণের মনের উপর কি রকম হইবে,—এই একদিকে পাওয়া একদিকে হারাণো; এই হরিষে-বিষাদ।

কিন্তু এসব চিন্তার মধ্যেও স্বার্থের গন্ধ আছে। জাহ্নবীর মন তাহার ঊর্ধ্বেই, ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা উপায় বাহির করিল—

ইংরাজী-বাংলা কয়েকখানি নামকরা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছিল ; পোষ্ট বাক্স দিয়া, অর্থাৎ ঠিকানাটা গোপন রাখিয়া। একটা পুরস্কারও ঘোষণা করিয়া দিল, মা ও মেয়ের যদি কাগজের সঙ্গে যোগসূত্র না থাকে তো অপরের চোখে পড়িলেও সন্ধান দিবে। অবশ্য এসব নিতান্তই যোগাযোগের কথা। দু'দিনেও হইতে পারে, দু'বছরেও, আবার হয়তো সারা জীবনেও নয়। কিন্তু অম্বিকাচরণের মতো পথে ঘাটে খুঁজিয়া বেড়াইবার চেয়ে তো ভালো উপায়, নারায়ণীর পক্ষে যাহা আরও শক্ত, আরও বিপদসঙ্কুলই হইয়া উঠিত।

নারায়ণীকে বলিল কথাটা। সে যে খুব উৎসাহিত হইল এমন মনে হইল না, সবতাতেই নিরাশ হইয়া কেমন একটা অবসাদ আসিয়া গেছে জীবনে, বলিল—"ও পাপ আমার ঘাড় থেকে নামবার নয় জাহ্নবী, তা' না হলে পিসিমা এমন কোরে হঠাৎ মারা যেতেন না। তবু দেখ্ চেষ্টা ক'রে, আমার মেয়ে বলতেও তুই, ছেলে বলতেও তুই, মায়ের দায় তোকেই তো তুলে নিতে হবে ?"

ইতিমধ্যে দুইটা জিনিস হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে—দুর্ভিক্ষ আর ব্রজলালের কারবার। দুইটার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, তবু এমন হাত ধরাধরি করিয়া তালে তাল দিয়া চলিয়াছে যে জাহ্নবীর মনে হয় বাহ্যিক না হোক আত্মিক একটা যোগ আছেই দুইটাতে—এই দুর্ভিক্ষ আর কারবারে, ব্রজলালের কারবারটা যাহার নিদর্শন। যেদিন কাগজে পড়িল প্রায় ত্রিশ লক্ষ মানুষ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে, তাহার দু'একদিন এদিকে ওদিকে চালের গুদাম তৈয়ার করিয়া দিবার হাজার ত্রিশের কাজটা পাইয়া গেল ব্রজলাল। কাজ বাড়ার জন্যই যেদিন সকালে ব্রজলালের নূতন কেনা লরি দুইটা আসিল, সেইদিনই বিকালের কাগজে জাহ্নবী পড়িল একটি পুরুষ শিশু-কন্যা কোলে লইয়া একটা মিলিটারি খাদ্য-সরবরাহ ট্রাকের সামনে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ দিয়াছে। এই রকম সব মাঝে মাঝে এক একটা মিল—যুক্তিগত কার্যকারণ সম্বন্ধ কিছুই নাই, তবু একটা অশুভ সাদৃশ্য যেন কোথায় আছেই, মনটা ছ্যাৎ ছ্যাৎ করিয়া ওঠে।

তবে ছুর্ভিক্ষের জন্ম নিজে আর কিছু করে না, প্রথম ঝোঁকেই যা' দু' এক জায়গায় কিছু পাঠাইয়া দিয়াছিল, সেই পর্যন্ত। এখন শুধু পড়েই, চোখ চাহিয়া দেখে, তাহার পর চুপ করিয়া থাকে আর ভাবে। কিছু করে না তাহার কারণ এই বিপুল সঙ্কটের সামনে এক নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করা ভিন্ন আর সবই যেন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, হাস্যকর বলিয়া মনে হয়। তাহা যখন হইবার নয়, তখন থাক্। একটা নিরুদ্ধ অভিমানও আছে, অবস্থার ওপর, মায়ের ওপর, দাদুর ওপর, দিদিমণির ওপর—কাহার ওপর নয়? এদের পর যাহার সঙ্গে সম্বন্ধ অর্থাৎ ব্রজলাল, তাহার ওপর আছে ঘৃণা শুধু; আর প্রকাশ করিবার উপায় নাই বলিয়া ক্রমেই সেটা অন্তর্গূঢ় হইয়া উঠিতেছে, ব্রজলালের সর্বাঙ্গ উপচাইয়া অন্য সব পুরুষের ওপর গিয়া পড়িতেছে—এরা কী! নরভুক!—তাহাদের চেয়েও অমানুষ—ভিক্ষা পর্যন্ত করিতে দিবে না—নিজের গাড়ি দিয়া মরণের একেবারে দোর-গোড়ায় বসাইয়া আসিবে।

ব্রজলালও একদিন আবার ওপরে আসিল এই সময়, অন্নদাঠাকরুণের মৃত্যুর প্রায় মাসখানেক পরের কথা। এবার আর চিঠি দিয়া নয়, তবে ঘরে প্রবেশ করিবার আগে সিঁড়ি থেকেই প্রশ্ন করিল—"ভিতরে আসতে পারি জাহ্নবী দেবী?"

মিলিটারী একটা বড় সাহেব এখানকার ছাউনিতেই মারা যাওয়ায় আফিস সকাল সকাল ছুটি হইয়া গেল। জাহ্নবীর কিছু কাজ বাকি পড়িয়া গিয়াছিল, সেইগুলাই সারিয়া লইবে বলিয়া কাগজপত্র গুছাইতে ছিল, একটু বিমূঢ়-ভাবেই চোখের কোণে চাহিয়া বলিল—আসুন।...ডাকলেও তো পারতেন, কষ্ট না ক'রে..."

আর কিছু না বলিবার কঠিন সঙ্কল্প করিয়াই যেন আবার নিজের কাজে মন দিল। একটু বাঁধ ভাঙিলে আর সামলাইতে পারিবে না নিজেকে। ব্রজলাল আসিয়া সোফাটায় গা এলাইয়া বসিল, সামনের চুলের গুচ্ছ মুঠায় খামচাইয়া ধরিয়া বলিল—"কোন কাজ নেই, শুধু বড্ড টায়ার্ড, সিম্‌প্লি!...মাথাটা যেন ঘুরছে। আপনার ঘরে একটু যদি বসতে দেন, নিচে থাকলেই আবার..."

জাহ্নবী বেশ সংযত হইয়া গেছে, অন্তরটাকে বাহির থেকে দূরে সরাইয়া দিয়াছে, একটু হাসিয়া বলিল—"মাথার যে ঠিক নেই, বিশ্বাস করতে পারি ভুলে যাচ্ছেন ঘরটা আপনারই।"

ব্রজলাল সোফার পিঠেই মাথাটা একটু ঘুরাইয়া চাহিল, তাহার পর কৌতুকভরে একটু হাসিয়াই উত্তর দিল—"ভুলে যাচ্ছেন যে আমি উড়ে এসে জুড়ে ব'সেছি, আপনাদের বেদখল ক'রে।"

এবারেও সামলাইয়া লইল জাহ্নবী, গায়ে মাখিল না শ্লেষটুকু, তবে উত্তরে একটু খোঁচা রাখিয়াই দিল, বলিল—"নিরুপায় যারা তারা সত্যি কথাগুলোও যত শীগ্‌গির ভোলে ততই ভালো নয় কি?"

ব্রজলাল হাসিয়া চুপ করিল; হয় কথাটার উত্তর জোগাইল না, না হয় ইচ্ছা করিয়াই দিল না উত্তর। আজ সে হঠাৎ আসে নাই ওপরে, সেই বর্ষার দুপুরের মতো; আজকের আসা অনেক দিন ভাবিয়া চিন্তিয়া আসা। অন্নদা-ঠাকুরুণ যাবার পর সংসারটাতে যে পরিবর্তন হইল, জাহ্নবীর মনে তাহার কি প্রভাব হইল, ভালো করিয়া একবার জানা দরকার। বাহিরে বাহিরে যতটা দেখে ব্রজলাল, তাহাতে মনে হয় অনেকখানি নরম হইয়া গেছে জাহ্নবী, যেন অবস্থাকে, নিজের অদৃষ্টটাকে মানিয়া লইয়াছে। এর দ্বারা ওর চেহারায় যে একটা বিষন্ন শান্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা ব্রজলালকে যেমন একদিকে খানিকটা নির্ভয় করিয়া দিয়াছে, অন্য দিকে নিতান্তই নারীসুলভ একটি সৌন্দর্যকে বিকশিত করিয়া নূতনভাবে, আরও নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে—যে-সৌন্দর্য অসহায়তার মধ্যে, নির্ভরশীলতার মধ্যে; পুরুষের পৌরুষ জাগাইয়া যে-সৌন্দর্য তাহার ভালবাসাকে আরও নিবিড় করিয়া তোলে।

একটা ব্যাপার দুজনের মধ্যে নূতন আর একটা খুব বড় অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়া ভয় হইয়াছিল এক সময়ে,—এই দুর্ভিক্ষের ব্যাপারটা; কিন্তু অন্নদাঠাকুরুণ মারা যাওয়ার পর এ সম্বন্ধে আর একটি কথাও বলে নাই জাহ্নবী। এমন কি হইতে পারে না যে, যেমন নিজের কাজের ভিড়ে ব্রজলালের ওদিকে নজর দিবার অবসর নাই, তেমনি নিজের দুঃখধান্ধার মধ্যে জাহ্নবীও ওসব সেবা-পরিচর্যাকে চিত্তের বিলাস বলিয়াই মনে করে এখন?

মোট কথা এই নূতন পরিস্থিতির মধ্যে ব্রজলাল একবার নূতন করিয়া নিজের অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে চায়। অনেকদিন থেকেই সুযোগ খুঁজিতেছে, আজ পাইয়া গেল একটু। তা' ভিন্ন আজ সত্যই সে বড় ক্লান্ত আর অবসন্ন; মনটা একটি নীড়ের জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, সে অপরের আশ্রয় হইবে কি, নিজেই একটু আশ্রয়ের সন্ধানে উঠিয়া আসিয়াছে।

কথাবার্তা আরম্ভ হইয়া যে-পথ ধরিল সে-পথে আর অগ্রসর হইতে দিল না ব্রজলাল, কে জানে, বিপদ থাকিতে পারে। মুঠো দুইটা মুখের ওপর জড়ো করিয়া স্তব্ধভাবে সোফায় এলাইয়া পড়িয়া রহিল। ভাবিতেছে কি করিয়া নূতন বক্তব্যটা আরম্ভ করিবে। আজ একটু বেশি সাহস করিয়া আসিয়াছে ও, বেশি সাহস করিয়া পড়িয়াও রহিল; আফিস ছুটি, একটি ঘরে শুধু সে আর জাহ্নবী, বিলম্ব হইয়া যাইতেছে, এমন কি আড়ম্বর করিয়া কাগজপত্র গোছানোর মধ্যে জাহ্নবীর যে একটু বিব্রত হওয়ার ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে—ভাবিয়াও ভাবিল না।

অনেকক্ষণ এইভাবে থাকিয়া এক সময় বলিল—"অনেক দিন থেকে একটা কথা আপনাকে বলব মনে করছি, সেইজন্যেও এলাম আজ, যদিও এটা ঠিক যে আজ আমি বেশি ক্লান্তও হয়ে পড়েছি, তাই নিরিবিলির জন্যে চলে এলাম ওপরে।"

জাহ্নবী লিখিতেছিল, লিখিতে লিখিতেই বলিল—'বলুন'।

—"একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি, আপনার চোখে নিশ্চয়ই আরও বেশি ক'রে পড়েছে,—দিদিমা মারা যেতে দাদু বড্ড একলা প'ড়ে গেছেন বিশেষ ক'রে এই দুপুর বেলাটায়..."

"তা গেছেন বৈকি!"

"আমরা এ সম্বন্ধে তাঁকে একটু সাহায্য করতে পারি; বই পড়ে গল্প করে, আর কিছু নয়তো শুধু কাছে ব'সে থেকেও; মাসিমা আর কতটুকুই বা পারেন?"

"আপনার সময় কোথায়?"

"একেবারেই নেই, যমে ডাকলেও এখন যেতে পারব না, তাই আপনাকে বললাম, আপনার দ্বারস্থ হয়েছি বলতে পারা যায়।"

দু'একটা কথায় যা উত্তর দিতেছিল জাহ্নবী, সেটুকু বন্ধ হইয়া গেল।

একটু প্রতীক্ষা করিয়া ব্রজলাল তাগাদা দিল—"কিছু বললেন না তো।"

"কি বলা চলে আপনিই বলুন না। তার মানে আপনি আমায় এখানকার কাজ ছেড়ে দিতে বলছেন; কিন্তু কাজ ছেড়ে দিলে আমাদের এই বাড়িও যে ছেড়ে দিতে হয় সে কথাটা ভুলে যাচ্ছেন কেন?"

এবার ব্রজলালকেই চুপ করিতে হইল; কিন্তু কথাটা চালাইয়া যাইবারও গরজ তাহারই; একটু থামিয়া ব্যথিত স্বরে বলিল—আপনি সেই পুরাণো কথাই ধরে বসে আছেন জাহ্নবী দেবী, কিন্তু চাকরি করবার কী এমন দরকার? বলবেন—আমিও তো সেই পুরাণো প্রশ্নই করলাম; কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর যে আমি এখনও পাইনি, যা বলেছেন তা অভিমানে বা রাগে। এ রাগ আর অভিমান আপনার মিটবে না?···এই দেখুন না, আমি দাদুর হ'য়ে ওকালতি ক'রতে এলুম, তাঁকে সঙ্গ দেবেন কি, আমার কু-সঙ্গই ছেড়ে চ'লে যেতে চাইছেন। অথচ আমি যে কত একা, মাত্র কাজকে সঙ্গী করে বেঁচে থাকা যে কী অসহ্য তা আপনাকে কি ক'রে বোঝাই আমি?"

জাহ্নবী একটুও নরম হইল বলিয়া মনে হইল না, কলমটা থামাইয়া বলিল—"একথাটা বোধ হয় ঠিক নয় ব্রজবাবু, এমন জীবনও তো থাকতে পারে কাজই যার একমাত্র সম্বল, কাজ না হ'লে যে একমুহূর্ত্তও বাঁচবে না, শুধু খাওয়া পরার দিক দিয়ে নয়; অন্য দিক দিয়েও···"

"আপনার কথা ব'লছেন?···আমার বড় আশ্চর্য্য লাগে জাহ্নবী দেবী, কী এমন আপনার···কিন্তু যাক, সে জানবার অধিকার নেই যথন আমার। কিন্তু কাজ মানে যে চাকরিই এমন কিছু কথা আছে কি?"

"আর কি করব? খাওয়া-দাওয়া, তারপর দাদুর সঙ্গে ব'সে ব'সে গল্প করা?···সেটা খুব পুণ্যের কাজ নিশ্চয়, কিন্তু···"

পুণ্যের কথাতেই ব্রজলাল সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিল; ক্লান্ত চোখ দুইটা দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, একটা মস্ত বড় সমস্যা হঠাৎ মিটিয়া যাওয়ায় সমস্ত মুখটাও আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, বলিল—"ঠিক হয়েছে, কাজ তো

র'য়েছে জাহ্নবী দেবী, আপনার মনের মতন, আপনার যুগ্যিও, আপনি তাই করুন, তাতে আনন্দ আছে, মর্যাদা আছে তাতে…"

জাহ্নবী কলম ছাড়িয়া এমনভাবে ঘুরিয়া চাহিল যে ব্রজলালকে হঠাৎ থামিয়া যাইতে হইল, অনাসক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"কি কাজ ব্রজবাবু? দুর্ভিক্ষের নাকি?"

উত্তরটা যেন ব্রজলালের কণ্ঠে আটকাইয়া গেল। জাহ্নবী বলিল—"যদি তাই হয় তো দুরকমভাবে সেটা করা যেতে পারে; এক, কাজটা আপনার অর্থাৎ আপনি পুণ্যি অর্জন করছেন, আমি সাহায্য করছি তাতে; কিম্বা কাজটা আমার, আপনি টাকাকড়ি দিয়ে, অন্য নানারকম সুবিধে ক'রে দিয়ে আমায় উৎসাহিত ক'রছেন;—কিভাবে করব বলুন?…এইজন্যে জিগ্যেস ক'রছি যে আমি ক'রেছিলাম আরম্ভ, তারপর কি হোল তার ইতিহাস আপনি ভালো রকম জানেন।"

দু'জনে চোখাঁচোখি হইয়া বসিয়া রহিল, ব্রজলালের মুখটা লজ্জায় কুণ্ঠায় যেন সোজা থাকিতে পারিতেছে না, এক সময় করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"আমায় মাফ্ করুণ, আমি দুটোর মধ্যে কোন পথই খোলা রাখি নি জাহ্নবী দেবী; আমার ক্ষমা চাইবারও মুখ নেই।

জাহ্নবী ঘুরিয়া কাজে মঁন দিল। দিবার মতো মনই কিন্তু নাই, ক্রমাগতই ভুল, ক্রমাগতই কাটাকাটি হইয়া যাইতেছে লেখায়। বুঝিতেছে ব্রজলাল যে উঠিতে পারিতেছে না, সে নেহাৎ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই। কিছুক্ষণ যেন কিছু করার উপায়ই রহিল না, তাহার পর খাতাপত্র ডেস্কের মধ্যে রাখিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল, ব্রজলালের দিকে চাহিয়া বলিল—"ক্ষমা চাহিবার কথা আমারই ব্রজবাবু, কিন্তু বন থেকে লোকগুলোকে সরাবার কথাটা আমি নিতান্ত দৈবাৎই জেনে ফেলি, ইচ্ছে করে নয়। তবুও আমার তোলবার ইচ্ছে ছিল না প্রসঙ্গটা, কিন্তু কথায় কথায় এসে পড়ল। তা হ'লেও আমি যেভাবে বললাম তাতে অন্যায় হ'য়েছে আমার। বলুন, আমায় ক্ষমা করলেন?"

ব্রজলালও উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"রাগ করবার আমার অধিকার নেই… সব জায়গায় করাও যায় না রাগ; আমার শুধু এইটুকু বলা রইল, যদি কখনও

আবার কিছু ক'রতে চান, দুর্ভিক্ষে বা অন্ত কিছুতে, আমায় বলবেন—মানে প্রায়শ্চিত্ত করবার একটু অবসর দেবেন আমায়।...আমায় কখন কিসে কোন দিকে টেনে নিয়ে যায় বুঝতে পারি না জাহ্নবী দেবী...বুঝিয়ে দেবার লোকও যে নেই কেউ, কি করি?"

উনচল্লিশ

জাহ্নবী নিজের ওপর সন্তুষ্ট হইল, এই দেখিয়া যে মনের আবেগ চাপা দিয়া কথাবার্তা চালাইয়া যাইবারও ক্ষমতা আছে তাহার। এটা কপটতা নিশ্চয়, কিন্তু মায়ের মুখ চাহিয়া দাদুর মুখ চাহিয়া এ কপটতা তাহাকে এবার থেকে করিয়া যাইতে হইবে—কেননা এ খোঁটাটুকু ধরিয়া না থাকিলে দাদুর মেয়ে-নাতনি উদ্ধার হবে না, মায়ের ব্রত পূর্ণ হইবে না। সান্ত্বনা এইটুকু রহিল যে এতে তাহার নিজের কোন স্বার্থ নাই, একটা অভিনয় যে পরিমাণে কপটতা, এও তাহাই। আরও একটু আশ্বাস রহিল যে, এ অভিনয়ের শেষ আছে, দাদুর কন্যা আর নাতনি আসিয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই এর ওপর যবনিকা টানিয়া দেওয়া যাইবে।

জাহ্নবী নিজের চলা-ফেরায়, আচরণে যথাসাধ্য প্রসন্নতা জাগাইয়া রাখিল। অভিনয়টা এমনই কঠিন, আরও কঠিন হইয়া উঠিল যখন ব্রজলাল তাহার বাহিরের প্রসন্নতাকে অন্তরের প্রশ্রয় বলিয়া মনে করিয়া বসিল। তাহার দিক থেকে মেলা-মেশার চেষ্টাটা গেল বাড়িয়া, নিচে ডাকিয়া পাঠায় বেশি; একটা কাজের অছিলা থাকে, কিন্তু সেটা যে অছিলামাত্র সেটা জাহ্নবীরও যেমন বুঝিতে বাকি থাকে না, ব্রজলালেরও তেমনি গোপনের কোন প্রয়াস থাকে না। এ-গল্প সে-গল্প করিয়া আটকাইয়া রাখে; গল্প অবশ্যই বেশির ভাগই কারবার লইয়া, তাহার সঙ্গে জাহ্নবীর অফিস-গত বিশেষ সম্পর্ক থাকে না সব সময়। তোলে না শুধু দুর্ভিক্ষের কথা, ও-প্রসঙ্গটা সযত্নে পরিহার করিয়া চলে। জাহ্নবীও ভগবানকে ধন্যবাদ দেয় মনে মনে।

সহিয়া যাইতেছে। তাহার এই অফিসে কাজ করা লইয়া যে একটি মৃদু গুঞ্জন চলে চারিদিকে, একটি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সেটাও সে টের পায়, সে-গুঞ্জন যে আজকাল বাড়িয়াছে সেটাও বোঝে। তবু সহিয়া যায়, আর বিস্মিত হয়, নিজের সহ্য করিবার ক্ষমতায়।

একটা মাস গড়াইয়া গেল, ভালোভাবেই গেল, শুধু শেষের দিকে একটা দিন আবার একটু ছন্দঃপতন ঘটিল।

ব্রজলাল দুর্ভিক্ষের কথা তোলে না বটে, তবে এটা বোঝে যে ঐ লাং মন যখন বেশি ভাঙিয়াছে ঐখানটাই আগে জোড়া দেবার চেষ্টা করিতে হইবে কূট বুদ্ধি যথেষ্ট সঞ্চয় হইয়াছে, একটা উপায় উদ্ভাবন করিতে দেরি হইল না, কাজেও অগ্রসর হইল।

একদিন নিজের আফিসে জাহ্নবীকে একটা চিঠি লিখাইতে লিখাইতে যেন হঠাৎ মনে পড়িয়া গেছে এইভাবে উদ্ধবকে দিয়া অ্যাকাউণ্টেণ্ট মজুমদার মশাইকে ডাকিয়া পাঠাইল। আসিলে প্রশ্ন করিল—"হ্যাঁ—ইয়ে—আমাদের ধর্মখাতায় কত টাকা জমেছে?"

"হিসেব করা নেই স্যার; দেখে বলব?

"হ্যাঁ, দেখে আসুন।"

কথাটা নূতন, সেইজন্যও এবং বোধহয় অন্য একটা কারণেও জাহ্নবী হঠাৎ বেশ একটু পরে অন্যমনস্ক হইয়া গেল, অনুলেখ লইতে ভুল হইয়া যাইতে লাগিল। একটু পরে মজুমদারমশাই আসিয়া বলিল—"দু'হাজার তিন শ পঁচিশ টাকা বারো আনা সাত পাই হয়েছে স্যার—আপ-টু-ডেট্।"

কি মনে হওয়াতে ব্রজলাল একবার নতদৃষ্টিতে জাহ্নবীর পানে চাহিল, তাহার মুখটা একটু রাঙা হইয়া গেছে। মজুমদার মশাইকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া আবার লেখাইতে লাগিল, এবার তাহারও মাঝে মাঝে আটকাইয়া যাইতে লাগিল।

কিন্তু অগ্রসর হওয়া ভিন্ন উপায় নাই, শেষ হইলে চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া কথায় বেশ স্বচ্ছন্দতার ভাব ফুটাইয়া বলিল—"ঐ একটা ফাণ্ড খুললাম, জাহ্নবী দেবী—ধর্মখানা—মারোয়াড়ীদের মতন…"

একটা ঠাট্টার রাস্তা পাইয়া জাহ্নবী যেন বাঁচিল, বলিল,—"ভালো করেছেন, ওদের মতন চিত্রগুপ্তের সঙ্গে হিসেবের বোঝাপড়ায় ঠকতে হবে না। হিসেবও হয়েছে কড়াক্রান্তি পর্যন্ত।"

তিনজনেই হাসিয়া উঠিল এবং এই হাসির সুযোগ লইয়া ব্রজলাল বলিল—"আমি বলছিলাম আপনি এই টাকাটা দুর্ভিক্ষের কোন ফাণ্ডে পাঠিয়ে দিন না···মজুমদারমশাই, এঁর নামে একটা চেক···"

উৎকট ভয়ে জাহ্নবীর মুখটা অন্ধকার হইয়া গেল, মজুমদারমশাইয়ের দিকেই চাহিয়া হাত নাড়িয়া বলিল—"না, না, না মজুমদারমশাই···"

সঙ্গে সঙ্গেই ব্রজলালের দিকে চাহিয়া বলিল—"আমার নামে কেন! ও টাকার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ!···আমি ও চেক হাতে ক'রে নিতে পারব না··· এ আপনার অন্যায়; বাঃ!"

ব্রজলালের মুখের সমস্ত দীপ্তি যেন ফুৎকারে নিভিয়া গেল, আমতা আমতা করিয়া বলিল—"আপনি খোঁজ রাখেন কোথায় কোথায় খোলা হয়েছে ফাণ্ড কারা কারা সাহায্য করতে নেমেছে, তাই···"

বিপদ যেন সম্পূর্ণ কাটে নাই এইভাবে সেই রকম প্রবল আপত্তির সঙ্গেই জাহ্নবী বলিল—"কৈ, নাঃ, আর খোঁজ রাখি না তো আমি!···কে বললে?

"ও!···তাহলে আপনি যান মজুমদারমশাই।"

মজুমদার চলিয়া গেলে দুজনে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল. এক সময় ব্রজলাল ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল—"অপরাধটা মেটাতে গিয়ে বেড়েই গেল জাহ্নবী দেবী, আমায় ক্ষমা করবেন।"

জাহ্নবী ভয়ানক অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, একটা কাগজের টুকরায় একটু কি লিখিয়া বলিল—"ডেকে পাঠান একবার অ্যাকাউন্টেণ্ট বাবুকে।"

নিজেই গলা বাড়াইয়া বলিল—"উদ্ধব, মজুমদারমশাইকে ডেকে দে তো একটু।"

আসিলে বলিল—"চেকটা লিখেই নিয়ে আসুন, আমার নামে নয়, এই নামে।"

লেখা কাগজটুকু বাড়াইয়া দিল। মজুমদার চলিয়া গেল।

ব্রজলাল বলিল—"আমি কৃতজ্ঞ রইলাম জাহ্নবী দেবী।"

জাহ্নবী কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"আমিও কৃতজ্ঞ থাকব ব্রজবাবু, আপনি দয়া করে ও ধর্মখাতাটা তুলে দিন।"

"কেন ?"

"নৈলে ও-টাকা যে ঘুরিয়ে আমারই জন্যে জমা হচ্ছে, অন্য হাতে আমিই নিচ্ছি, এমন ভাববার লোক…"

চিবুকটা, ঠোঁট দুইটা কাঁপিয়া উঠিল, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া, কাগজ পত্রগুলো গুছাইয়া লইয়া জাহ্নবী উপরে উঠিয়া গেল।

সেদিন যতক্ষণ আফিস রহিল মজুমদারমশাই মিঠে হাসিয়া মাথা দুলাইয়া লেজারের খাতার সঙ্গে অনেক সরস আলাপ করিল। আফিস বন্ধ হইয়া গেলেও অনেকক্ষণ বসিয়া কাজ করে; সবাই চলিয়া গেলে উদ্ধবকে ডাকিয়া লইল, ডান হাতটা বাড়াইয়া বলিল—"ডাকছি, তোর কানটা নিয়ে আয় দিকিন।"

এসব অভ্যস্ত ব্যাপার, উদ্ধব গুটিসুটি মারিয়া কান দুইটা ঢাকিয়া বলিল—"কেন ? আর তো কিছু করি নি বড়বাবু।"

"ক'রেছিস; সায়েবের কাছে আবার আমার নকল ক'রেছিস বেটা বদমাস; নিয়ে আয় কান।…আচ্ছা, দিলাম ছেড়ে এবারটা, তুই তোদের যাত্রার সেই জটিলে-কুটিলের নকলটা কর দিখিন একবার; বেশ ভালো করে।"

উদ্ধব কাপড়টা চট্ করিয়া মেয়েদের মতো করিয়া পরিয়া লইয়া কয়েক পা পিছনে সরিয়া গেল, তাহার পর আবার খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আগাইয়া আসিয়া কোমর বাঁকাইয়া হাত উল্টাইয়া কল্পিত রাধাকে লক্ষ্য করিয়া টানা মেয়েলি ভঙ্গিতে বলিল—

রাখালী, কত খেলাই দেখালি !
ওলো—সেই তো মল খসালি
তবে কেন লোক হাসালি ?
কালামুখী, এ মুখ আর দেখাস নি

গোকুলে—দেখাস নি লো, দেখাস নি, দেখাস নি…"

স্থূল শরীরের সর্বাঙ্গ দুলাইয়া হাসিতে হাসিতে মজুমদারমশাই বলিল—"যা বেটা হারামজাদা, খবরদার অন্ত কারুর সামনে করিস নি।"

চলিয়া গেলে পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে দুলিয়া দুলিয়া নিজের মনেই ভাঁজিতে লাগিল—"রাখালী, কত খেলাই দেখালি!…খেলার আর অন্ত রাখলি না লো, অন্ত রাখলি না… !"

বলার সঙ্গে মাঝে মাঝে ওপরে জাহ্নবীর ঘরের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

চল্লিশ

অপমানটা আজ বড় বেশি করিয়া বাজিয়াছে জাহ্নবীকে। আজকের ব্যাপারটার সোজা তাহার নিজের সঙ্গে সম্বন্ধ, সেইজন্যেও, আবার অপর একজন ব্যক্তির সামনেও হইল। মূলে অবশ্য অপমানের কিছু নাই তেমন, কিন্তু এক মাস ধরিয়া নিজেকে সংযত করিয়া করিয়া মনটা ঠুনকো হইয়া পড়িয়াছিল, একটু আঘাতেই, কিংবা যা হয়তো আঘাত নয়, সেটাকে আঘাত বলিয়া মানিয়া লওয়াতেই একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। সিঁড়ি পর্যন্ত কোন মতে সামলাইয়া রাখিল নিজেকে, তাহার পর ঘরের চৌকাঠ ডিঙাইবার সঙ্গে সঙ্গেই চোখে বন্যা নামিল।

জ্ঞানে ওর জীবনে অশ্রু এই প্রথম। সমস্ত ছেলেবেলায় জীবনটাকে ভয় আর বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছে; তাহাতে কান্না আসে নাই চোখে, একটা রহস্যের সামনে দাঁড়াইয়া দেহমন যেন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তাহার পর বোর্ডিঙের জীবন থেকে ডোরার শিষ্যত্বের মধ্য দিয়া জাগিয়াছে শুধু ঘৃণা আর আক্রোশ; সেও একটা শুষ্ক দাহই। আজ কিন্তু যখন সেই ঘৃণা আর আক্রোশের চরম হইয়া উঠিবার কথা, অর্থাৎ জাহ্নবী যখন জ্বলিয়া উঠিবে, সেই সময় জল হইয়া যেন গলিয়া পড়িল। কোন রকমে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া টেবিলে মাথা রাখিয়া এই প্রবাহের মধ্যে ছাড়িয়া দিল নিজেকে।

সামলাইতে অনেকক্ষণ লাগিল। আবেগটা একটু কমিয়া আসে, সঙ্গে সঙ্গে কি সব অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তা সব জাগিয়া ওঠে—মনের অনাবিষ্কৃত কন্দরে কন্দরে, আবার কুল কুল করিয়া ধারা নামে চোখে।...এমন অস্বস্তিকর অবস্থায় কখনও পড়ে নাই জীবনে। এই অবস্থায় ব্রজলাল যদি ডাকিয়া পাঠায়, উদ্ধব আসিয়া যদি দরজায় ঘা দেয়, তাহা হইলে তো লজ্জার চূড়ান্ত আজ। বেশ বুঝিতেছে যে কোন লোকের সামনে দাঁড়াইতে গেলেই সে আবার দ্বিগুণ বেগে অভিভূত হইয়া পড়িবে।

ওরই মধ্যে একটু সৌভাগ্য যে ব্যাপারটা হইল আফিস-ঘন্টার শেষের দিকে। খানিকক্ষণ পরেই মোটরের শব্দ হইতে জাহ্নবী জানালা দিয়া দেখিল ব্রজলাল নূতন গাড়িটা করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। আর একটু পড়িয়া থাকিয়া উঠিল, নিজেও নামিয়া যাইবে। ঘরের মধ্যে একটা ছোট ড্রেসিং টেবিল আছে, চুলগুলো একটু গুছাইয়া লইবার জন্য তাহার সামনে দাঁড়াইতেই মনে হইল যেন অন্য কাহার প্রতিচ্ছায়া ;—চোখ দুইটা ফুলিয়া রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, মুখটাও ভারি ভারি, সন্ধ্যার আগে এ-চেহারা লইয়া আফিস থেকে নামা চলিবে না, বাড়ি গিয়া মায়ের সামনে দাঁড়ানো তো অসম্ভবই।

চুলগুলো গুছাইয়া লইয়া, চোখ দুইটা ভালো করিয়া মুছিয়া লইয়া জাহ্নবী বন্দীর মতোই নিতান্ত নিরুপায়ভাবে সোফাটায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; দরজাটাও খুলিল না। আজ শরীরটাকে অদ্ভুতভাবে হালকা বোধ হইতেছে, এমনটি আর কখনও হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না, কতদিনের সঞ্চিত একটা বোঝা যেন এই একটু সময়ের মধ্যেই কি করিয়া গেছে নামিয়া, এইটুকুই নয়, সমস্ত জীবনটার রূপ যেন হঠাৎ গেছে বদলাইয়া, শুধু নিজের সঙ্কীর্ণ জীবনটুকুই নয়, সবার জীবনই, জীবনমাত্রই; যেন বড় বিষাদময়, বড় নিরুপায়, বড় অসহায়।

শীতের দিন ফুরাইয়া আসিতে দেরি হইল না। জাহ্নবী সোফাটা টানিয়া নিজেদের বাড়ির দিকের জানালার কাছাকাছি লইয়া আসিল; এটা উত্তর দিক, জানালা দিয়া পশ্চিম আকাশের খানিকটা দেখা যায়। সূর্যাস্ত হইয়া গেছে, চক্রবাল রেখায় একটি ফিকা গোলাপী আভা আছে লাগিয়া। কোথায় যেন

পড়িয়াছে মুমূর্ষু রোগীর ম্লান হাসির সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে এটাকে, কোন কবিতার বইয়েই, শেলীও হইতে পারে, ঠিক মনে পড়িতেছে না।··· অন্নদাঠাকরুণের রোগশয্যার চিত্রটি জাগিয়া উঠিল তাহার মনে। আশ্চর্য! একদিনও ভালো করিয়া তাহাকে হাসিতে দেখে নাই। এই যে হাসির নিতান্ত অভাব একটা মানুষের জীবনে, এর জন্য জাহ্নবীই দায়ী নাকি? এই প্রশ্নের উত্তরেই যেন নিজের জীবনের স্মৃতিগুলা ধারাপ্রবাহে একে একে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল—ছেলেবেলার যাযাবর জীবন, নিত্য এক আশ্রয় থেকে অন্য আশ্রয়ে—তাহার পর বনবাস—বোর্ডিং—তাহার পর এক বৎসরের এই নিত্যসন্দিগ্ধ জীবন। এর মধ্যে যে ঘটনাগুলা বেশি উজ্জ্বল হইয়া আছে, সেগুলা আশায় বা আনন্দে উজ্জ্বল নয়; তীব্র উৎকণ্ঠায়, ভয়ে, সন্দেহে স্মৃতির গায়ে জ্বলন্ত রেখায় জাগিয়া আছে। বোর্ডিঙের জীবনটুকু ছিল মানুষের মতো স্বাভাবিক, তাই তাহার শেষের অভিজ্ঞতাটুকু আরও গ্লানিময়।···এক একটা দৃশ্যে মনটা আটকাইয়া যাইতেছে—মেয়েদের গাড়ি থেকে তাড়া খাইয়া পুরুষের গাড়ির এক কোণে মায়ে-ঝিয়ে তাহারা দুটিতে লুকাইয়া বসিয়া আছে;—আজ বোঝে, কেন···দুর্গাপূজার আলোর মধ্যে অন্ধকার খুঁজিয়া বেড়াইতেছে তিনজনে। অদ্ভুত কাণ্ড!—পূজার আলো আর সবার জন্যই, শুধু তাহাদের তিনজনকে বাদ দিয়া, অথচ আজ জাহ্নবী শপথ লইতে পারে যে, সেদিন অতগুলা লোকের মধ্যে দিদিমণি আর মায়ের আগ্রহই ছিল সবচেয়ে বেশি, সবচেয়ে খাঁটি।···অণিমা হাতের ঝুলিটা জানালা দিয়া কিরণময়ের দিকে বাড়াইয়া ধরিয়াছে, কি ব্যাকুল মিনতি দৃষ্টিতে!—সর্বস্ব দিলাম, এবার আমায় অব্যাহতি দাও—ওদিকে দৃষ্টিতে নিষ্ঠুর অতৃপ্তি।···জাহ্নবী প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর সামনে নতদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া আছে, বোর্ডিং ত্যাগ করিবার নির্দেশ হইয়া গেল এইমাত্র—ফাঁসির নির্দেশ বোধ হয় এই রকমই একটা কিছু, লজ্জায়, নিরাশায় নিজেকে যেন অনুভব করিতে পারিতেছে না; প্রধানা বলিতেছে—"না, কারণ বলা বোর্ডিঙের নিয়ম নয় জাহ্নবী, তোমায় কালই যেতে হবে।" জাহ্নবী অনুভব করিতেছে পাশেই, সবার অলক্ষিতে যেন এলফ্রেড কিরণময় আছে দাঁড়াইয়া, মুখে বিজয়ের একটা কুটিল হাসি।······আসিবার দিন ভোরা

বলিল—"অণিমাদির ওপর রাগ রেখো না পুষে, ওর দোষ নেই, খালি এইটুকু মনে রেখ জাহ্নবী, যে পুরুষ মেয়েদের কতটা অধঃপাতে নিয়ে যেতে পারে।"

এক এক সময় চিন্তার সূত্র যাইতেছে ছিঁড়িয়া। আকাশ আরও মলিন হইয়া উঠিল। মুমূর্ষুর হাসির মতো সেই আলোটুকুও আর নাই। জালী পর্দা দিয়া বাড়ির ভিতরটা দেখা যায়। দাদু ঘর থেকে বাহির হইয়া আসিয়া আকাশের দিকে চাহিল, বলিল—"হ্যাঁগা বন্দী, দিদিমণি এখনও এল না; বোধ হয় সন্ধ্যে হয়ে এলো, কি বলিস?" নারায়ণী তুলসী মঞ্চের জন্য প্রদীপ জ্বালিতে যাইতেছে, ঘুরিয়া বলিল,—"তা হ'ল বৈকি সন্ধ্যে।"

ঘর থেকে প্রদীপ জ্বালিয়া আনিয়া মঞ্চের ওপর রাখিয়া গলায় আঁচল জড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিল, দেবতাকে কত-কী বলিবার আছে। ...এই চারিদিকের ঐশ্বর্যের মধ্যে, উগ্র আধুনিকতার মধ্যে এই পুরাতনী, একরকম বলিতে গেলে এই দারিদ্র্যবিলাস—আজ যেন আরও বেশি করিয়া মিষ্ট লাগিতেছে জাহ্নবীর।...প্রণাম শেষ করিয়া—যেন মনের প্রার্থনাটুকু আগে দেবতার চরণে নিবেদন করিয়া, নারায়ণী বলিল—"বোধ হয় এক একদিন যেমন পড়িয়ে ওদিক থেকে ওদিকেই বেড়াতে যায় সেইরকম গিয়ে থাকবে।" কথাটা বলিয়া আরও কাছে আগাইয়া গেল, একটু গলা নামাইয়া বলিল—"এবার একদিন বলো বাবা, আমার মন ব'লছে রাজি হবে এবার।" আরও আস্তে কি একটু বলিল, তাহার পর আবার একটু জোরে—"তুমি ব'ললেই হয়, তা নাতনি রাগ ক'রবে বলে ভয়ে একবার এ-পর্যন্ত মুখ খুললে না তুমি—আশ্চর্য্য ভয় বাপু!..."

একটু হাসিয়া ঘুরিয়া চাহিতে চাহিতে ঘরে চলিয়া গেল, এত দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যায় না, তবে হাসিতে যেন বড় গভীর একটা আশা মাখানো রহিয়াছে। দাদুও লাঠির ওপর ভর দিয়া অল্প অল্প মাথা দুলাইয়া হাসিতেছে, নিবিড় আত্মাভিমানে। বলিল—"তা এবার বলব; হ্যাঁ, আমার কথা রাখবে বৈকি, এখন পর্যন্ত বলিনি ভাই...তা এবার বলব; বলব আমি এবার... আমার কথা নাকি দিদিমণি ঠেলতে পারে!—পারে কখনও নাকি!"

জাহ্নবী আবার অন্যমনস্ক হইয়া গিয়া আকাশের পানে চাহিল। কোথায় চিন্তার সূত্র ছিঁড়িয়া গিয়াছিল মনে পড়িতেছে না। মায়ের মনের আশা, দাদুর এই আত্মবিশ্বাস বড় করুণ বলিয়া মনে হইতেছে; এ যে কত ভঙ্গুর একমাত্র সে-ই তো জানে। মনে পড়ে ঠিক এই আশা এক একদিন যেন দিদিমণির রোগক্লান্ত চোখে অস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছিল; একটা কথা বলিবার ছিল, মুখ ফুটিয়া কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বলিতে পারিল না।…জাহ্নবী মনে মনে বলে—আমায় ক্ষমা করো সবাই, যাদের যাদের মুখে জীবনে হাসি ফোটাতে পারলাম না, সবাই আমায় একবাক্যে ক্ষমা করো, নৈলে আরও অসহ হয়ে উঠছে আমার জীবন—দিদিমণি, দাদু, মা, আমি নিরুপায় জেনে আমায় ক্ষমা করো। কি করব আমি? বিষের পাত্রই আমার কপালে জুটল, আমি অমৃত বিলোই কি করে? মুখ ফুটে আমায় বোল না তোমাদের আশার কথা, ভুল করেও নয়……

আজ কি হইয়াছে, আরও সবার কাছে ক্ষমাপ্রার্থিনী জাহ্নবী,—যাহারা তাহার জীবনে কল্যাণ আনিতে চাহিয়াছে—অণিমাদি, ডোরা, এমনকি ব্রজলাল পর্যন্ত—তাহাদের চাওয়া আন্তরিক হোক বা বাহিরে-বাহিরেই হোক, সবার কাছে জাহ্নবী আজ ক্ষমাপ্রার্থিনী…আজকের ঘটনার সবটুকু মুছিয়া গিয়া শুধু ব্রজলালের মুখের কারুণ্যটুকু জাগিয়া আছে—"আমি কৃতজ্ঞ রইলাম জাহ্নবী দেবী"—বলার পরও যখন সবচেয়ে রূঢ়তম আঘাতটা পাইল।…একী জীবন? কোন সম্পর্ক না রাখুক, কিন্তু সহজভাবে সবার সামনে দাঁড়াইতে পারিল না কেন জাহ্নবী?

একটি অশ্রুপ্রবাহে নিজের জীবনের ট্র্যাজেডি আজ নূতনভাবে সাজাইয়া দিয়াছে জীবনটাকে। শূন্যলগ্ন দৃষ্টির সামনে সান্ধ্য আকাশ বাহিয়া শুধু মর্মন্তুদ বিষণ্ণ মুখের মিছিল ভাসিয়া চলিয়াছে—দিদিমণি—দাদু—মা—অণিমাদি—ব্রজলাল—তাহার মুখের পানে চাহিয়া সবাই যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে মিলাইয়া যাইতেছে।

চাহিয়া চাহিয়া একসময় অনুভব করিল আবার তপ্ত দৃষ্টিধারা গাল বাহিয়া, কণ্ঠ ভিজাইয়া নামিয়া যাইতেছে—বুঝিতে পারিল না কাহার জন্য বেশি

করিয়া, দিদিমণি, দাদু, মা, অণিমাদি, না, ব্রজলাল—না, সবকে লইয়া, সবকিছু লইয়া তাহার নিজের জীবেনর এই ট্রাজেডি ?

অত গভীরে গিয়া বুঝিবার আর ক্ষমতা নাই জাহ্নবীর ; অলস অবসাদে দুইটি ধারার মধ্যে নিজেকে মুক্ত করিয়া পড়িয়া রহিল।

একচল্লিশ

কিন্তু একটা সন্ধ্যার সামান্য অশ্রুতে জীবনের গতি স্থায়িভাবে ফিরাইয়া দিতে পারে না। পরদিনই জাহ্নবী আবার পুর্বের জীবনেই জাগিয়া উঠিল ; ব্যাপারটাকে এতই লঘু বলিয়া মনে হইল—এমনই একটা লজ্জাকর অশ্রুবিলাস যে সাধ্য থাকিলে জীবন থেকে মুছিয়া ফেলিত একেবারে। আরও লজ্জাকর এইজন্য যে, কাল ক্ষণিক দুর্বলতায় এমন সব কথা মনে হইয়াছিল যাহা সেই সব মেয়েদেরই সাজে যাহাদের জীবনে জাহ্নবীর মতো অভিজ্ঞতা নাই—বোর্ডিঙের শীলা, ক্ল্যারেন্স. অনুপা, চন্দ্রা—ক্লারা—যাহাদের জননীকে পুরুষের দৃষ্টির বিষে জর্জরিত হইয়া পলাইয়া ফিরিতে হয় নাই, পশুর মতো অরণ্যে আত্মগোপন করিয়া কাটাইতে হয় নাই। কাল জাহ্নবী এতই আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল যে, ব্রজলালকে শুধু ক্ষমা করে নাই, মনে মনে তাহার সামনে ক্ষমাপ্রার্থিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ! ও যা করিয়াছে তাহার জন্য কালকের চেয়েও রূঢ় আঘাত কি প্রাপ্য নয় ওর ? ও সেই দলের মানুষ যাহারা বিদেশীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ লইয়াছে···কত বড় নীচ ! বনের মধ্যে গোটা-কতক বুভুক্ষু মানুষ লুকাইয়া আছে, জাহ্নবীর কাছে খবরটা পাইয়া মিলিটারিদের জানাইয়া দিল—কী, না কন্ট্রাকটারির সুবিধা হইবে ; খোশামোদ ! ঘুষ !—টাকা দিয়া নয়, নিজের মনুষ্যত্ব দিয়া !···আর, এই কথাই বা জাহ্নবী ভোলে কি করিয়া যে ও পরস্বাপহারী—অন্নদাঠাকরুণের মৃত্যুর গোড়াতে কি ঐ ব্রজলালই নয় ?

সমস্ত সকালটা এই চিন্তা করিয়া এই মন লইয়াই জাহ্নবী অফিসে গেল,—শুধু বেশি সাবধান রহিল, মনটা অন্য দিনের চেয়েও আলোড়িত অথচ কিছু

বলা চলিবে না; এই জায়গাই যে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে দাছর মেয়ে আর নাতনির সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত। সব ভুলিয়া মুখের প্রসন্নতা ফুটাইয়া রাখিতে হইবে—অভিনয় করিতে হইবে।

অভিনয়ের মধ্যে আরও দুইটা মাস কাটিয়া গেল, তাহার পর দ্রুত পর্যায়ে এমন কয়েকটা ঘটনা ঘটিয়া গেল যে দুইজনের জীবনটাই কল্পনাতীত পরিণতির সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

এই দুই মাস পরের কথা। বিজ্ঞাপনগুলা দিয়া চলিয়াছে, উত্তর আসে মাঝে মাঝে, কিন্তু সব সাজানো—দুঃস্থ-দুর্গতদের তো অপ্রতুল নাই দেশে। দুঃখে নিরাশায় অশ্রদ্ধায়, অনেকদিন খোলেও না চিঠিগুলা, কয়েকদিনের জড়ো হইলে কোনদিন অবহেলাভরে পড়িয়া লয়। একদিন এইরকম তিন চারদিনের জমানো চিঠি পড়িতে গিয়া একটার খামে নজর পড়ায় একটু বিশেষভাবে সচেতন হইয়া উঠিল জাহ্নবী, নীল রঙের মোটা দামী খামে টাইপ করা নাম আর পোষ্ট বক্স। তাড়াতাড়ি খুলিয়া ভিতরে নাম দেখিয়া আরও বিস্মিত হইয়া গেল, অণিমার চিঠি। এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া গেল।

অণিমা লিখিয়াছে সে যথাযথভাবে বলিতে পারে না, তবে বিজ্ঞাপনদাতা যদি কলিকাতা হইতে উত্তরে অমুক স্টেশনের দক্ষিণের অরণ্যের মধ্যে একটি পড়ো বাড়িতে সন্ধান করেন তো বোধ হয় স্ত্রীলোক আর তার কন্যাটির সন্ধান পাইতে পারেন। পথের একটা মোটামুটি আন্দাজ, বাড়িটার চেহারা, চৌহদ্দি —অর্থাৎ বছর দেড়েক আগে যেমন ছিল সমস্ত দিয়া দিয়াছে, যেটাতে বোর্ডিং আসিয়া দিনকতক ছিল সেটারও উল্লেখ করিয়া করিয়া। কি মনে করিয়া অণিমা কিন্তু নিজের ঠিকানাটা চিঠিতে দেয় নাই, খামের ওপর জাহ্নবী পোষ্ট অফিসের ছাপ দেখিল মাদ্রাজ জি, পি, ও।

দুইটা দিন একটা প্রবল কৌতূহলের অশান্তিতে কাটিল জাহ্নবীর, তাহার পর, তৃতীয় দিনে আবার সেই রকম খাম—এবার রেজেষ্টারি করা; তাহার নাম-ঠিকানাও দেওয়া। তাড়াতাড়ি খুলিয়া জাহ্নবী পড়িতে লাগিল—কল্যাণীয়াসু,

কাল একটা বিজ্ঞাপনের উত্তর দিয়ে, আজ তোমায় চিঠিটা লিখতে বসেছি। ৭৪নং পোষ্ট বক্স দিয়ে কোনও ভদ্রলোক একটি মাঝবয়সী স্ত্রীলোক আর তাঁর

আন্দাজ সত্ত্বেও, আঠারো বছরের কন্যার খোঁজ করছেন, কলকাতার একটি ইংরাজী দৈনিক হঠাৎ কোনরকমে হাতে পড়ায় দেখলাম।

আমি তোমাদের ঠিকানা দিয়ে সন্ধান নিতে বললাম। বলা বাহুল্য, কাজটা ঠিক হোল কি ভুল হোল এখন পর্যন্ত বুঝতে পারছি না। আমার দেবার কারণটাও বলি,—তোমার মা সেই কয়েকদিনের পরিচয়ে তোমাদের জীবন সম্বন্ধে আমায় কিছু কিছু বলেন; কিন্তু আমার মনে হয় কিছু লুকানও। লুকাবার সমীচীন কারণ থাকতে পারে মনে করে, আর অনধিকার চর্চা ব'লেও আমি নিজে হ'তে কৌতূহল প্রকাশ করিনি, তোমাকে প্রশ্ন করা আরও অনুচিত মনে করেছিলাম। বিজ্ঞাপনটা দেখে আমার মনে কেমন একটা খটকা হোল আবার, দু'চার দিন ভাবলাম, শেষকালে কিন্তু লিখেই দিলাম।

তারপর মনে হোল তোমাকেও একটা চিঠি দেওয়া দরকার। যদি অন্যায় করে ফেলে থাকি তোমরা সাবধান হ'তে পারবে কেউ অনুসন্ধান ক'রতে এলে।

আমি তোমায় এর আগেও দু'খানা চিঠি দিয়েছি; বোর্ডিং ছাড়বার প্রায় মাস তিনেক পরে; আমি ছাড়ি প্রায় তোমার সঙ্গে সঙ্গেই। কোন উত্তর না পেয়ে মনে হোল, হয় চিঠি তোমার কাছে পৌঁছায় না, না হয় ইচ্ছা করে ঘৃণায় উত্তর দাও না।

এইটিই যে বেশি সম্ভব তা জানি জাহ্নবী, আর সেই জন্যেই দিয়েছিলাম চিঠি, তোমার ক্ষমা চেয়ে। আমি ওখান থেকে চ'লে আসবার দিনকতক পরেই তোমার ক্ষমা চাইবার দরকার পড়েছিল আমার, যখন টের পেলাম তুমি কত নিরীহ কত পবিত্র। কিন্তু অত তাড়াতাড়ি চিঠি দেবার আমার মুখ ছিল না; বিশেষ করে ভেবে দেখলাম বোর্ডিঙে গিয়ে আবার তোমায় অধিষ্ঠিত করবার পথ যখন বন্ধ করে এসেছি তখন শুধু কথার ক্ষমা চাইতে যাওয়াটা নিতান্তই যেন হাস্যকর হয়। আরও একটা কথা, আমার নিজের জীবনেও তখন একটা ঝড়-তুফান বয়ে চলেছে, ডুবব কি ভাসব ঠিক নেই; এমন অবস্থায় সব দায়িত্ব মিটিয়ে কাজ করে যাওয়া সম্ভব

হয় নি আমার পক্ষে। মাসতিনেক পরে যখন মনে হল একটু আশার আলো পেয়েছি দেখতে, তখনই তোমার কাছে, ক্ষমা চেয়ে পাঠিয়েছি। সে ক্ষমা যে পাইনি (অর্থাৎ যদি পেয়েই থাক আমার চিঠি তুমি) তার জন্য আমার দুঃখ নেই জাহ্নবী ; জানি আমার যা অপরাধ তাতে ক্ষমা আমার এ-জন্মে প্রাপ্য হবে না।

এরপর আর কি লিখব বুঝতে পারছি না। অথচ লেখার আমার এত আছে যে একটা চিঠিতে কুলিয়ে ওঠে না। আর তা জানাও তোমার দরকার, নৈলে জীবন-সম্বন্ধে ডোরার যা থিয়োরী সেইটেই তোমার মনে বদ্ধমূল হ'য়ে থাকবে। আমি ডোরার নিন্দে করছি না ; ওর অদ্ভুত শক্তি, কিন্তু সেই শক্তি নিয়েই ও মেয়েদের মধ্যে একটা ব্যতিক্রম হয়ে রইল। ডোরা একটা সিনিক (cynic) ; পৃথিবীর সবকিছু থেকে ও যেন ঘৃণায় বিরক্তিতে মুখ ঘুরিয়ে নাক সিঁটকে ব'সে আছে। সমস্ত পৃথিবীটা পুরুষের সৃষ্টি ব'লে ওর এই সিনিসিজম্ পুরুষের ওপর কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠেছে ; অবশ্য সমস্ত পৃথিবী যে পুরুষেরই সৃষ্টি এটাও ওরই থিয়োরী একটা। ও পুরুষকে বিষের মতো ভয় করে ; নরকের মতো ঘৃণা করে ; পুরুষকে সর্বতোভাবে পরিহার করে ওর এই ভয় আর ঘৃণাকে যেভাবে জীবনে রূপ দিয়েছে সেটা সত্যিই বিস্ময়কর। সেইটেই আমি ওর অদ্ভুত শক্তি বলেছি, আর সেইটেই ওকে মেয়েদের মধ্যে একটা ব্যতিক্রম করে তুলেছে। কেন, বলি—

আমার বিশ্বাস পুরুষই শুধু সিনিক হ'তে পারে জাহ্নবী। পুরুষ চির অতৃপ্ত, তাই ধ্বংসই তার ধর্ম ; তাই সিনিসিজম্ তার বেদ। তার একলার হাতের যা যা সৃষ্টি তাতে নিজের প্রকৃতিবশেই পুরুষ ধ্বংসের বীজ বপন করে চলে, তাই তার সৃষ্টির স্থায়িত্ব নেই, ক্রমাগতই ভাঙা-গড়া চলছে—যা গড়ছে সেটা আবার ভাঙবার জন্যেই গড়ছে।

ওরা যে বলে এইটেই বিবর্তনের আসল রূপ, সৃষ্টির স্বরূপ উপলব্ধির আসল ধারা, এটা আমি মানি না।

মানিনা, আমি মেয়ে ব'লে। আমার বিশ্বাস সৃষ্টি জিনিসটা আমাদের ; সৃষ্টিতে সংহতি আনবার জন্যে যে জিনিসটা দরকার, বিধাতা সেটি আমাদের

মধ্যেই দিয়েছেন। সৃষ্টি যে এখনও আছে টিকে—তা সে যেভাবে, যত অসম্পূর্ণ ভাবেই থাক্—তার কারণ পুরুষের পাশে আমরাও আছি।

ডোরাও এটা বিশ্বাস করে, এইখানে ডোরার সঙ্গে আমার মিল আছে; কিন্তু তারপর আর মিল নাই; ডোরা বলে ওদের ধ্বংসের পথে যেতে দাও, ঐ ওদের প্রাপ্য; আমি বলি ওদের পাশ থেকে স'র না, ওরা দু'হাত দিয়ে ঠেলে দিলেও স'র না, তোমার কল্যাণ স্পর্শ দিয়ে ওদের অন্তরের সৃষ্টি ধর্মটিকে বাঁচিয়ে রাখো ধ্বংসের দহন থেকে; তুমিই সৃষ্টির মধ্যেকার স্থিতি, তুমি স'রে গেলেই সৃষ্টি একেবারে ধ্বংস হ'য়ে যাবে।

তফাৎ হয়ে গেল আমাদের দু'জনের এই মিশনে।

জীবন একেবারে শেষ না হয়ে এলে জীবন সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না জাহ্নবী—পথে কত বাধা, কত বিঘ্ন, তবু আমি যেন একটু আলো দেখতে পেয়েছি, মনে হয় আমার মিশনে এগিয়েছি একটু; বেশি নয়, একটা ধাপ, তবে আলোর সন্ধান পেয়েছি।

যে-চিঠি হয়তো পৌঁছুবেই না তাতে বেশি লিখে কি হবে? হয়তো এতটা লেখাই ব্যর্থ হোল। যদি পৌঁছায়, যদি উত্তর পাই সব লিখব তোমায়; বড় আনন্দ পাব তোমায় লিখে। তুমি যদি ক্ষমা নাও করতে পার, তবু লিখো, তবুও তোমায় সব জানিয়ে আনন্দ পাব; আমার আশীর্বাদ নিও। ইতি।

শুভার্থিনী,

অণিমা।

C/0. এ্যালফ্রেড কিরণময় রায়,

৮৭, শঙ্কর চেট্টিয়ার অ্যাভিনিউ

মাদ্রাজ।

আর যাই হোক, একটা কথা ঠিক যে চিঠিটা ভালো সময়ে পৌছায় নাই; চারিদিকেই এখন তিক্ততা, এখন 'বাণী' শুনিবার মতো অবস্থা নয় মনের, বিশেষ করিয়া অণিমার কাছে, যাহার জন্যই এতটা। আজ মন চায় ডোরার চিঠি পাইতে…কোথায় ডোরা?—অন্তরে আগুন জ্বলিতেছে, সে চায় ইন্ধন, উপশম নয়।

তাহার ওপর ঠিকানায় আছে কিরণময়ের নাম।—জাহ্নবী অনেকক্ষণ একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিল, ব্যঙ্গে ধীরে ধীরে ঠোঁটের কোনটা কুঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল—মিশন!...সৃষ্টি!...স্থিতি সংহতি!...হুঁ! চিঠিটা দ্বিতীয়বার পড়িবারও ইচ্ছা হইল না।

একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, তবে ভদ্রই—পূর্বের চিঠি দুইটি পায় নাই, হয়তো যে সময় সে দু'টা আসে তখন জাহ্নবীরা বনের মধ্যে। এখন চিঠি আর মারা যাইবার ভয় নাই, সেনা-ছাউনি কাছে পড়িয়া জায়গাটা সহরের মতো হইয়া গেছে। অনিমা যে তাহার মিশনে সাফল্যের আলো দেখিতেছে ইহাতে জাহ্নবী সত্যই আনন্দিত, তবে বিস্তারিত খবরের অভাবে স্বরূপটা ধরিতে পারিতেছে না। জানিবার জন্য বিশেষ কৌতূহল রহিল জাহ্নবীর।

ক্ষমার কথা লিখিয়া অণিমা অপরিসীম লজ্জা দিয়াছে। জীবনের যা কিছু পাওয়া সে তো অনিমার দয়াতেই, তারই কৃতজ্ঞতা রাখিবার জায়গা কোথায় জাহ্নবীর?

বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটা, কি ভাবিয়া—হয়তো বাহুল্য বোধেই আর পরিষ্কার করিল না; লিখিল, মা তাহাদের পরিচয় লুকায় নাই কিছুই, হয়তো আবেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে বলার সময় কণ্ঠ স্খলিত হইয়া থাকিবে, যাহার জন্য অণিমার সন্দেহ। কেহ অনুসন্ধান করিতে আসিলে বুঝাইয়া দিবে।

উত্তর এই খানেই শেষ করিল; শুধু ঠিকানা সম্বন্ধে লিখিল—"ব্রজলাল ব্যানার্জি মিলিটারি কনট্রাকটাস"—এইটুকু দিলে চিঠি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

বিয়াল্লিশ

এই সময় ব্রজলালের জীবনেও একটা রূপান্তর ঘটিল। অন্য কিছু নয়, সেই ব্যবসায় লইয়াই, কিন্তু হঠাৎ এমনভাবে মাতিয়া উঠিল যে, আর সব কিছুই যেন ওর জীবন হইতে মুছিয়া গেল। অবশ্য জীবনে বৈচিত্র্য ওর ছিলও অল্প—কি লইয়াই বা থাকিবে?—তবু জাহ্নবীদের ছোট

সংসারটির ভালো-মন্দ লইয়া একটা ঔৎসুক্য ছিল, সুযোগ পাইলেই গিয়া দাঁড়াইত, খোঁজ লইত; সেটা প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। সব চেয়ে বড় কথা—জাহ্নবীকে কেন্দ্র করিয়া যে ঔৎসুক্যটুকু গড়িয়া উঠিতেছিল যাহার মধ্যে ছিল জীবনের সব বৈচিত্র্যের সূত্রপাত, বয়োধর্মের গুণে যাহা এদিকে ব্রজলালের একমাত্র তপস্যা হইয়া উঠিতেছিল, তাহা হইতেও তাহার মনটা গুটাইয়া আসিতে লাগিল।

ব্রজলাল অতিরিক্ত অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে; বাড়িতে থাকে অল্প, অফিসে বসে আরও অল্প, প্রায় সমস্তদিনই বাহিরে কাটে; মোটরে করিয়া বাহির হইয়া যায়, ফেরে এক একদিন গভীর রাত্রে। কোন কোন দিন ফেরেও না, বার দুই এমন হইল যে একেবারে দুই তিনদিন পরে ফিরিল; রীতিমতো ক্লান্ত, সাজ পোষাকও কতকটা অবিন্যস্ত, বেশ বোঝা যায় মস্তবড় একটা অনিয়ম-অত্যাচারের ঝড় বহিয়া গেছে শরীরের ওপর দিয়া।

অফিসে থাকে বড় কম; যতটুকু থাকেও, নিয়মিত কাজকর্মের দিকে মন দিতে পারে না, কেমন একটা চঞ্চল অন্যমনস্ক ভাব, যেন প্রতি মুহূর্তেই অধীর আগ্রহে কি একটা আশা করিতেছে। টেলিফোনের হিড়িক গেছে বাড়িয়া, দুর-দূরের পাল্লা—দিল্লী, রাঁচি, আসাম; খুব কাছে হইল তো কলিকাতা।

এর মধ্যে আর একটা নূতন ব্যাপার এই যে কয়েকদিন হইতে একটি অচেনা লোকের যাতায়াত আরম্ভ হইয়াছে। লোকটি বাঙালী নয়, লম্বা গলাবন্ধ কোট গায়ে, মাথায় কালো লম্বাটে একটা টুপি, আসে একটা বড় মোটরে করিয়া; কখনও আসে ব্রজলালের সঙ্গেই, তাহার গাড়িতে; এক একদিন এখানে থাকিয়া যায়, রাত্রিও কাটায় এখানেই, তাহার পর দুইজনেই কোথায় কি উদ্দেশ্যে ঘোরাঘুরি করিতে বাহির হইয়া যায়।

জাহ্নবীর কাজ কমিয়াছে, এমনি অফিসে থাকে কম ব্রজলাল, তাহার উপর আজকালকার গতিবিধি, আলাপ-আলোচনার মধ্যে একটা গোপনীয়তার চেষ্টা আছে।

তা থাক, জাহ্নবীর তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কিন্তু একটা সূক্ষ্ম অনুভূতির দ্বারা যেন বুঝিতে পারে কি একটা মস্তবড় গলদ জমা হইতেছে। তাহার সঙ্গে

জাহ্নবীর হয়তো কোন সম্পর্ক নাই, তবু একটা অস্বস্তি বোধ করে। ওর যেন মনে হয়, চারিদিকের হাওয়াটা অল্পে অল্পে বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছে।

এর একটা প্রমাণ একদিন যেন পাওয়া গেল, যদিও বেশ নিঃসন্দিগ্ধভাবে নয়। একদিন অনুলেখ লওয়ার জন্য ডাক পড়িতে জাহ্নবী নিচে গিয়া দেখিল ব্রজলাল দুইটা হাতের মধ্যে মাথাটা গুঁজিয়া টেবিলের ওপর ঝুঁকিয়া বসিয়া আছে। এমন কিছু নূতন দৃশ্য নয়—আজকাল প্রায়ই যে রকম ক্লান্ত আর অবসন্ন থাকে, তবু একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করিলই। জাহ্নবী প্রশ্ন করিল—"আমায় ডেকেছেন ?"

মাথা না তুলিয়াই ব্রজলাল বলিল—"কেন ?"

সাড়া দেওয়ার ভঙ্গিতে জাহ্নবী একটু হকচকিয়া গেল, শুধু প্রশ্নের ওপর অদ্ভুত প্রশ্ন নয়, স্বরটাও গাঢ়। একটু হতভম্ব হইয়া গেলেও কিন্তু সাদা মনেই প্রশ্ন করিল—"শরীরটা কি আপনার বড্ড খারাপ ?"

ব্রজলাল সঙ্গে সঙ্গেই একটু ঝাঁকানি দিয়া মাথাটা তুলিয়া প্রতিপশ্ন করিল —"ডু আই লুক ইট ?" (Do I look it ?)

চোখ দুইটা ঈষৎ লাল, মুখটা থম্‌থমে, ঠোঁটের এক কোণে অল্প একটু অবোধ হাসি লাগিয়াই আছে। কয়েক সেকেণ্ড চাহিয়া থাকিয়াই কিন্তু মাথাটা গুজিয়া লইল, বলিল—"ও, জাহ্নবী দেবী ?...ভয়ানক ক্লান্ত, একটু ঘুমিয়ে আসি, তারপর ডাকব।"

জাহ্নবী কয়েক সেকেণ্ড কেন যে দাঁড়াইয়া রহিল, নিজের কাছে তাহার কোন জবাবদিহি পাইল না, শেষে—"তা হলে আসি এখন" বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

সিঁড়ি দিয়া উঠিতে নিজের শরীরটাকে অদ্ভুতভাবে ভারী বোধ হইতেছে। ...এ আবার কি রূপ ব্রজলালের! সুরা আসিতে আরম্ভ করিল নাকি ? আসিবার কথা, জাহ্নবী জানে, তবে মাতাল দেখে নাই। জীবনে, এত বড় একটা সর্বনাশ বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না, তাহা ভিন্ন ব্রজলালও প্রমাণের খানিকটা বাকি রাখিয়া দিল, অর্থাৎ জাহ্নবীর সামনে আর উঠিয়া গেল না, তাহা হইলে, মাতাল সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হইলেও তাহার সন্দেহটা তখনই মিটিয়া

যাইত। কিন্তু এই প্রথম আর এই শেষ। জাহ্নবী একটু সতর্কই রহিল, কিন্তু এ ধরণের ব্যাপার আর চোখে পড়িল না। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করিল— একটা জবাবদিহি করিয়া ব্যাপারটুকু জাহ্নবীর মন থেকে মুছিয়া ফেলিবার জন্ত ব্রজলাল যেন অতিরিক্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল—অত্যন্ত ক্লান্ত ছিল—উপরি উপরি দুই রাত ঘুম হয় নাই,—তাহার উপরও একটা দরকারি সাক্ষাৎকারের জন্ত নিচে আসিয়া বসিতে হইয়াছিল—শরীরের এমন অবস্থা, মনের অবস্থা, কাহাকে যে কি বলিয়াছে কিছুই মনে নাই ব্রজলালের···ভাগ্যিস বাহিরের কেহ আসে নাই, নহিলে কী যে মনে করিত !···

একবারে নয়, কয়েকবারে কথাটা বলিল, প্রত্যেকবারেই একটা অভি-মতের জন্ত জাহ্নবীর মুখের পানে একটু করিয়া চাহিয়া রহিল ; কিন্তু প্রতিবারেই সন্দেহটা বাড়িয়া যাওয়ায় জাহ্নবী "ও !···তাই তো !···তাই নাকি ?" বলিয়াই সারিল।

প্রথমটা মনে মনে অতিশয় ভীত হইয়া পড়িল। তাহার পর রাগে, অসহায়তায়, মা-দাদুর ওপর অভিমানে মরিয়া হইয়া পড়িল ; সহ্য করিয়া থাকিবে, যত বড়ই সর্বনাশ আসুক না কেন, যে-পথেই আসুক, চাকরি ছাড়িবে না বরং আসুক সর্বনাশ, একটা কিছু হইয়া এ পর্বটা শেষ হোক, আর সহ্য হয় না।

সর্বনাশটা এবার অন্ত পথে উঁকি মারিল।

দিন কয়েক কাটিয়া গেছে, সেদিনের ঘটনার জেরটুকু পর্যন্ত মিলাইয়া আসিয়াছে, এমন সময় ব্রজলালের হঠাৎ আর একটা রূপান্তর ঘটিল।

এবারেও নূতন কিছু নয়, সেই কর্ম উন্মাদনা, শুধু আরও বাড়িয়া গেছে, যেন জোয়ারের ওপর বান ডাকিয়াছে। নূতনত্বের মধ্যে এই যে, এবারে বাহিরে ঘোরাঘুরির চঞ্চলতা নয়, অফিস থেকে আরম্ভ করিয়া বাড়ির চৌহদ্দিটা যায় পিছনের বাগান পর্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফিটফাট করিয়া তুলিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে ব্রজলাল। সকাল থেকেই লোক লাগিয়া গেল, নিজে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তদারক করিতে লাগিল। সাড়ে দশটায় অফিস খুলিলে মজুমদারমশাইকে

নিজের কক্ষে ডাকিয়া পাঠাইল—খাতা-পত্র লেখায় যদি কিছু বাকি-বকেয়া থাকে তো আজই ঠিক করিয়া লইতে হইবে; তা' ভিন্ন এ দুদিন অফিসটাও যেন বেশ ছিমছাম থাকে, সবাই যেন নিজের নিজের বেশ-ভূষার দিকেও নজর রাখে একটু, জবরজঙ্গ হইয়া অফিসে না আসে।

নিজের কক্ষটা উদ্ধবের সাহায্যে ঠিক করিয়া লইয়া ব্রজলাল আফিসঘরে আসিয়া, একবার ভালো করিয়া চোখ বুলাইয়া লইয়া জাহ্নবীর ঘরে উঠিয়া গেল। জাহ্নবী কাজ করিতেছিল, কিছু না বলিয়া ব্রজলাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিল একটু, মুখে একটা তৃপ্ত হাসি, সোফাটাকে একটু পিছনে ঠেলিয়া ঘরের মাঝখানের জায়গাটুকু বাড়াইয়া দিল, আলমারির ডালা খুলিয়া দু'একখানা বই ঠিক করিয়া বসাইয়া দিল, একটা টানিয়া লইয়া কয়েক ছত্র পড়িলও, তাহার পর হঠাৎ একটু ব্যস্ত হইয়াই সেটা রাখিয়া দিয়া বলিল—"নাঃ, আপনার ঘরটা দেখতে আসাই ভুল, "ইট্স্ এ ন্যুক্ ইন্ হেভ্ন্।" (• It's a nook in heaven)

যেমন মন্থর গতিতে প্রবেশ করিয়াছিল সে তুলনায় বেশ ত্রস্তভাবেই বাহির হইয়া গেল, যেন কি একটা দরকারি কথা মনে পড়িয়া গেল। জাহ্নবী নিজের চেয়ারে কাঁটা হইয়া বসিয়াছিল, কাজের ওপর দৃষ্টি রাখিয়া, ব্রজলালের গতিবিধির দিকে মন রাখিয়া। কৌতূহল হইলেও কোন প্রশ্ন করিল না; নামিয়া গেলে জানালার বাহিরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া এই নূতন সমস্যা লইয়া মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া গিয়া ঘরের দুয়ারটা নিঃশব্দে অর্গলিত করিয়া আবার নিজের চেয়ারে আসিয়া সেইভাবে বসিল।

সমস্ত ব্যাপারটা পরের দিন পরিষ্কার হইয়া গেল।

সকালে প্রায় নয়টার সময় ব্রজলাল হঠাৎ এ-বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। একটা চনমনে ভাব; প্রচণ্ড একটা অধীরতাকে যেন রাশ করিয়া রাখিয়াছে। অম্বিকাচরণ আর নারায়ণীর সঙ্গেই একথা-সেকথা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল বটে, যেমন সাধারণতঃ করে কিন্তু জাহ্নবী বুঝিল তাহাকেই দরকার। ও যে ব্রজলালের অফিসেই চাকরি করে একথাটা এখনও গোপন আছে এ বাড়িতে; উদ্ধবেরও তাই এদিকে মাড়ানো মানা, কিছু

এটকা দরকারি কথা বলিতে ব্রজলাল যে তাই নিজেই আসিয়াছে জাহ্নবীর এটা বুঝিতে বাকি রহিল না।

এক সময় নারায়ণী একটু আড়াল হইলে, ছোট একটা চিরকুট মুড়িয়া জাহ্নবীর সামনে ফেলিয়া দিল, তাহার পর অম্বিকাচরণের কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

জাহ্নবী একটু আড়াল হইয়া পড়িল, লেখা আছে—"অফিসে যতশীঘ্র পারেন চলে আসুন, বিশেষ দরকার।"

কয়েকদিন থেকে মনের উপর একটার পর একটা ঝড় বহিয়া চলিয়াছে—দ্রুতগতিতে সমস্ত ব্যাপারটা যে চরমে আসিয়া পড়িতেছে এটা বোঝে জাহ্নবী; যাইবে কি একেবারেই কাজে ইস্তফা লিখিয়া পাঠাইয়া দিবে ঠিক করিয়া উঠিতে দেরি হইল; তাহার পর যাওয়াই ঠিক করিল, আজ যাহার মানে হয়তো আগুনেই ঝাঁপ দেওয়া।

গেট হইতে দেখিল ব্রজলাল অধীরভাবে বুকে হাত দুইটা জড়াইয়া বারান্দায় পায়চারি করিতেছে। জাহ্নবী প্রশ্ন করিল—"ব্যাপারখানা কি?"

ব্রজলাল অন্যমনস্কভাবে তাহার মুখের দিকে একটু চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল—"ও!......আছে একটা কাজ, পরে শুনবেন...মজুমদারমশাইকেও ডেকে পাঠিয়েছি—আর সবাইকেও......"

জাহ্নবী ওপরে উঠিয়া গেল। মনটা খুবই চঞ্চল, বাহিরের দিকের জানালার সামনে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; একটু পরেই দেখিল একটা আঁটসাঁট প্যাণ্টালুন আর ঢিলেঢালা কোটে জবরজঙ্গ হইয়া মজুমদারমশাই হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ করিতেছে। আর একটু পরে একে একে অন্য কেরানিরাও আসিয়া উপস্থিত

এরপর প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে একটা মোটরের শব্দে চকিত হইয়া জানালার পানে চাহিতে জাহ্নবী দেখিল মাঝারি সাইজের একটা জীপগাড়ি আসিয়া ফটকের সামনে দাঁড়াইল এবং জনতিনেক মিলিটারি পোষাকপরা সাহেবের মধ্য থেকে একজন নামিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। ব্রজলাল নিশ্চয় বারান্দায় সেইভাবে অপেক্ষাই করিতেছিল, হন্তদন্ত হইয়া আগাইয়া গিয়া

মাঝপথ হইতে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিল। এরপর ওপর থেকে আর কিছু দেখা গেল না।

জাহ্নবী বুঝিল এই লোকটার জন্যই দু'দিন থেকে এত তোড়জোড়। এখানে মিলিটারি অফিসার দু'একজন আসিয়াছে; কিন্তু এত আড়ম্বর হয় নাই কখনও; পোষাকে চেহারায় জাহ্নবীর এটাও মনে হইল এ লোকটা যেন একটু বিশিষ্ট।

একটা সহজ কৌতূহলে কিছু একটা আন্দাজ করিবার জন্যই জাহ্নবী সোফায় বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। নিতান্ত অলস চিন্তা, কিন্তু সহসা একটা প্রশ্ন কোথা থেকে আসিয়া মনে উদয় হইতেই জাহ্নবীর শরীরটা হিম হইয়া গেল।—তাহার ঘরটা অত তদারক করিবার কি প্রয়োজন ছিল ব্রজলালের? —যেন এই ব্যবস্থারই উপলক্ষে?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিচের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হইল এবং একটা কিছু ভাবিয়া স্থির করিয়া লইবার আগেই ব্রজলাল আর আগন্তুক সাহেব গট-গট করিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। ব্রজলালের মুখটা রাঙা হইয়া গেছে, স্নায়বিক উত্তেজনায় একটু যেন কাঁপিতেছে; ঘরের মাঝখানে আসিয়া বিলাতী কায়দায় হাতটা বাড়াইয়া জাহ্নবীকে সাহেবের কাছে পরিচিত করিল।…"এই আমার স্টেনো এবং সেক্রেটারী। পরিচিত করিয়ে আমি বিশেষ আনন্দ পাচ্ছি এইজন্যে যে ইনি কেম্ব্রিজ কোর্সে শিক্ষিতা।"

সাহেব করমর্দনের জন্য হাতটা বাড়াইয়া বলিল—"বিশেষ আনন্দিত হ'লাম আপনার পরিচয় পেয়ে। কোন্ স্কুলে ছিলেন আপনি।"

জাহ্নবীর আর দ্বিধা করিবারও সময় রহিল না, হাতটা বাড়াইয়া দিয়া বোর্ডিংটার নাম বলিল। সাহেব করমর্দন করিতে করিতেই বলিল—"বিশেষ আনন্দিত হলাম।"

তাহার পর হাতটা হাতে রাখিয়াই ব্রজলালের পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"তাহলে আপনার এই কাটখোট্টা কারবারের মধ্যে উনি বিদ্যে আমদানী ক'রেছেন দেখছি।" (She has imported Scholarship into your prosy firm !)

ব্রজলাল হাসিয়া উত্তর করিল—"তা করেছেন। ঐ ওঁর বইয়ের আলমারি।…শেলীর বড় ভক্ত।"

"তাহলে কাব্যও আমদানী করেছেন!" (Ah, Poetry too!)

হাসিয়া জাহ্নবীর দিকে চাহিয়া বলিল—"আনন্দিত হ'লাম।"

হাতটাতে একটু নাড়া দিয়া ছাড়িয়া দিল, তাহার পর ঘরের এদিকে একবার নজর বুলাইয়া—"বেশ—চমৎকার—বাঃ—বলিতে বলিতে ব্রজলালকে সঙ্গে করিয়া নামিয়া গেল।

তেতাল্লিশ

বোধ হয় ঘণ্টাখানেক পরে সাহেবকে বিদায় দিয়া ব্রজলাল আবার জাহ্নবীর ঘরে আসিল। উল্লসিত আবেগে উঠিয়া আসিতেছিল, সিঁড়ির ওপর থেকেই জাহ্নবীকে দেখিয়া থতমত খাইয়া গেল। সে বাড়ির দিকের জানালার সামনে একটা পাথরের মূর্তির মতো স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মুখের মাত্র আধ-খানা দেখা যায়, কপাল থেকে চিবুক পর্যন্ত সমস্ত রেখাটা যেন একখানি নগ্ন খড়্গ।

ব্রজলাল ঘরের মাঝামাঝি না আসা পর্যন্ত হুঁস হইল না জাহ্নবীর। যখন ফিরিয়া দেখিল তখন কিন্তু দৃষ্টিটা প্রসন্ন না হইলেও শান্ত, কতকটা নির্বিকার, ভাবলেশহীন; ফিরিয়া দেখিলেও নিজে হইতে কোন প্রশ্ন করিল না।

ব্রজলাল একটু অপ্রতিভ ভাবে বলিল—"শরীরটা খারাপ নাকি?…একটা ভাল খবর দিতে এসেছিলাম।"

জাহ্নবী শুষ্ক কণ্ঠে উত্তর করিল—"খারাপ? নাতো!…খবরটা কি?"

"আজ একটা মস্তবড় লাভের পথ খুলে গেল—একটা খুব বড় কন্‌ট্রাক্ট্ পেয়ে গেলাম…"

বোধ হয় আগ্রহান্বিত প্রশ্নের প্রত্যাশায় একটু থামিল, না পাইয়া কিন্তু দমিল না; মুখ একবার খুলিয়া গেছে, বলার আনন্দেই বলিয়া চলিল—"এইটের জন্যেই এতদিন ধরে চেষ্টা করছিলাম—এই প্রায় হপ্তা দুয়েক ধরে অনেক

কাঠখড় পুড়িয়ে শেষ পর্যন্ত গেলাম পেয়ে—ঐ যে সাহেব এসেছিল—অর্ডারও একরকম দিয়েই গেল—মেজর জি-ও টায়ান্ট—ওই এখন ইষ্টার্ণ কম্যাণ্ড কমিসেরিয়েটের সবচেয়ে বড় সাহেব, একজন আমেরিকান—এই করতেই আসাম থেকে এসেছে—মিলিটারিতে চাল আর আটা সাপ্লাই করবার কন্‌ট্রাক্ট —যাদের হাতে ছিল তাদের অনেকের বদনাম হয়ে গেছে—কেড়ে নিয়ে নতুন লোককে দিচ্ছে—অনেক চেষ্টায় পাওয়া গেল···আপনি এতবড় খবরটাতেও যেন ইন্‌টারেষ্ট পাচ্ছেন না জাহ্নবী দেবী, সত্যিই শরীরটা খারাপ নাকি ?"

জাহ্নবী এবার কথা কহিল, বলিল—"ইন্টারেস্ট আমার না পেয়ে উপায় নেই ব্রজবাবু, কেননা কাঠখড় যা পুড়িয়েছেন কন্‌ট্রাক্টটা পাওয়ার জন্যে তার মধ্যে একটা কাঠ হচ্ছি আমি।"

"কি রকম। আপনি!···"

"হ্যাঁ, আমি।···ব্রজবাবু, আমি গেরস্ত বাঙালী ঘরের মেয়ে, বোর্ডিঙে বিলিতি কোর্স পড়েছি বটে, কিন্তু মনিবের ব্যবসায়ে সুবিধে হবে বলে অপরিচিত মিলিটারি সাহেবের সঙ্গে হাত মেলাবার জন্যে নয়। আমার হাতটা এখনও জ্বলছে।"

জাহ্নবীর ঠোঁট দুইটা থরথর করিয়া বার দুই-তিন কাঁপিয়া উঠিল। ব্রজলাল স্তম্ভিত হইয়া শুনিতেছিল, কতকটা অবসন্নভাবে সোফাটায় গিয়া বসিল। দুই হাতের মুঠা একত্র করিয়া তাহার ওপর মুখটা চাপিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর মুখ তুলিয়া বলিল—"বুঝেছি জাহ্নবী দেবী, কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনি যা ভেবে কথাটা বলছেন সে রকম কিছু ভেবে আমি কাজটা করতে যাইনি; তবু অন্যায় হয়েছে, মাফ করুন।"

"মাফ করা না করার অধিকার আমার নেই, আমি চাকর, সহ্য ক'রে যাবার কথা, তা করছি।"

ব্রজলাল আবার সেইভাবে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল; মুখটা রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, একটু পরে আবার বলিল—"আমায় ক্ষমা করুন। স্বীকার করছি, যে-ভাবেই হোক, কাজটা অন্যায় হয়ে গেছে।···অনেক আজে-বাজে ফার্ম কন্‌ট্রাক্ট ধরায় বদনাম হ'য়েছে, আমার ফার্মটা ভদ্র, এইটে বোঝাবার

জন্তে প্রাণপাত করেছি ক'দিন থেকে। আমি মনে করি আমার ফার্ম সবচেয়ে গৌরব করবার যদি কিছু থাকে তো সে আপনি, তাই—নিতান্ত সেই কথা ভেবেই…"

"তাই একটা লাভের আশায় আমায় দাঁড়িপাল্লায় তুললেন ?"

এতদিনের সম্পর্কে এই প্রথমবার ব্রজলালের দৃষ্টি হঠাৎ উগ্র হইয়া উঠিল, অনেক কষ্টে সেটা কতকটা নরম হইয়া আসিল বটে, তবে কণ্ঠস্বর রুক্ষই রহিল, বলিল—"জাহ্নবী দেবী, মুখে যাই বলুন, এ ফার্মে সহ্য করবার কথা যে মনিবেরই এইটেই ধ'রে বসে আছেন আপনি। এক বৎসর ধরে এই ব্যাপারই চলেছে, আজ কিন্তু তার চুড়ান্ত হয়ে গেল।… আমি বার বার করে আপনাকে বলছি—ব্যবসার লোভে আপনার অমর্যাদা করব এমন কদর্য কথা আমি ভাবতে পারি না, তবু আমাকে অপদস্থ করবার যেন ঝোঁক চেপে গেছে। এ-ক্ষেত্রে আমায় মেনে নিতেই হচ্ছে যে, এই উদ্দেশ্যেই আমি সাহেবকে ডেকে এনে আপনার সঙ্গে শেক-হ্যাণ্ড করিয়েছি। তা হলেও তো আমি আপনার চাকরির সর্তের বাইরে যাইনি—আপনার মনে থাকতে পারে, গোড়াতেই বলেছিলাম মেয়ে ক্লার্ক বিজনেসের দিক থেকে ভালো, আজকাল বড় সব আফিসের একটা স্টাইল ওটা। আমার আফিসেও যে সেই স্টাইল মেনটেন করি, সাহেবকে দেখালাম মাত্র সেটা ; স্বার্থ ছিল। আপনার না পছন্দ হয়, যার পছন্দ হয়, এমন মেয়েকে রাখতে হবে আমায়।"

এরপর আর কেহ কাহাকেও বুঝিবার চেষ্টা করিল না।

ব্রজলাল অবশ্য অন্ত মেয়ে-কেরানি ভর্তি করিল না। যখন বলে কথাটা তখনও নিশ্চয় সে রকম কোন উদ্দেশ্য ছিল না, তবে জাহ্নবীর সঙ্গে ব্যবহারটা নিতান্ত যান্ত্রিক গোছের হইয়া পড়িল। সমস্ত কাজ জমা হইলে আফিস ঘণ্টার শেষের দিকে একবার করিয়া নিচে ডাকে, এক সঙ্গে সমস্ত দিয়া দেয়, বুঝিয়া লয়। কথাবার্তা প্রাণহীন ভদ্রতার ওপরে ওঠে না কখনই।

হয়তো এভাবটা টিকিত না, ভালোবাসাই আবার জয়ী হইত—কেননা সত্যই ভালোবাসিয়াছিল ব্রজলাল ; কিন্তু পুরুষের ভালোবাসা অন্ত জাতের ;

সে একটাকে আশ্রয় করিয়া মরিতে চায় না, নব নব বাধায়, নব নব উন্মাদনায় নূতনকে আশ্রয় করিয়া নিত্য নব কলেবরে বাঁচিয়া থাকিতে চায়। ব্রজলাল নিজের কাজকে ভালোবাসিয়াছিল। তবু নারীর ভালোবাসাটাই জয়ী হইত বোধ হয়, বয়সেরও একটা ধর্ম আছে; কিন্তু সেদিকে ক্রমাগতই বাধা; ব্রজলাল নিজের ব্যবসায়কেই নিজের সমস্ত মন-প্রাণ সমর্পণ করিল,—এই শেষ আঘাতটায় একেবারে শেষবারের মতো।

শুধু মনপ্রাণই নয়, একনিষ্ঠ প্রণয়ীর মতো নিজের বিবেক পর্যন্ত নিঃশেষে উজার করিয়া দিল এই নূতন প্রণয়াস্পদার চরণে। তাহার পর যাহা হয়—অর্থাৎ নিজেও নিঃশেষ হইতে বসিল।

সেটা কিন্তু পরের কথা, তাহার আগে বিবেকের কথাটাই বিশদ করিয়া বলা দরকার—

যুদ্ধের বাজারে সব চেয়ে বড় যে-কটা রোজগারের পন্থা ছিল, তাহার মধ্যে একটা ছিল মিলিটারি কনট্রাক্ট, অর্থাৎ সামরিক বিভাগের কাজকর্ম হাতে লওয়া। এর খরচের কোন হিসাব ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাজ করিয়া দিতে হবে—একটা সময়ের মধ্যে—যত টাকা লাগে দিবে গৌরীসেন। কাগজের টাকা, তাহার জন্য কাহারও দুর্ভাবনা ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইংরেজ-পক্ষের গৌরীসেন চার্চিল একদিন পার্লামেন্টে একটা প্রশ্নের উত্তরে বলে ভারতবর্ষে সমস্ত লড়াইটা চালাইতে লাগে বাৎসরিক দুই লাখ টাকা—অর্থাৎ নোট ছাপাইবার জন্য কাগজের দামটা।

যুদ্ধের আগে, মৃত্যুর মহাযজ্ঞের মধ্যে মানুষের জীবন সম্বন্ধে আসে অবিশ্বাস। এ অবিশ্বাস কিন্তু বৈরাগ্য আনে না, তাহা হইলে যুদ্ধদানবের রুজি মারা যাইত। আসে উৎকট, উদ্ভট এক ভোগলিপ্সা; দুদিনের জীবন, কখন কাহার সন্ধ্যা আসে বলা যায় না; ভোগ করিয়া লও। প্রায় ওপর থেকে সব বড় বড় অফিসারদেরই হাত-পাতা—ঘুষ দাও, কাজ নাও, যত মোটা পার বিল্ পাঠাও, শুধু আমার হিস্সাটা তাতে ভালোভাবে যেন বসানো থাকে।

কাজ রকমারি, তাহার মধ্যে বন কাটিয়া—কখনও বা গ্রামকে গ্রাম

নিশ্চিহ্ন করিয়া বাড়ি তোলার কাজটা বেশ শাঁসাল। এতদিন ব্রজলালের হাতে শুধু এই কাজ ছিল।

তাহার পর সন্ধান পাইল এর চেয়েও একটা বড় কাজ আছে, রসদ সরবরাহ। এর লাভের পরিমাণ কল্পনা করিতেও যেন মাথা ঘুরিয়া যায়। বাড়িঘর বড় একটা প্রত্যক্ষ জিনিস, তুলিবার পর দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিজের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিবে, না দাঁড়াইলে থাকিবে শূন্যতার অভিযোগ; কিন্তু চাল-আটার স্থান সেপাইদের উদরে। আসামের প্রান্তে যুদ্ধ চলিতেছে, ফৌজকে ফৌজ যখন লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, তখন চাল-আটা যথাস্থানে পৌঁছিল কি না পৌঁছিল কে তাহার হিসাব রাখিতেছে? একের জায়গায় দুনো, তিনগুণ চতুর্গুণ—এতো সাধারণ কথা। সরবরাহ নাই মোটে, অথচ বিল পাশ হইয়া উপর থেকে নিচে পর্যন্ত যথাযোগ্য ভাগাভাগি হইয়া গেল, হিসাবের এ-ভোজবাজিও হইয়া যাইতেছে গোলে হরিবোলের মধ্যে। কে দেখিবে?—যে রক্ষক সেই ভক্ষক; চার্চিল তো সহস্র-লোচন নয়।

এইখানেই শেষ নয়, চাল-আটা সরবরাহ না হোক বা আংশিক হোক গৃহস্থের কাছ থেকে খরিদের ঢালোয়া পরোয়ানা কনট্রাক্টরদের হাতে—গবর্ণমেণ্টের সস্তা রেটে। দেশে দুর্ভিক্ষ—হাহাকার, সেই চাল আটা যদি জুৎ করিয়া গুদামসাৎ করিয়া রাখা যায় তাহা হইলে—সে তো স্বর্গকে ধরাতলে নামাইয়া আনা! ওদিকে গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে অখণ্ড বিল, এদিকে সেই মালই আবার দেশের লোকের সামনে বাহির করিয়া দেওয়া—ধীরে ধীরে, ক্ষুধা বাড়ুক আরও বাড়ুক, মৃত্যুর কাছাকাছি আসিয়া পড়ুক দেশ, একের জায়গায় দশ দিবে, বিশ দিবে, পঞ্চাশ দিবে। না দিয়া যাইবে কোথায়?

ব্রজলাল এই কামধেনুর জন্য প্রাণপাত করিয়া ফিরিতেছিল; অত মেহনৎ করিয়া বনকাটা আর ঘর তোলার উৎসাহ আসিয়াছিল কমিয়া। এ কয়টা দিন একেবারে চৈতন্যরহিত হইয়া ছুটাছুটি-তদ্বির করিয়া ফিরিতেছিল বলা চলে—ঘাঁৎঘোঁৎ বুঝিয়া অফিসারদের ধরা, যাহারা এ-কাজের কাজী; গুদামের ব্যবস্থা করা, ওপরে উঠিয়া কনট্রাক্টটা জোগাড় করা। ওর সত্যই জ্ঞান ছিল না, সাফল্যের মুখে, উল্লাসের অধীরতায় ও জাহ্নবীকে লইয়া যেটুকু করিল

তাহার মধ্যে অন্ততঃ জ্ঞাতসারে কোনরকম কুৎসিত মনোবৃত্তি ছিল না; সত্যই নিজের কারবারের আভিজাত্যটা প্রমাণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। ওর মনটা একমুখী হইয়া পড়িয়াছিল,—কাজটা চাই-ই,—তাহাতে কোথায় কি ত্রুটি-বিচ্যুতি হইয়া গেল অত খুঁটাইয়া দেখিবার ধৈর্য ছিল না ওর, খুব বেশি বলিলে এই পর্যন্ত বলা যায়।

চুয়াল্লিশ

কনট্রাক্ট পাওয়া গেল। নূতন কাজ পুরা দমে আরম্ভ হইয়া গেল। সব কাজেই মানুষ অন্ততঃ গোড়ার দিকটা একটু সাবধানে অগ্রসর হয়, ব্রজলালও শুরু করিল সেইভাবেই, কিন্তু বার-কতক খরিদ-সরবরাহ করার পর আর তাল রাখিতে পারিল না। লড়াই জিনিসটাই একেবারে অনিশ্চিত, তাহার ওপর স্পষ্ট বুঝা যায় তাহার আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে, বলা নাই কহা নাই কোন দিন শেষ হইয়া যাইবে কে জানে, কিভাবে কাহাকে জয়মাল্য দিয়া?—তখন অনুশোচনায় নিজের আঙুল কামড়ানো ভিন্ন গতি থাকিবে না।

সব ঠিক করিয়া নামা। লম্বা কোট আর কালো টুপি পরিয়া যে-লোকটি মাঝে মাঝে আসিত তাহার সঙ্গে আছে গুদামের বন্দোবস্ত। বরানগরে, কলিকাতার একরকম বুকের ওপরেই বিরাট বাড়ি; মাথা নাই, হাতপা নাই, শুধুই পেট, হাজার হাজার মণ চাল আটার বস্তা আত্মসাৎ করিতে পারে। মিলিটারির জন্য গৃহস্থের নিকট হইতে একরকম জোর করিয়া খরিদ করা রসদ ধীরে ধীরে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল; খরিদ্দারও তৈয়ার—আবার ধীরে ধীরে উল্টা পথে বাহির হইয়া যাইতে লাগিল।

অসম্ভব লাভ, কল্পনাতীত, সত্যই মাথা ঘুরিয়া যায়। তাহার পর ঘূর্ণায়মান মস্তিষ্কের বিভ্রমে যাহা চিরকালই অর্থের পথ বাহিয়া আসিয়াছে—বিলাসব্যসন, তাহাও একে একে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল।

প্রথমে প্রচ্ছন্নভাবে, চোরের মতো, যেমন সব পাপই আসে। তাহার পর স্পষ্ট ঔদ্ধত্যে। সুরা লইয়া সেদিন যে সন্দেহ ছিল সেটা আর রহিল না।··· সেই কালোটুপিওয়ালা লোকটার আনাগোনা ফের বাড়িয়াছে, কয়েকজন

মিলিটারি সাহেবেরও; মাঝে মাঝে রাত কাটায়। 'ভিকৃট্রি লজ' একট প্রমোদের আড্ডা হইয়া উঠিয়াছে, কলিকাতার ভেজালের মধ্যে থেকে দেহ-মনের ক্লান্তি অপনোদনের জন্য সবাই ছুটিয়া আসে সপ্তাহে দুই-তিনবার করিয়া। এক একদিন মত্ত উল্লাসের রোল উঠিয়া নৈশ আকাশ মথিত করে।...নারায়ণী অম্বিকাচরণ প্রথমটা চকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু এমন সহজভাবে মানিয়া লইল যেন ব্রজলালের যে শেষ পর্যন্ত এই পথ, এটা যেন বহু পূর্ব থেকেই জানা ছিল। জ কে কেহ কিছু বলিল না। অম্বিকাচরণ যে কিছু বলে না তাহার কারণ ভয়ে নিরাশায় তাহার জিভ অসাড় হইয়া গেছে; তবে নারায়ণীর নীরবতার কারণ যে মেয়ের ওপর অভিমান এটা বুঝিতে জাহ্নবীর বাকি থাকে না।

তাহারও অভিমান আছে, ক্ষোভ আছে; মায়ের ওপর, নিজের অদৃষ্টের ওপর, দুই একসঙ্গেই জড়ানো। একটা প্রচ্ছন্ন উল্লাসও আছে—দেখো তোমার অত সুখ্যাতির ব্রজলাল!...আমি তো চিনিয়াছিলাম, অনেকদিন আগেই মুক্ত হইতে চাহিয়াছিলাম, তুমিই বেটাছেলের কাছে এত নিগ্রহ সহিয়াও তো আবার মোহে পড়িয়াই রহিলে।

আফিসে কাজ নাই বিশেষ। পুরাণো অর্থাৎ ঘরবাড়ি তোলার কাজটায় ঢিলা পড়িয়াছে। কতকটা যুদ্ধের শেষ অবস্থা বলিয়া কাজ কমিয়াছে, কতকটা ব্রজলালের ইচ্ছাকৃত শিথিলতা, এ-লাভের কাছে ও-লাভটাকে লোকসানের সামিলই মনে হয়। নূতন কাজের বেশিটাই গোপনে, লেখালেখির বালাই অল্প।...প্রচুর অবসর। আগে অল্প একটু অবসর পাইলেও বইয়ের সঙ্গে কাটাইত জাহ্নবী, এখন ও-পাটই তুলিয়া দিয়াছে, বেশির ভাগই বাহিরের দিকে মুখ করিয়া সোফায় গা এলাইয়া দিয়া ভাবে। নিজেদের জীবনের কথা, তাহার পাশাপাশি ব্রজলালের জীবন। এক ধরণের আনন্দ পায় ব্রজলালের এই পরিবর্তনে এই হিসাবে যে, এটা পুরুষের স্পষ্ট রূপ।...আলো ভালো; অন্ধকার ভালো, কিন্তু আলো-আঁধার বড় একটা বালাই; যতদিন ব্রজলালের দোষের সঙ্গে কতকগুলা গুণের অস্পষ্ট রেখা মেশানো ছিল ততদিন সে ছিল বড় অস্বস্তিকর একটা ব্যাপার। এ এখন বেশ—স্বার্থ, প্রবঞ্চনা, অর্থ, সম্ভোগ—যে সম্ভোগে আর কাহারও দিকেই দৃক্‌পাত নাই—নারকীয় উল্লাসে গৃহের

অপর অংশেই যে তিনটি জীব ত্রস্ত, বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেছে—তাহাদের দুইজন অসহায় নারী, একজন অন্ধ, সে দিকে যে বিন্দুমাত্র খেয়াল নাই, এ একটা বেশ স্পষ্ট জিনিস, পুরুষের স্পষ্ট রূপ, চেনা যায়, বোঝা যায়; মা-দাদুর জিহ্বা পর্যন্ত আর প্রশংসায় চঞ্চল হইয়া ওঠে না।···জাহ্নবী আনন্দ পায়; ঠিক উল্লাস নয়, স্পষ্ট দৃষ্টিতে দেখার একটা স্বাচ্ছন্দ্য।

ঘৃণায় আক্রোশে জাহ্নবীর মনটা ভরিয়া ওঠে, নিজেদের জীবনের যত অত্যাচার, যা কিছু ব্যর্থতা, সব খুঁজিয়া খুঁজিয়া স্মরণ করিয়া সেই ঘৃণা আক্রোশকে পুষ্ট করে। এই পুরুষই তাহার জননীকে এক আশ্রয় থেকে অন্য আশ্রয়ে তাড়া করিয়া ফিরিয়াছিল, অরণ্যচারিণী করিয়াছিল। এই পুরুষেরই স্বরূপ সে দেখিয়াছে উৎসবে, তীর্থস্থানে, বোর্ডিঙে, কিরণময়ের রূপে। ঘৃণাকে ফেনাইয়া তোলে জাহ্নবী।···সান্ত্বনা এই যে, এ-ই ওদের ধ্বংসের পথ। যাক্, দ্রুত নামিয়া যাক।···ডোরা বলে—ওদের ধ্বংসের পথে ছেড়ে দাও, ওই ওদের প্রাপ্য। ডোরাই চেনে ওদের, যত অণিমারা মোহের আঁচল দিয়া ওদের ঘিরিয়া রাখে, ওদের ধ্বংসের সময় দেয় বিলম্বিত করিয়া।···বড় আনন্দ হয় যে, জাহ্নবী ব্রজলালকে দূরে রাখিয়া গিয়াছে, শেষ পর্যন্ত ওর দিক থেকেও যে একটা প্রত্যাশা ছিল সেটাকেও তীব্র আঘাতে চূর্ণ করিয়া দিয়াছে; এখন দুজনের মধ্যে যোজনব্যাপী ব্যবধান।···জাহ্নবীর ইচ্ছা করে ডোরাকে ডাকিয়া একবার বলে কথাটা; জানায় যে অণিমা দিয়াই জগৎ পূর্ণ নয়, জাহ্নবীও আছে সেখানে।

এক একদিন কিন্তু কি হয়, চিন্তায় আসে অবসাদ, নিজের মনের আগুন নিজের মনকেই দেয় গলাইয়া, চোখের জ্বালা চোখের জলে যায় নিভিয়া। সব ব্যক্তিগত আক্রোশ, ব্যক্তিগত অভিমান মিলাইয়া গিয়া জীবন সম্বন্ধেই একটি ক্লান্ত প্রশ্ন থাকে জাগিয়া। জীবন কেন এমন? এত ভ্রান্তি, এত শ্রান্তি, এত বেদনা কোনখানেই বা থাকিবে কেন লাগিয়া? ক্ষুদ্র ভেদাভেদ, ক্ষুদ্র ঘৃণা-অভিমানের উর্দ্ধে মনটা যেন একটা অনন্ত বেদনা-লোকে উঠিয়া যায়।

এসব কিন্তু মনের বিলাস এবং তাহা একটা বড় কথা জাহ্নবীকে ভুলাইয়া

রাখিয়াছিল।—সেটা এই যে, পাশে আগুন লাগিলে নিজের ঘরেরও বিপদ আছে। দুইটা ব্যাপারে জাহ্নবী সে বিষয়ে সজাগ হইয়া উঠিল।—

একদিন উদ্ধব আসিয়া দু'একটা নকল দেখাইবার পর বলিল—"দিদিমণি, মজুমদার মশাই আপনাকে বলতে বলেছিলেন···"

থামিয়া গেল; জাহ্নবী সচকিত হইয়া উঠিল, বলিল—"আমাকে বলতে বলেছিলেন?—কি রে? বল্, চুপ করলি কেন?"

"বলেছিলেন—আপনি সাহেবকে একটু সামলান্ না, বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন, কারবারে ক্ষতি হচ্ছে।"

জাহ্নবী একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এদিকটা খেয়াল হয় নাই; অথচ খুব স্বাভাবিক ওদের সবার পক্ষে এইরকম ভাবা। আর ওদের ধারণা, কি এইটুকুতেই শেষ হইয়াছে যে, জাহ্নবীর খানিকটা প্রভাব আছে ব্রজলালের ওপর? সেটা হয়তো আগেও ছিল কতকটা, এখন নিশ্চয় এ পর্যন্ত আগাইয়া গেছে যে, আজকাল রাত্রে যে নরকলীলা অনুষ্ঠিত হয় এই বাড়িতে জাহ্নবীই তাহার প্রাণকেন্দ্র।

ঘৃণার পাশে আতঙ্ক আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কেমন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে, এ আতঙ্কও কাটাইয়া উঠিল। যাক, পরের অভিমত লইয়া মাথা ঘামাইলে এক পা চলা যায় না এই দুনিয়ায়; আর মিথ্যাই তো এ ধারণা?

তাহার পর আতঙ্কটা বাস্তবের রূপে আরও ঘেঁষিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

দুই দিন পরের কথা। জাহ্নবী অফিস হইতে ফিরিলে নারায়ণী তাহাকে ইসারা করিয়া সদর দরজার কাছে, অর্থাৎ অম্বিকাচরণের শ্রুতির বাহিরে লইয়া গেল। তাহার পর শুষ্কমুখে বলিল—"এতদিন কিছু বলিনি, কীই বা বলব, সব দেখতেই পাচ্ছিস—আর কিন্তু নিশ্চিন্দি থাকা যায় না মা। আজ ব্রজর মেসো এসেছিল—সেই লোকটা, বারাণসী নাম।"

জাহ্নবী প্রশ্ন করিল—"বাড়িতেই এসেছিল নাকি? ভেতরে?"

একেবারে ভেতরে—যে মানুষটাকে ব্রজ একদিন এই বাড়ি থেকেই অমন করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, এই বাড়িরই মান-মর্য্যোদার দিকে চেয়ে।"

ভীতভাবে মুখের পানে চাহিয়া রহিল নারায়ণী। জাহ্নবী প্রশ্ন করিল—"কি বললে?"

"সেইটেই আরও ভয়ের কথা জান্থু, বললে ব্রজই ডাকিয়ে এনেছে, কারবারটা আর একলা সামলাতে পারছে না। এতদিনও ওই সামলাচ্ছিল, কলকাতায় থেকে, এখন আর একেবারে সামনে এসে না বসলে চলে না। বাবার সঙ্গে সেই রকম আত্মীয়তা করে সব বলতে লাগল। এতদিন একটা ভরসা ছিল জান্থু, ওদিকে যাই করুক, বাড়ির এদিক পা দেয়নি ব্রজ তার মানে চোখের পর্দাটা যায়নি, জানে আমাদের সামনে মুখ দেখানো শক্ত ওর। আজ ও নিজে আসেনি, কিন্তু তার চেয়ে এ যা করলে সেটা যে আরও ভয়ঙ্কর মা, ভয়ে আমার হাত পা সরছে না!"

জাহ্নবীও এই ধরণেরই কথা একটা ভাবিতেছিল—মিলিটারি সাহেবের আমদানিটা বাড়িয়াছে এদিকে, প্রায়ই জীপে করিয়া আসে কাজের জন্যে, আবার নিছক সুরার জন্যও, কিন্তু আর ঘটা করিয়া পরিচিত করা তো দূরের কথা; ওদের বর্তমানে ব্রজলাল কখনও ডাকিয়াও পাঠায় নাই জাহ্নবীকে।

কিন্তু প্রমাণ জড়ো করিয়া নারায়ণীকে শুধু আরও শঙ্কিত করিয়া তোলা। জাহ্নবী ওদিকে না গিয়া প্রশ্ন করিল—"তাহলে তোমরা দুজনে কিছু ভেবেছ তো মা?"

"দুজনের মধ্যে একজন বুড়ো, অন্ধ, দ্বিতীয়জন মানুষের মধ্যেই নয়—পিসিমা গিয়ে আমারও আর পদার্থ নেই জাহ্নবী। ভেবে যা ঠিক করবার তা তো তুই করবি।"

"ধরো, বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার কথাটা…"

"আজ হোলে কালকের জন্যে ব'সে থাকি না মা।"

"এই বাড়ির ঠিকানা দিয়ে দাদুর মেয়ে নাতনির জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। যদি কখন কেউ আসে তো আমাদের পাবে না।"

নারায়ণীর মুখটা শুকাইয়া গেল, জাহ্নবী বুঝিতে পারিল না বাবাকে হারাইবার ভয়ে, কি তাহার মেয়ে-নাতনি খুঁজিয়া পাইবে না সেই ভয়ে। প্রশ্ন করিল—"আসছে নাকি কারুর চিঠি পত্তর?"

"কোন সময়ে না কোন সময়ে আসবে আশা করেই তো দেওয়া বিজ্ঞাপনগুলো। এখন ঠিকানা বদলাতে গেলে দেরি হবে। আরও গোলমালের সম্ভাবনা আছে।"

"এদের এখানে ঠিকানা দিয়ে গেলেই হবে।"

"একজন মাতাল—তার মাথার ঠিক নেই, আর একজন তার সহকারী—আমাদের জন্যে কোন ব্যথাই নেই।...বরং আমি ভুল বলছি মা, তার মাথা ব্যথা বোধ হয় বড্ড বেশি, সেই জন্যে এখান থেকে লুকিয়েই আমাদের পালানো ভাল বোধ হয়, ঠিকানা না দিয়ে।"

নারায়ণী বিহ্বলভাবে হাতটা বাড়াইয়া জাহ্নবীর কাঁধের ওপর রাখিল, বলিল—"জান্নু, সময় থাকতে তোর কথা শুনিনি, তার কি শোধ নিচ্ছিস মা কতকগুলো সমিস্তে এনে ফেলে ? একটা কথা ভেবে দেখ, তখন কি অবস্থা ছিল, এখন কি হয়েছে।...ধর যদি ভুলই হয়ে থাকে আমাদের, সেই কথা ধরে থাকবার কি সময় ? আমার যে কী করে কাটছে মা, সমস্ত রাত জেগে থাকি, শরীর আমার কাঁপে জাহ্নবী, বুক ধড়ফড় করে আমার...।"

আর বলিতে পারিল না, আঁচলটা তুলিয়া চাপা স্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

জাহ্নবী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কান্না দেখিয়া সব মেয়েছেলের মতোই মনটা উথলিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু ওর মনে একটা ধারাই বহে না। যে দুঃখ, অপমান, আশঙ্কায় এই অশ্রু তাহার সম্বন্ধেই কি-একটা কঠিন সঙ্কল্প লইয়া ও নিশ্চলভাবে খানিকটা দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর কহিল—"মা, তাহলে তোমায় সব কথা খুলে বলতে হোল—যখন অমন একটা অপবাদ দিচ্ছ আমায়। দিন চারেক হোল আমি একটা চিঠি পেয়েছি—মনে হচ্ছে দাদুর মেয়েরই চিঠি—যেমন সব নাম ধাম পরিচয় দিয়ে লিখেছে..."

নারায়ণীর মুখটা সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ণ হইয়া গেল। তবু উৎসাহ দেখাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"সত্যি লিখেছে নাকি জান্নু ?"

বুদ্ধিমতী কন্যার কিন্তু বুঝিতে বাকি রহিল না ; বলিল—"হ্যাঁ, লিখেছে মা, সে-ই, যতদূর আন্দাজ করছি। কিন্তু আমি এখনও কোন উত্তর দিইনি—পোষ্ট বক্স দিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, নাম ঠিকানা দোব, তবে তো আসবে। যদি

বলো কেন দিসনি, তবে তার ঠিক উত্তর দিতে পারব না—বোধ হয় দাদুকে হারাতে হবে বলেই একটা কেমন গড়িমসি করার ভাব এসে গেছে।··· তোমারও এই ভাবটা এসেছে মা।"

নারায়ণী চুপ করিয়া একদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, দুই গণ্ড ধুইয়া আবার দর বিগলিত ধারায় অশ্রু বহিয়া যাইতে লাগিল। জাহ্নবীও অনেকক্ষণ নিঃশব্দে রহিল দাঁড়াইয়া, তাহার পর বলিল—"এক কাজ করা যাক না হয় মা, যেমন বলছ, চলো ছেড়ে যাই এ জায়গা, আমরাই তাঁদের ওখানে গিয়ে উঠি; একটা আশ্রয় পাওয়া যাবে আপাতত।"

নারায়ণী কন্যার বুকে একেবারে লুটিয়া পড়িল, অশ্রুরুদ্ধ স্খলিতকণ্ঠে বলিল—"ও জাহ্নবী, ভগবান আমায় একি পরীক্ষায় ফেললেন মা?

এ যে কী পরীক্ষা জাহ্নবীও নিজের মন দিয়া বোঝে, তাহাকেও তো সেখানে আর একজনের পাশে দাঁড়াইতে হইবে, দাদুর নিজের নাতনি—রক্তের টান, জাহ্নবীর মতো জোড়াতালি দেওয়া সম্বন্ধ নয়···পারিবে সে-নাতনির সামনে গিয়া দাঁড়াইতে একটু দয়ার আবেদন লইয়া—এই দাদুর একটু ভাগ পাইবার জন্য?

ওর কিন্তু চোখে অশ্রু নাই। রক্তে একটা বিষ ঢুকিলে বাহির হইতে যে ধরণেরই আঘাত লাগুক, সেই একটি বিষকেই বিচলিত করে; জাহ্নবীর মনকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে ঘৃণার বিষ—পুরুষের প্রতি, সেই থেকে সাক্ষাৎভাবে ব্রজলালের প্রতি; আঘাত যেভাবেই আসুক—নিরাশা, বঞ্চনা, দুঃখ, অপমান—আর যে পথ দিয়াই আসুক, ঐ একটি অনুভূতিকেই করে পুষ্ট।

জাহ্নবী মাকে কাঁদিতে দিল অনেকখানি, কতকটা শান্ত হইলে বলিল—"থাক, ভেবেই বোলো মা, খুব এমন তাড়াতাড়ি কিসের?—পাওয়া তো গেছে সন্ধান? আমার দিক থেকে শুধু তোমায় বলছি, আমি তোমার মেয়ে, ছেলে বেলা থেকেই নিজেকে বাঁচিয়ে চলা আমার শিক্ষা মা। আর এ বাড়িতে তোমার পায়ের ধুলো আছে—মনে কু নিয়ে যে এ বাড়িতে চৌকাঠ মাড়াতে যাবে, সে আপনি ধ্বংস হবে···মানে, তার ধ্বংসের ব্যবস্থা হবে।

পরের দিন সন্ধ্যায় জাহ্নবী বেড়াইতে বাহির হইতেছিল, চৌকাঠ থেকে প্রায় বাহির হইয়াই দেখিল বারাণসী হন হন করিয়া আগাইয়া আসিতেছে, তাহাকে দেখিয়াই একগাল হাসিয়া বলিল—"এই যে নাতনি!···কাল এসেছিলাম, কিন্তু···"

জাহ্নবীর মুখটা রাঙা হইয়া উঠিল, আগাইয়া গিয়া বলিল—"আপনি একবার এদিকে আসুন।"

বারাণসী থতমতো খাইয়া গিয়া অনুসরণ করিলে, খানিকটা তফাতে একটা কামিনী গাছের আড়ালে গিয়া দুজনে দাঁড়াইল। জাহ্নবী প্রশ্ন করিল—"কোথায় যাচ্ছিলেন আপনি ?"

বারাণসী হাসিবার চেষ্টা করিয়াই বলিল—"ঐ বাড়িতে দাদার সঙ্গে একটু···"

"কেন ?—ও বাড়িতে আপনার ঢোকা তো মানা···দিদিমা নেই বলে ?"

"তা নয়—তা নয়—কথা হচ্ছে···"

"শুনুন, এ বাড়ির চৌকাঠের ভেতর পা দিলে পুলিশ কেসে পড়বেন। আপনাকে যিনি একদিন তাড়িয়েছিলেন তিনি আবার ডেকে আনায় আপনার আস্পর্ধা বেড়ে গেছে। তাঁকেও তাহলে কথাটা বলে দেবেন; বরং আর একটু বলে দেবেন—তিনি যে ধরণের ব্যাপার ক'রছেন, পাশের একটা ভদ্র পরিবারকে যেভাবে উদ্বাস্তু করে তুলেছেন, চৌকাঠ না মাড়ালেও তাঁকে যাতে পুলিশের হাতে পড়তে হয় তার ব্যবস্থায় আছি।"

বারাণসীকে সেইখানে কাষ্ঠপুত্তলিকার মতো দাঁড় করাইয়া বাগান অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল জাহ্নবী।

পঁয়তাল্লিশ

পুলিশ জাহ্নবীর ভরসায় বসিয়া ছিল না। ইতিমধ্যে অনেকদিন পূর্বেই একটি ব্যাপারের সূত্রপাত হইয়াছিল, চক্ষুর অন্তরালে হইয়াও গিয়াছিল অনেক কিছু।

লড়াইয়ে জোগান দেবার সবক্ষেত্রেই যে একটা বিরাট বিশৃঙ্খলা চলিয়াছে, এটা গবর্ণমেন্টের সুপরিজ্ঞাত ছিল, কিন্তু লড়াই-ই একটা মস্ত বড় বিশৃঙ্খলা, গবর্ণমেন্টের নিজের অস্তিত্বই সংশয়াকুল, সুতরাং কে চুক্তিপূর্ণ না করিয়াই বা অংশত সরবরাহ করিয়া বিল আদায় করিয়া লইয়া গেল সে-বিষয়ে অত অবহিত হইবার ইচ্ছা ও অবসর দুইয়েরই অভাই ছিল। তাহা ভিন্ন অবহিত হইয়াই বা ফল কি? কণ্ট্রাক্টারদের সাহসের উৎস কোথায় গবর্ণমেণ্টের তো সেটা অপরিজ্ঞাত ছিল না—বড় বড় সামরিক অফিসার পর্যন্ত এ ব্যাপারে লিপ্ত, একটু নাড়া দিতে গেলেই সমর-ব্যবস্থার সমস্ত কাঠামোটাই ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে।

তবুও সামরিক বিভাগের একটা অংশ হিসাবে গোয়েন্দারা রুটিনগত কাজ অল্প অল্প করিয়া যাইতেছিল, এক রকম দেখিয়া শুনিয়াও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া।

কোহিমার যুদ্ধের পর একটু নিঃশ্বাস ফেলিবার ফুরসৎ হইল গবর্ণমেণ্টের। ঘর সামলাইবার দিকে খানিকটা নজর দিতে পারিল। এর আরও একটা দিক ছিল; ক্রমাগত নোট ছাপাইয়া টাকা ঢালা এতদিন, এ ব্যাপারটা আর বেশিদিন চলিতে দিলে মুদ্রাস্ফীতির চাপে শাসন ব্যবস্থা অচল হইয়া দাঁড়াইবে, সুতরাং এবার কণ্ট্রাক্টারদের দেনা মিটাইবার পালা বন্ধ করিয়া যাহারা এতদিন নিরুপদ্রবে খাইয়া পেট মোটা করিয়াছে তাহাদের দোহন করা দরকার। ঘুষ আর চুক্তিভঙ্গের মকদ্দমার একটা মরশুম পড়িয়া গেল, তবে বাদসাদ দিয়া, নহিলে ঠগ বাছিতে তো গাঁ উজাড় হইয়া যায়। যুদ্ধ এখনও বর্মায় চলিতেছে। একধার থেকে সবাইকে ধরিতে গেলে সঙ্কট অবস্থা দাঁড়াইয়া যাইবে।

ব্রজলালের ওপরও নজর ছিল, কিন্তু সাধারণ যা নৈতিক অবস্থা, সে-হিসাবে তাহার উপর বিশেষ নজর দেওয়া দরকার বোধ করে নাই গবর্ণমেণ্ট। নিজের ভোগ-বিলাসের দিকটা কম, ওপরের সবাইকে দিয়া থুইয়া বেশ হাতেও রাখিয়াছিল। কণ্ট্রাক্টারির প্রথম অংশটা নির্বিঘ্নেই কাটিয়া গেল।

দ্বিতীয় অংশের ইতিহাসটা অন্য রকম। চাল-ডাল-আটা লইয়া গবর্ণমেণ্ট এক সময় কণ্ট্রাক্টারদের সঙ্গে এক রকম যোগ-সাজসেই ছিনিমিনি

খেলিয়াছিল—জাপানীদের ভয়ে "পোড়ামাটি নীতি" অবলম্বন করিয়া যখন কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ আমদানি করে। এখন সে ভয়টা অনেকটা কাটিয়া আসিয়াছে, সুতরাং রসদের কণ্ট্রাক্টারদের অত তোয়াজ করিবার দরকার নাই। চুক্তি পাকা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোয়েন্দা বিভাগও এদিকে অভিনিবিষ্ট হইয়া উঠিল। এই নাগাদ ব্রজলালের উচ্ছৃঙ্খলতা হঠাৎ বাড়িয়া গিয়া যেমন তাহাদের সন্দেহ আরও পুষ্ট করিল, তেমনি তাহাকেও করিয়া তুলিল অসতর্ক ; এই অসতর্কতার ঝোঁকে ক্রমাগতই একটার পর একটা ভুল করিয়া সে বিপদের গহ্বরে নামিয়া যাইতে লাগিল। জীবন ক্রমাগতই হইয়া উঠিতে লাগিল উচ্ছৃঙ্খল।

এমন সময় একদিন দুপুরে ব্রজলালের আফিস কক্ষে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত হইল। বয়স প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ বৎসর মনে হয়। রঙে দেহের গঠনে, কেশে, মুখের ডৌলে সৌন্দর্যের সব কিছুই বর্তমান, তবুও ঠিক সুন্দরী কিনা বলা কঠিন, কোথায় কি যেন একটা কি আছে যা নারী-শ্রীর পরিপন্থী। এদিকে আগাগোড়া খদ্দরের বেশভূষা, পায়ে এক জোড়া নিতান্তই সাদা-মাটা স্যাণ্ডাল, হাতে খদ্দরের একটি সুদৃশ্য ঝোলা—গান্ধীজীর মূর্তির ছাপ মারা। আগে উদ্ধবের হাতে একটা কার্ড পাঠাইয়া দিয়াছিল, ডাক পড়িলে ভিতরে গিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইতে ব্রজলাল চেয়ার দেখাইয়া বসিতে অনুরোধ করিল।

প্রশ্ন করিল—"কি দরকার আপনার ?"

স্ত্রীলোকটি ঝোলার মধ্যে থেকে একটা হ্যাণ্ডবিল বাহির করিল, তাহার পর ঝোলাটা গান্ধীর মূর্তি ওপরে করিয়া টেবিলে রাখিয়া হ্যাণ্ডবিলটা বাড়াইয়া ধরিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"ভিক্ষেয় বেরিয়েছি।"

দুর্ভিক্ষের জন্য সাহায্যের জন্য একটা আবেদন, কোন্ এক গান্ধী- আর্তত্রাণ-মহিলা-সমিতির পক্ষ হইতে। ব্রজর মুখটা একটু গম্ভীর হইয়া গেল এবং পড়িতে যতটা সময় লাগা উচিত, তাহারও অতিরিক্ত সময় লইয়া হ্যাণ্ডবিলটার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর একটা যেন উপায় ঠাহর হইয়াছে এইভাবে মুখটা অল্প দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং একটু হাসিয়া চোখ তুলিয়া বলিল—"আপনি ভুল জায়গায় এসে প'ড়েছেন, হয়তো অত খেয়াল না ক'রেই,—আমি লড়াইয়ে সাহায্য করে

টাকা উপার্জন করি, অর্থাৎ হিংসার প্রশ্রয় দিয়ে। এটা আপনাদের গান্ধীজীর নীতির…”

“কিন্তু আপনি তো তাঁর নীতি মানছেন না?”

“কে আর মানছি বলুন?”

“তাহলে তাঁর নীতির এটুকুই বা মানছেন কেন যে, যুদ্ধে রোজকার করা টাকা ভালো কাজে দেওয়া উচিত নয়?”

তর্কের ধাঁধা একটা; বুঝিতে একটু সময় দিল স্ত্রীলোকটি, তাহার পর এক সঙ্গে দুজনেই হাসিয়া উঠিল, ব্রজলাল অপ্রতিভ হইয়া কিছু বলিবার আগেই স্ত্রীলোকটি বলিল—“না, দয়া করে তর্কের আশ্রয় নেবেন না, পেরে উঠব না। দিন; আর শুধু আপনার টাকার জন্মেই তো আসিনি, একদিনের জন্মেই তো আসা নয়, আরও আসব, এসে জ্বালাতন করব। আপনার অগাধ প্রতিপত্তি— অনেকদিক দিয়েই আপনার সাহায্যের পরামর্শের আশা রাখি আমরা…”

যে একদিন উপার্জনের পথ নিষ্কণ্টক রাখিবার জন্ম দুর্ভিক্ষপীড়িতদেরও মিলিটারিদের হাতে তুলিয়া দিতে পারিয়াছিল, এ সব সাধারণ বুলির কাটান্ তাহার কাছে অনেক আছে; কিন্তু ব্রজলাল আজকাল নারীসৌন্দর্য সম্বন্ধে একটু অন্যভাবে সচেতন, তাহা ভিন্ন আর একটা কথা তাহার মনে পড়িতেছিল, একবার শেষ চেষ্টা করার; অন্যমনস্কভাবে শুনিতেছিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—“আচ্ছা, আপনি একবার আমার সঙ্গে…দেখি একটা ব্যবস্থা যদি হয়, আসুন।”

মনে হঠাৎ একটা স্ফূর্তির জোয়ার আসিয়াছে, সঙ্গে সুন্দরী, তাহার পর সামনেও একটা বড় চান্স—যদি ভেজে জাহ্নবীর মন। কথাবার্তা কহিতে কহিতেই উপরে উঠিয়া আসিতেছে; সামনে নিজে, দু'ধাপ পেছনে স্ত্রীলোকটি; জাহ্নবী টেবিলে কি একটা লিখিতেছিল, পায়ের শব্দে একটু চকিতভাবে ঘুরিয়া চাহিল। সঙ্গে সঙ্গেই তাহার দৃষ্টি বিস্ফারিত হইয়া উঠিল এবং সে বিস্ময়ের চোটেই দাঁড়াইয়া উঠিল।

ব্রজলালের পিছনেও এই ধরণেরই ব্যাপার, স্ত্রীলোকটি থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে

দৃষ্টিতে এক সঙ্গে আনন্দ, বিস্ময়, বিজয়োল্লাস; কিন্তু অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতি, সঙ্গে সঙ্গেই নিজের ঠোঁটের ওপর আঙ্গুল চাপিয়া জাহ্নবীকে চুপ করিতে ইশারা করিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই মুখের ভাবটাও সহজ করিয়া লইল।

ব্রজলাল জাহ্নবীর বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টি অনুসরণ করিয়াই পিছনে চাহিয়াছিল, কিন্তু প্রবঞ্চিত হইয়া হাসিতে হাসিতেই আগাইয়া আসিয়া জাহ্নবীকে বলিল—"ও, আমার ওপরই রাগ এখনও?...আমি এসেছি এঁকে ইনট্রোডিউস্ করে দিতে—এণ্ড্ দিস্ টাইম্ ইট্ ইজ্ নট্ এ মেজর। এসেছেনও একটা ভালো কাজে।"

রসিকতাটুকু যে সুরুচিসঙ্গত হইল না, স্ফূর্তির চোটে সেটা খেয়ালের মধ্যেই আসিল না ব্রজলালের, নিজে একটা চেয়ার টানিয়া স্ত্রীলোকটিকে সোফাটা দেখাইয়া বসিতে অনুরোধ করিল। তাহার পর বলিল—"কৈ, একটা হ্যাণ্ডবিল দিন ওঁকে।"

ঘরের হাওয়াটা যেন বন্ধ হইয়া গেছে, ভিতরের উত্তেজনায় জাহ্নবী একটু একটু কাঁপিতেছে, ওর সেই পুরানো বিদ্বেষ জাগিয়া উঠিতেছে আশঙ্কা করিয়া ব্রজলালের মনের সরসতাটুকু দ্রুত শুকাইয়া আসিতেছে; স্ত্রীলোকটি প্রার্থীর প্রত্যাশার ভাব মুখে লইয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া আছে। পড়া শেষ করিয়া জাহ্নবী নিরুৎসাহকণ্ঠে একবার উভয়ের পানে চাহিয়া বলিল—"যতটুকু সাধ্য না হয় দেব।"

তাহার পর ব্রজলালের মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"আমার আর বিশেষ উৎসাহ নেই, আসল সময়েই কিছু করতে পারলাম না, দুর্ভিক্ষ এখন তো অনেকটা আয়ত্তের মধ্যে।"

ব্রজলাল শুষ্ক কণ্ঠে একটা ঢোক গিলিল, আগন্তুককে বুঝিতে না দিবার চেষ্টা করিয়া কতকটা ব্যাকুল কণ্ঠেই বলিল—"ভুলুন সে পুরানো কথা জাহ্নবী দেবী, পুরানো সব কথাই ভুলুন—ইট ইজ নেভার টুলেট টু মেণ্ড, সবাইকে সে অবসর দেওয়াও উচিত।"

ব্রজলাল বুঝিল না, তবে সংলাপ যে একটা অপ্রিয় পথে যাইতেছে

সেটাকে রোধ করিবার জন্যই জাহ্নবী একটু ক্লান্তভাবে হাসিয়া বলিল—"বেশ, কি করতে পারি, বলুন আমায়।"

ব্রজলালের মুখটা আবার দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে ; মনের কপাট চারিদিকেই যেন ছুড়দাড় করিয়া গেছে খুলিয়া ; স্ত্রীলোকটির দিকেই চাহিয়া বলিল—"আপনি খদ্দরধারিণী, নিয়েও রয়েছেন একটা ভালো কাজ, নিঃস্বার্থ, আপনাকে বলতে দোষ নেই। গবর্ণমেণ্টের কন্‌ট্রাক্টার, ওরা এসব পছন্দ করে না, তার ওপর নিই-বা না নিই, কাঁচা টাকার কারবার, একটা বদনাম আছেই, তাই আমার যা দেবার ইচ্ছে, সেটা ওঁর হাত দিয়েই দিতে চাই। খুলেই বললাম আপনাকে, এখন উনি যা বলেন।..."

জাহ্নবীর পানে চাহিল।

জাহ্নবী প্রশ্ন করিল—"কত বলব বলুন ; কত দেবেন ?"

"যত খুশি—"

মুখটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, জীবনের একটা চান্স্ কিনিতেছে, শুধু ঐ হিসাবটাই আছে মনে।...স্ত্রীলোকটি উদাসীন ঔৎসুক্যে নিঃশব্দে বসিয়া আছে।

জাহ্নবী একটু হাসিয়া বলিল—"আমি যদি এখন বলি দশ হাজার..."

"যদি কম না মনে করেন তো বলুন, নৈলে পনের, বিশ, যদি তারও বেশি আপনার ইচ্ছে হয়..."

চাপা উদ্বেগে ব্রজলালও কাঁপিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্ত্রীলোকটি একবার নির্বিকার দৃষ্টি তুলিয়া চাহিল।

জাহ্নবী বলিল—"বেশ, আপনি নিচে যান। এঁদের কি রকম দরকার না দরকার বুঝে নিয়ে আপনাকে জানাচ্ছি।"

স্ত্রীলোকটিকে বলিল—"আপনার জন্যে একটু জল-টলের ব্যবস্থা করি আগে, ক্লান্ত রয়েছেন, এসেছেনও ঠিক দুপুরে।"

ইঙ্গিতটা ব্রজলালকে।

..."সে আপনাকে ভাবতে হবে না, আমি করছি ব্যবস্থা।"—বলিয়া ব্রজলাল ত্বরিতপদে নামিয়া গেল।

ছেচল্লিশ

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ মিলাইয়া যাইবার পূর্ব্বেই জাহ্নবী আবার আগের মতো বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া চাপা গলায় বলিল—"ডোরাদি!…একি কাণ্ড।"

ডোরার মনটা নানারকম চিন্তার এলোমেলো স্রোতে বিক্ষুব্ধ, কিন্তু ওপরটা শান্ত। কত কথা কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলিয়া আসিতেছে, কড়া শাসনে সেগুলাকে যথাস্থানে ধরিয়া রাখিয়া শুধু বলিল—"তুমি এখানে?…খুব আশ্চর্য করে দিয়েছিলে তো আমায়!…কি? চাকরি?"

"খাতিরের বহর দেখে বিশ্বাস করা শক্ত হচ্ছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সত্যিই চাকরি। সব কথা শুনবে ক্রমে ক্রমে, কিন্তু আমার চেয়ে তোমার কাণ্ড-কারখানা বিশ্বাস করা যে আরও শক্ত ডোরাদি। একি বেশ! এ কি মিশন! …তুমি হঠাৎ খদ্দর পরে দুর্ভিক্ষের জন্যে চাঁদা…"

ডোরা ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"যে দুর্ভিক্ষে মেয়েদের সঙ্গে পুরুষও মরছে—এই তো?—বুঝেছি। সেও শুনবে ক্রমে ক্রমে। কিন্তু আগে তোমার কথা বলো, ডোরা ইজ্ অলওয়েজ চেঞ্জেব্‌ল এ্যাজ্ দি ইংলিশ ওয়েদার,—নয় কি?"

"আমার কথা! তাই আগে শোন ডোরাদি; সত্যিই এত বলবার আছে, কিন্তু আরম্ভ করি কোথায়? তোমাকে এত দরকার জীবনে আমার কখনও হয়নি ডোরাদি। বছর দেড়েক আমি এসেছি, কিন্তু এই দেড় বছরের মধ্যে এত সব ঠাসা আছে—এত অপমান, লাঞ্ছনা, অবিচার যে একদিনে বলে শেষ হবার নয়। এর মধ্যে একটা মৃত্যু পর্যন্ত ধাক্কা দিয়ে গেল—সে যে কি মর্মান্তিক!

"আমি আবার আসব জাহ্নবী, তোমার মনিবকেও বলেছি, তাঁর সাহায্য দরকার আমার; শুনব একে একে। একদিনে বেশিক্ষণ বসে থাকাও ঠিক নয়। হয়তো আমাদের সম্বন্ধটা উনি আন্দাজ করে নিতে পারেন, যা ঠিক এখন আমি চাই না কোন একটা কারণে—আন্দাজও করতে পার কারণটা

তুমি—যা করতে এসেছি বুঝে।…কিন্তু এই যে লাঞ্ছনা অবিচার সেটা কার হাতে?…তোমার মনিবের প্রোটেকশন পাও না?"

"প্রোটেক্‌শন!—ওরই তো সব অত্যাচার ডোরাদি, এমন কি, দিদিমা যে মারা গেলেন তার কারণও…"

"সে কি!…ওঁর ব্যবহার তো খুবই ভালো মনে হোল, সত্যি কথা বলতে কি এত ভালো যে সেইটেই মন্দ লাগছিল আমার। এত টাকা যে দিতে চাইছেন, সে তোমার হাত দিয়েই—অবশ্য যেমন বললেন, ওঁর নিজের দেওয়ার বাধা আছে, কিন্তু তোমায় খুশি করবারও ভাব আছে তো সেই সঙ্গেই।"

জাহ্নবী এইখান থেকে আরম্ভ করিল—বাড়ী দখল করা থেকে স্বরু করিয়া এই দেড় বৎসরের যত বড় বড় ঘটনা—ওদের সঙ্গে ব্রজলালের ঘনিষ্ঠতা, ওদের তিনজনকে করায়ত্ত করিয়া লওয়া, জাহ্নবীর প্রতি দৃষ্টি, ছোটখাট খিটিমিটি জাহ্নবীর সঙ্গে। যখন দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের মিলিটারির হাতে তুলিয়া দেবার কাহিনী শেষ করিয়া চেক দেবার কথায় আসিয়াছে—ডোরা অভিনিবেশসহকারে শুনিতেছিল—হঠাৎ সচকিত হইয়া উঠিল, বলিল—"ঠিক কথা, এই যে চেকটা দেবেন বলেছেন, জাহ্নবী, সেটা ভূয়ো, না সত্যি?"

"সত্যিই তো মনে হয় ডোরাদি, সে তো প্রমাণও হয়ে যাবে এক্ষুনি…"

"অত টাকা দেবে?—পনের হাজার—বিশ হাজার—তারও বেশি তুমি যদি বলো।"

অনেকদিন পরে দরদী শ্রোত্রী পাইয়া—শুধু শ্রোত্রীই কেন?—দীক্ষা-গুরুই তো—জাহ্নবী মনের কপাট খুলিয়া ধরিল, যত আক্রোশ পুঞ্জীভূত হইয়া আছে সমস্ত বাহির করিয়া বলিল—"পঁচিশ—পঞ্চাশ তো ওর হাতের ময়লা ডোরাদি, দেয়ই তো, কি এমন বেশি দেবে? মিলিটারি কন্‌ট্রাক্টে, খালি ঘুষ খাওয়াচ্ছে আর টাকা টানছে, এই তো দেখে আসছি, আজ এই এক বছর ধরে, তার ওপর এই মাসখানেক থেকে আবার রসদ সাপ্লাইয়ের কন্‌ট্রাক্ট পেয়েছে—এখন তো পোয়া বারো ওর…"

"তার মানে?"

"পুকুরকে পুকুর চুরি।"

—ডোরা যে পুরুষের কীর্তির অভিজ্ঞতায় জাহ্নবীর কত নিচে নামিয়া গেছে, সেই গৌরবেই জাহ্নবী বলিয়া যাইতে লাগিল—"তুমি খদ্দর পরে মাটি হয়ে গেছ ডোরাদি। (একটু হাসিয়া)—একেবারে মাটি হয়ে গেছ বলাও চলে—পুরুষদের সবচেয়ে উন্নতির যুগে তাদের সবচেয়ে বড় কীর্তির কথাগুলোই অজ্ঞাত থেকে গেল তোমার।...পুকুর চুরি নয়তো কি?—মাল আসামে যাচ্ছে বলে কলকাতার গুদামে গিয়ে ঢুকছে—বিলের টাকা এদিকে ঠিক বাক্সয় এসে হুড়হুড়িয়ে পড়ছে—এক এক ক্ষেপে এক লাখ, সওয়া লাখ, দেড় লাখ..."

ডোরা উদাসীন কণ্ঠে বলিল—"তুমি আবার তেমনি আমার চেয়েও এগিয়ে গেছ জাহ্নবী—মানে পুরুষদের নিন্দেয়—যে দোষটা আমারই আগে বেশি ছিল—অবিশ্যি এখনও একেবারে যায়নি।...সত্যি বলছ, না আমার সেই রোগ?"

জাহ্নবী মুখটা অবজ্ঞায় একটু কুঞ্চিত করিল, বলিল—"সত্যিই খদ্দরে তোমার মাথা খেয়েছে ডোরাদি।...আচ্ছা দাঁড়াও, আমি গুদামে ঢুকে দেখবার পথ বাৎলে দিলে বিশ্বাস করবে?"

ডোরা বিদ্রূপে অবিশ্বাসে চোখ তুলিয়া একটু হাসিল, বলিল—"গুদামে ঢোকা!—না অতটা নিশ্চয় পারব না যদিও অণিমাদির ওপর একদিন যে ভাবে গোয়েন্দাগিরি করতে দেখেছ, তাতে তোমার প্রশ্নটা করায় দোষ দিই না...তবু শুনি পথটা কি?"

আবার অবহেলাভরে একটু হাসিল।

"আসছই তো এখন মাঝে মাঝে—লম্বা কোট আর কালটুপি পরে যে লোকটি যাওয়া আসা ক'রছে—একদিন না একদিন পড়বেই চোখে—সে কোথায় গিয়ে ওঠে দেখো কলকাতায়।...অবিশ্যি আন্দাজেই বলছি, তবে ভুল নয়।"

ডোরা যেন হঠাৎ সচকিত হইয়া উঠিল, যেন তাহার খদ্দরের ধর্ম নষ্ট হইতেছে এই অনধিকার চর্চ্চায়, সমস্তটা মন থেকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিল—"যাক; আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরের দরকার নেই—ও যা করেছি এক সময় করেছি—তুমি চেকটা আনিয়ে দাও দিকিনি, যদি সত্যি হয়।"

"কত বলব ?…তোমার দরকার সম্বন্ধে আলোচনা তো খুব হ'ল তখন থেকে।"

ডোরা ভাবিল, তাহার পর বলিল—"সমস্ত বাংলাটাই তো একটা বুভুক্ষু হাঁ হয়ে দাঁড়িয়েছে, চাইবার কি পরিমাণ হয় ?…বেশ, হাজার পঁচিশের কথা বলো না, দেখাই যাক , একেবারে একটা বড় অঙ্ক পেলে ঘোরার হাত থেকেও পরিত্রাণ পাই ; ক্লান্ত হয়ে পড়ছি, অব্যেস নেই।…নিজেই যাবে ?"

"না, একটা স্লিপ লিখে দিলেই হবে।"

স্লিপটা লিখিয়া উদ্ধবকে ডাকিতে যাইতেছিল—ডোরা তীক্ষ্ণ উৎকণ্ঠায় নিজের একটা তর্জনীর নখ দাঁতে খুটিতেছিল—উঠিয়া গিয়া জাহ্নবীর কাঁধে হাত দিল, বলিল—"দাঁড়াও, একটা কাজ করতে পারবে ?"

জাহ্নবী একটু বিস্মিত হইয়াই ফিরিয়া চাহিল, প্রশ্ন করিল—"কি ?"

"সোজা আমার নামেই চেকটা লিখে দিতে বলবে ?—তুমি নিজে গিয়ে বললে বোধ হয় শুনতে পারেন।"

"না ডোরাদি, এ-চ্যারিটিতে অত টাকা ডিরেক্ট নিজের নামে দিতে চাইবে না ; জেনে-শুনে বিপদে ফেলা হবে নাকি ?"

ডোরার হাত, মুখের ভাব শিথিল সহজ হইয়া গেল, বলিল—"তাহলে তোমার নামেই দিন লিখে—আমায় এনর্ডোস্ করে দিও।…একটা হাঙ্গামা কমাবার জন্যে বলছিলাম।

তাহার পর বিস্ময়ের পুলকে হঠাৎ জাহ্নবীর ডান হাতটা চাপিয়া বলিল—"সত্যি জাহ্নবী, এত টাকা কল্পনাতেও আসে নি, আমাদের কাজটা যে কত এগিয়ে দেবে এতে !…তোমার এত বলা সত্ত্বেও লোকটার প্রতি শ্রদ্ধা আমার বেড়ে যাচ্ছে—তোমার কাছে আরও শুনে বোধ হয় যাবে কমে সে-শ্রদ্ধা কিছু কিছু—তবু এও তো ওঁর মনের একটা দিকই ?"

এই সময় ব্রজলালের বাবুর্চি একটা ট্রেতে সৌখিন চায়ের সরঞ্জাম লইয়া নিচে সিঁড়ির পথে প্রবেশ করিল, পিছনে অন্য একটা ট্রেতে খাবারের প্লেট সাজাইয়া উদ্ধব। ওদিকে অফিস-ঘর থেকে মজুমদার মশাই চশমার ওপর দিয়া ভ্রূ বিস্তারিত করিয়া দেখিয়া সহকারীদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য একটু

কাশিল, তাহার পর বোধ হয় মিথ্যা করিয়াই খাতায় একটা ঠিক দিবার অভিনয় করিয়াই বলিল—"এগারর এক নামে, হাতে এল এক···হাতে এল এক।···ইনি আবার খদ্দর। কতই যে দেখতে হবে!···"

সাতচল্লিশ

কোথা হইতে ব্রজলালের জীবনে যেন হঠাৎ এক ঝলক আলো আসিয়া পড়িল।

আর যাহার পক্ষে যাহাই হোক এই চেকটা, ওর তো পূজার অর্ঘ্যই। দশ হাজার নয়, পনেরও নয়, একেবারে পঁচিশ। একদিন নিষ্ঠুরভাবেই ভক্তের পূজা প্রত্যাখ্যান করিয়া দেবী যেন আবার স্বপ্নাদেশে নিজে হইতেই স্বর্ণ-কমল মাগিয়া লইলেন।

ডোরা আসিতে লাগিল। বড় ভালো লাগে মেয়েটিকে, তবে প্রথম দিন যেমন ভালো লাগিয়াছিল—সুন্দরী যুবতী হিসাবে—আজ ঠিক সে-ধরণের ভালো লাগা নয়। একদিনেই কোথা দিয়া কি হইয়া গেছে, ব্রজলালের দৃষ্টিতে আর সেই ক্ষুধিত মোহ নাই; এখন ভালো লাগে ডোরা জাহ্নবীকে ফিরাইয়া আনিয়াছে বলিয়া। ডোরাই কি ফিরাইয়া আনিয়াছে? আর সত্যই কি জাহ্নবী ফিরিল? কিন্তু এসব প্রশ্নই ওঠে না ব্রজলালের মনে। ও জানে জাহ্নবী ফিরিয়াছে—যখন চেকটা দেয়, মুখে ছিল না কি একটা ক্ষমার প্রসন্নতা? অন্তরের কৃতজ্ঞতায় এর সমস্ত যশটুকু ও ডোরাকেই দিল।

বিপুল উৎসাহে আর্তত্রাণের কাজে লাগিয়া গেল। অবশ্য শরীরে খাটিয়া নয়, ডোরার সঙ্গে আলোচনা করিয়া, প্ল্যান করিয়া; জাহ্নবীকেও ডাকিয়া লয়। কেহ দেখা করিবার জন্য ফোন্ করিলে বারণ করিয়া দেয়। চকিতে কখনও দেখিয়া লয় ওদের আসিতে বারণ করায় জাহ্নবীর মুখে যেন একটি মাধুর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। কখন কখন একটা রুক্ষ মন্তব্যও করিয়া দেয় টেলিফোনের অন্য প্রান্ত লক্ষ্য করিয়া।

কখনও একলা শুধু ডোরার সঙ্গেই আলোচনা চলিতে থাকে। এটা

জাহ্নবী না মনে করুক, ডোরার আগমনের ছুতা করিয়া ব্রজলাল জাহ্নবীর সঙ্গ-সাধনা করিতেছে। একটা জীবনের চান্স্—ব্রজলাল খুবই সন্তর্পণে, পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইতেছে। ও-বাড়িতেও যাওয়া পূর্বের মতোই বন্ধ রাখিল—জাহ্নবীর কাছে ওর চেকের মর্যাদা না নষ্ট হয়—সে না ভাবে এটা সন্ধির উপঢৌকন।

ডোরার সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া আলাপ করে—দুর্ভিক্ষের কথা থেকে পলিটিক্স, পলিটিক্স থেকে সমাজনীতি, তাহার মধ্যে এক একদিন স্ত্রী-পুরুষের সমাজগত সম্বন্ধ লইয়াই হয়তো খানিকটা সময় গেল কাটিয়া—ব্রজলাল লয় নারীর পক্ষ, ডোরা পুরুষের। বড় ভালো লাগে মেয়েটিকে—অনেক অভিজ্ঞতা, জীবনে অনেক দেখিয়াছে, এক সময় মতটা নাকি ভিন্নই ছিল—নিজেই বলে—আজ কিন্তু ব্রজলাল দেখে, বড় উন্নত, উদার।

কারবারের কথাও আসিয়া পড়ে। নিতান্ত সহজ কৌতূহলে ডোরা এক একটা প্রশ্ন করে, কখন কখন সঙ্কুচিত হইয়াই; ব্রজলাল প্রশ্নের অতিরিক্ত উত্তরও দিয়া দেয়। ডোরা একদিন একটু অনুযোগের কণ্ঠেই সাবধান করিল—"সিক্রেট সম্বন্ধে সাবধানই থাকবেন ব্রজবাবু, সময়টা বড় খারাপ, যেমন শুনি স্পাইয়ে স্পাইয়ে ছেয়ে গেছে সারা দেশটা।"

কণ্ঠে বেশ একটু দরদ আছে, দুদিনের মাত্র পরিচয়, কিন্তু উৎকণ্ঠার মধ্যে খুবই আন্তরিকতা।

ব্রজলাল উত্তর করিল—"আপনি যেমন!—আপনি বাংলার মেয়ে, আমি বাঙ্গালী ছেলে—ও-বেটাদের কাছে সমান নিগ্রহ ভোগ করছি—কি গলদ ওদের ভেতর—নিজের কারবারের অভিজ্ঞতায় যেটুকু বুঝেছি ব'লব না?...না, সাবধান আছে বৈকি। তবে না হয় আরও থাকব।"

ব্রজলাল মাটি থেকে যেন কত উঁচুতে গেছে উঠিয়া, আনন্দে ইচ্ছা করিতেছে নিত্য-নিয়তই নিজেকে ধরি মেলিয়া। জাহ্নবী ওর পঁচিশ হাজারের চেক—ওর অর্ঘ—নিজে চরণ পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছে যে!

জাহ্নবীও লক্ষ্য ক'রে একটা পরিবর্তন—মস্ত বড় পরিবর্তন,—রাত্রির সুরা-উৎসব, যেটা একরকম নিত্যকার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—বন্ধ হইয়া

গেছে ; আগে দু'রাত বাদ দিয়া একটা রাত্রে হইয়াছিল, তাহার পর এক রাত বাদ দিয়া আর এক রাত, তাহার পর পাঁচ রাত আর একেবারে সাড়াশব্দ নাই —দশটা রাতের এই হিসাব—নির্ভুলভাবে কষা আছে জাহ্নবীর।

তাহার নিজের মনটাও যেন মাঝে মাঝে টাল খাইয়া যায় ; যেভাবে চলিতে যায়, যেভাবে চলা অভ্যাস করিয়া আসিয়াছে, তাহার যেন ব্যতিক্রম হইয়া পড়ে এক একবার। জাহ্নবী অন্যমনস্ক হইয়া যায় থাকিয়া থাকিয়া, আগেও হইয়াছে এক-আধ বার কিন্তু এখন থেকে তফাৎ এই যে, আজকাল যেন চেষ্টা করিয়া মনটা ঘুরাইয়া লইতে হয়। হয়তো ডোরার এই পরিবর্তনও একটা কারণ,—সবাই তো নবরূপে নবভাবে জাগিয়া উঠিতেছে। অণিমা বলে তাহার সাধনায় কি নূতন আলো দেখিতে পাইয়াছে—কী আলো সে-ই জানে। ডোরার পরিবর্তন তো অচিন্তনীয়ই একেবারে—তবে কি এরমধ্যে ও জগৎ-সত্যের কোন গোপন ইঙ্গিত আছে ? এমনও কি হওয়া সম্ভব যে, শুধু জাহ্নবীই সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া একটা একটানা ভুল করিয়া যাইবে ?···হয়তো একই ধরণের চিন্তায় মনটা ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছে, এর বেশি কিছু নয় ; কিন্তু ভাবে জাহ্নবী, এক একদিন অকারণেই মনটা হু হু করিয়া ওঠে। একদিন বসিয়া বসিয়া শুধু শুধুই চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসিল।—জীবনটা যেন গোলমেলে পথ ধরিয়া কোন্ অনিশ্চয়তার পানে চলিয়াছে, নিজেকেই যেন চেনা যায় না।

এর যেন প্রতিক্রিয়া হিসাবেই,—মনকে যেন চোখ রাঙাইবার জন্যই ডোরা আসিলে জাহ্নবী ব্রজলালের কুৎসায় পঞ্চমুখ হইয়া ওঠে, বিনাইয়া বিনাইয়া তাহার কথাবার্তা থেকে নূতন অর্থ বাহির করিতে থাকে। খুঁজিয়া খুঁজিয়া ওর ব্যবসায়ের গুপ্ত রহস্য ধরে মেলিয়া। ডোরা চলিয়া গেলে ওর মনে কি ওটা অনুতাপের অবসাদ ?—ঠিক বুঝিতে পারে না জাহ্নবী, শুধু এইটুকু স্পষ্ট ওর কাছে—এ রকম অন্তর্দ্বন্দ্বে এত ক্ষত বিক্ষত হয় নাই জীবনে আর কখনও ; আর যেন পারে না।

ডোরা দিন পাঁচেক একরকম উপর্যুপরিই আসিল, মাত্র দু'একদিন বাদ দিয়া। তাহার পর একেবারে সপ্তাহখানেক দেখা নাই। এমন কিছু ব্যাপার নয়, ঘুরিয়া বেড়ানই তো কাজ তাহার, কিন্তু যেহেতু আসিবে না বলিয়া যায়

নাই, জাহ্নবী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে মনটা তিক্তও হইয়া উঠিতে লাগিল ডোরার ওপর এবং একদিন ব্রজলালের কাছে নিজে হইতেই ওর প্রসঙ্গটা তুলিয়া অযথাই একটু কটু মন্তব্য করিয়া দিল।

কাজের মধ্যেই একবার মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল—"সেই মহিলাটি আর এলেন না, না?"

ব্রজলাল উত্তর করিল—"কৈ আর এলেন? কাজও তো তাঁর নানা জায়গায়।"

জাহ্নবী একটু থামিয়া বলিল—"সত্যি হয় তবেই ভালো···একেবারে পঁচিশ হাজারের চেক!"

"আপনার সন্দেহ হয়?"

"খদ্দরকে সন্দেহ হয় তো?···তাই থেকেই···মানে গাউন ছেড়েও অনেকে খদ্দর ধ'রছে, শাড়ির কথা বাদই দিই।"

এর পর ডোরার পূর্ব ইতিহাস বলা, যেটা বারণ ছিল ডোরার; তাহার জন্যেই বোধহয় অবচেতন মনের এই গৌরচন্দ্রিকা; তাহার আগেই কিন্তু একদিন ডোরা আবার আসিয়া পড়িল।

ডোরা আসিল বিকেলে, অফিস বন্ধ হওয়ার প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে।

জাহ্নবীর অল্পস্বল্প যা কাজ, অনেকক্ষণ শেষ হইয়া গেছে, কাজ না থাকিলে আজকাল যা কাজ—সোফায় হেলান দিয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতেছিল, ডোরাকে দেখিয়া খানিকটা অভিমান ভরেই বলিয়া উঠিল—"এই যে, মনে প'ড়েছে ডোরাদি?"

ডোরা জাহ্নবীর অফিস-চেয়ারটায় বসিতে বসিতে বলিল—"মনে অষ্টপ্রহরই রয়েছ, তাই আসাটাকেই বড় বলে ভাবিনি।"

এই দরদের কথাটাতে অভিমানটুকু বাড়িয়া গেল আরও, জাহ্নবী মুখটা ভার করিয়া বলিল—"সে বলতে পারতেন বোর্ডিঙের ডোরাদি—জাহ্নবী মোলো কি বেঁচে আছে, অষ্টপ্রহর ভাবতেন···এ তুমি যেন সত্যিই বড় বদলে গেছ ডোরাদি—পোশাকে, কাজে, মতামতে, সঙ্গী বাছায়; আজকাল···"

"কাজ তোমার শেষ হয়েছে ? উঠতে পারবে একবার ?…মনিবের হুকুম নিতে হবে নাকি ?"

কথায় বাধা দিয়া এমনভাবে প্রশ্নগুলা করিয়া উঠিল, জাহ্নবী বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল—"কেন ?"

"আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে। চলো, ওঠ, পরে জিগ্যেস কোরো'খন।"

"কোন বিপদ-টিপদ… ?"

"বিপদেরই ব্যবস্থা হয়ে রয়েছে চারিদিকে, সম্পদ আসবে কোথা থেকে ?… নাও, ওঠ।"

ডোরা আর অফিসে প্রবেশ করিল না, জাহ্নবী অনুমতিটা লইয়া আসিলে দুজনে আফিসের চৌহদ্দি পার হইয়া সদর রাস্তায় উঠিল, তাহার পর ডানদিকের রাস্তাটা ধরিল, অর্থাৎ সহরের উল্টাদিকের।…জাহ্নবী হঠাৎ যেন সম্মোহিত হইয়া গেছে, একবার শুধু প্রশ্ন করিল—"কোথায় নিয়ে চ'লেছ ডোরাদি ?"

ডোরা সংক্ষিপ্ত উত্তর করিল—"দেখবে এখুনি, চলে এসো না।"

এই রাস্তায়ই আসিয়া জাহ্নবী একদিন "ভিকট্রি লজ" খুঁজিয়া বাহির করে। খানিকটা গিয়া ডানদিকে পুরানো জঙ্গলের একটা ফালি, তাহার পরই চষা মাঠ। কলোনিটা হইয়া অবধি মাঠের ওদিকের গ্রাম থেকে কিছু কিছু লোক যাতায়াত করে। একটা পায়ে-হাঁটা সরু পথ গড়িয়া উঠিয়াছে। সেই পথ ধরিয়া বনটুকু অতিক্রম করিয়া উহারা মাঠে আসিয়া পড়িল। ডোরা একবার দাঁড়াইয়া পড়িয়া চারিদিকটা দেখিয়া লইল, তাহার পর বলিল—"ঐখানটায় চলো।"

রাস্তা থেকে প্রায় দু'শ গজ দূরে, ডানদিকে একটা ডোবার ধারে গিয়া বসিল উহারা ; সামনে খোলা মাঠ, পেছনে জল, তৃতীয় মানুষের সাড়াশব্দ নাই। সব মিলাইয়া প্রায় মাইলখানেক আসিয়াছে, শরতের অপরাহ্ণ একটু মলিন হইয়া পড়িয়াছে।

জাহ্নবী বেশ খানিকটা বিমূঢ় হইয়া গেছে, শুষ্ক কণ্ঠে একটা ঢোক গিলিয়া বলিল—"তারপর ?"

ডোরা উত্তর করিল—"তোমার আফিসের শেষ কথাগুলোর জবাব আমি

মুখে করে এনেছি জাহ্নবী, আমি মোটেই বদলাইনি—না পোশাকে, না মতামতে, না কাজে, না সঙ্গী বাছায়।"

জাহ্নবী দেখিল চেহারাতেও নয়—সেই বোর্ডিঙের ডোরা—পরুষ, কঠোর চোখে সেই জ্বালা। নির্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল, কোন প্রশ্ন করিতেই মুখে রা সরিল না। ডোরা বলিয়া চলিল—"বুঝবে না তুমি, আমিই টীকা করে দিচ্ছি—ছদ্মবেশই আমার চিরকাল আসল পোশাক, তাই এই খদ্দর; সেবাই আমার কাজ, কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ, সেটা আমার নিজের জাতের অর্থাৎ স্ত্রী জাতির সেবা, তা আজও করছি, কাজেই মতামতও বদলায়নি মোটেই; বাকি থাকে সঙ্গী বাছার কথা জাহ্নবী,—যে বিদ্রূপটা তুমি আমায় ব্রজবাবুর সঙ্গে হৃদ্যতা করতে দেখে করেছ; কিন্তু ভুলছ কেন, আমি পুরুষকে আস্কারা দিই, তাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবার জন্যে? কিরণময়ের কথা ভুলেছ?"

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি আরও প্রখর হইয়া উঠিতেছে ডোরার।

জাহ্নবী তীব্র আতঙ্কে চাহিয়া রহিল, মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—"ডোরাদি!"

ডোরা বলিয়া চলিল—"যা ভয় করেছ, তা-ই জাহ্নবী, আমি ধ্বংস করতেই এসেছি তোমার ব্রজলালকে।···খদ্দর আমার ছদ্মবেশ—বেটাছেলে যেটাকে পবিত্র বলে মাথায় তুলে নিয়েছে, আমি যেটাকে ঘৃণা করি, কিন্তু কাজে লাগাচ্ছি—ছদ্মবেশই আমার আসল বেশ এখন জাহ্নবী, আমি এখন একজন গোয়েন্দা।"

জাহ্নবী বিকৃত স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—"সে কি!"

ডোরা একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর নিশ্চিত হইয়াই বলিল—"চীৎকার তোমায় করতেই হবে, তাই এখানে নিয়ে আসা। তবুও চুপ করেই শোনবার চেষ্টা করো। আমি এখন গোয়েন্দা বিভাগেই রয়েছি, আপাতত মিলিটারি সাইডে। তুমি বোর্ডিং থেকে চলে আসবার পর অণিমাদি চলে এলেন; কিরণময়ের হাত ধরে। সবচেয়ে বড় আঘাত ছিল সেটা আমার জীবনে, ঠিক করলাম, মেয়েদের কথা আর ভাবব না। এমন একটা বিতৃষ্ণা হোল সেই থেকে যে, কিরণময়কে জড়াবার যে অমোঘ অস্ত্র আমার হাতে ছিল—সেই নতুন রুলিজোড়া—সে অস্ত্রও হাতছাড়া করে দিলাম একেবারেই।

শেষকালে দেখলাম—অসম্ভব, মেয়েদের কথা না ভাববার মানে যে পুরুষের কথাও না ভাবা, তা কি করে সম্ভব। বোর্ডিং ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। লড়াইয়ের ব্যাপারেই পুরুষ আজকাল বেশি মত্ত, ঐদিকেই জুটিয়ে নিলাম কাজ—সুন্দরীকে ওরা কাজ দিতে কার্পণ্য করে না—তার জন্যে আমার এই খদ্দরের মতোন ওরাও একটা ছদ্মবেশ ধারণ করে—কথার ছদ্মবেশ—শিভ্যালরি।··· কেরানি, কেরানি থেকে ঢুকলাম 'ওয়াকাই' (W. A. C. I.) বিভাগে। ওরা মানুষ মারবে, দেশ ধ্বংস করবে, ওদের পাশে বশে বসে ওদের মনোরঞ্জন করতে হবে—চিরকালই করতে হয়েছে মেয়েছেলেকে—যুদ্ধক্ষেত্রেও শুনেছি মোগলের সঙ্গে হারেম থাকত, বাঈজী থাকত।···কিছু সর্বনাশ ক'রে চললাম, কিন্তু আশা মেটে না জাহ্নবী—এত অন্যায়, এত ব্যাভিচার, তার তুলনায় কিছুই করা হয় না; শেষে একদিন হঠাৎ এই গোয়েন্দা বিভাগের দিকে নজর পড়ল—একটা সিনেমার ছবি দেখে; মাতাহারির কথা জানো, জার্মান স্পাই?···দেখলাম, এই আমার ঠিক উপযুক্ত ক্ষেত্র। রূপ—যেটাকে ওরা অমৃত বলে পান করবে, সেটাকে ওদের কণ্ঠে বিষ করে তোলবার এমন সুবিধে আর কোথাও নেই। আমি মেয়েছেলে, আমার স্বভাবই সব জিনিস সরস করে তোলা, সুমিষ্ট করে পরিবেশন করা—ধ্বংসের বিষকে মধুর প্রলেপ দিয়ে পুরুষের হাতে তুলে দেওয়ার প্রলোভনটা ছাড়তে পারলাম না। আজ আট মাস এসেছি, ভালো ফসল তুলেছি জাহ্নবী আপাতত···"

জাহ্নবী কী শুনিতেছে, কী শুনিতেছে না, যেন বোধ হয় নাই; দৃষ্টিতে শূন্যতা, শেষের ক'টা কথায় যেন চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, ডোরার ডান হাতটা বুকে টানিয়া লইয়া ব্যাকুল বেদনায় বলিয়া উঠিল—"ও ডোরাদি! আমি যে তোমায় বিশ্বাস করে ওর সব কথা বলেছি! ওর সব সিক্রেট বের করে দিয়েছি—চিঠি খুলেও—এ কি সর্বনাশ হোল?···তুমি আমার কথাগুলোও কাজে লাগালে নাকি? কিন্তু সে জন্য তো বলা নয়···"

"কি জন্য তবে জাহ্নবী? তুমি নিজের মনটাকে আগে গুছিয়ে নাও, তারপর উত্তর দাও আমার কথার; আমার মত বদলেছে বলে ঠাট্টা করলে, কিন্তু তোমার মতও কি আর সেই আছে,—বোর্ডিঙে যা ছিল?···"

জাহ্নবী ব্যাকুলভাবে একটা যেন উত্তর হাতড়াইতে লাগিল, তাহার পর নিরুপায় দৃষ্টি ডোরার মুখের দিকে তুলিয়া বলিল—"আছে—কিন্তু…কিন্তু আমিই-বা কি প্রতিদান দিলাম ডোরাদি, মেয়ে হয়ে?…না ডোরাদি, ওসব যাও ভুলে—তুমি এসেছিলে, দুঃখের কথা জমা হয়েছিল অনেক দিন থেকে, নিতান্ত আপন জেনে বললাম—তা বলে গোয়েন্দাকে বলব কেন?…ভুলে যাও বলছি। দোহাই—মেয়ে হয়ে মেয়ের কপালে এ-কলঙ্কটা দিও না…আমি ওর খাই, ওর বাড়িতে থাকি…শুধু আমি একলা নই—আমার বলতে পৃথিবীতে যে কেউ আছে…"

"শোন জাহ্নবী, বড় চঞ্চল হয়ে পড়েছ; তুমিই তো বলেছ, ও তোমাদের বাড়ি গাজুরি দখল করে ইমারৎ তুলেছে, তোমার দিদিমা সেই শোকে গেল মারা! তারপর খাওয়া—সে তো শরীরে খেটে খাচ্ছ—এসব তো তোমার মুখে শোনা যুক্তি—আমিই যখন তর্ক করেছি তোমার সঙ্গে।"

জাহ্নবী মুখের পানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল; এবার তাহার দৃষ্টি স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে, অনেক বিপদের মুখে যে-জাহ্নবী নিজের মনকে সংযত করিয়া লইয়া বিপদকে কাটাইয়া উঠিয়াছে, সেই জাহ্নবীই ধীরে ধীরে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতেছে যেন। ধীরে ধীরে আরম্ভ করিল—"ডোরাদি, শোন, তুমিও বড় চঞ্চল হয়ে রয়েছ, একটু শান্ত হয়ে শোন, লক্ষ্মীটি। আমার জীবনটা দেখো ডোরাদি। ছেলেবেলায় যবে থেকে বুঝতে শিখেছি, জীবনের একটা দিকই দেখে যাবার দুর্ভাগ্য আমার—সমাজকে দেখলাম তার বিকৃত রূপে, তারপর কাটল জঙ্গলে, তারও ফাঁক দিয়ে সমাজের যেটুকু চোখে পড়ল, তাও বিকৃতিই, বোর্ডিঙের ইতিহাস তুমি জানই, তারপর এই জীবন। এটা এসেছে অদ্ভুতরূপে, কিন্তু এটা কি সম্ভব নয় যে, আমার আগেকার জীবনের অভিজ্ঞতার জন্যেই আমি এটাকেও বিকৃত করে দেখছি? এটা কি সম্ভব নয়—ডোরাদি যে, জীবনকে সত্যরূপে দেখবার ক্ষমতাটাই আমি চিরকালের জন্যে হারিয়ে বসেছি?"

ডোরা ঠোঁটের একটা কোণ চাপিয়া শুনিতেছিল; বড়রা অপরিণত বয়সের কথা যে রকম অবজ্ঞামিশ্রিত প্রশ্রয়ের সঙ্গে শোনে, তাহার পর বলিল—

"সেটা যে অসম্ভব, তা বলি না জাহ্নবী, তবে এক্ষেত্রে শুধু এইটুকুই বলতে পারি, তুমি যেভাবে দেখেছ, সেইটেই সত্য রূপ—তোমার রিপোর্টের সূত্র ধরে আমি প্রমাণ সংগ্রহ করেছি, ব্রজবাবুও নিজের সন্ধান নিজে কিছু কিছু দিয়েছেন—বের করে নিয়েছি তাঁর কাছ থেকে—"

"ডোরাদি!"

"তারপর সেসব প্রমাণ এখন পুলিশের হাতে···"

"ডোরাদি, বাঁচাও, সর্বনাশ হয়ে যাবে!···দয়া করো—মনে করো—আমাকেই দয়া করছ।···"

ডোরা যেন নূতনভাবে সচকিত হইয়া উঠিল; শান্ত, বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"তোমাকে দয়া! কেন জাহ্নবী; এত দূর নাকি?···" তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইল, অন্তরের সমস্ত ঘৃণা আক্রোশ চলিয়া প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট করিয়া বলিল—"তবে শোন জাহ্নবী" আমরা এদিকে এসেছি, ওদিকে পুলিশ বাড়ি ঘেরাও করে নিয়েছে। পরিণাম কি হবে জানই। —তবুও দয়া করেছি আমি,—অনেক কথা লুকিয়েছি, অনেক প্রমাণ নষ্ট করে দিয়েছি, নিজের হাতে।···কেন এমন দুর্বল হলাম নিজেই বুঝতে পারছি না। সবচেয়ে আশ্চর্য, তোমায় আমি ক্ষমা করতে পারলাম কি করে! সবচেয়ে বেশি করে তোমায় শিখিয়েছিলাম, সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস তোমার ওপর, সব চেয়ে নিরাশ করেছ তুমি। অথচ তোমায় ক্ষমা করলাম!—নিশ্চয় তোমার মুখ চেয়েই ব্রজলালকেও খানিকটা।—আমি কিন্তু নিজেকে কি করে ক্ষমা করি?"

"ডোরাদি—ছোট বোন আমি...বোর্ডিঙে যাকে অত করে ভালোবাসতে···"

ডোরা নিজের ঠোঁটের খানিকটা কামড়াইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর নিজের ব্লাউজের ভিতর হইতে ব্রজলালের দেওয়া সেই চেকটা বাহির করিয়া বলিল—"এই দেখো করেছি ক্ষমা তোমায়, দিইনি এটা পুলিশের হাতে।···এখনও মনে হচ্ছে দিয়ে আসি—তোমার নামে দেওয়া চেক পঁচিশ হাজারের, তোমার ব্রজলাল আর তুমি তাহলে একসঙ্গে বেরোও বাড়ি থেকে—পুলিশের শোভাযাত্রায় পাশাপাশি হয়ে···"

আর একটু সম্মোহিতের মতো দাঁড়াইয়া চেকটা কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া পাশের ডোবাটায় নিক্ষেপ করিল, তাহার পর জাহ্নবীকে বলিল—"চলো, তোমার ব্রজলালকে নতুন রূপে দেখবে চলো।"

যখন ফিরিল বিলম্ব হইয়া গেছে, পুলিশ নিজের কার্য্য সমাধা করিয়া চলিয়া গেছে। ডোরা গেটের কাছ থেকেই সংক্ষিপ্ত বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

সমস্ত কারখানাটা নিস্তব্ধ, লোক যাহারা আছে বারান্দায়, এক জায়গায় জড়ো হইয়া মৌনভাবে দাঁড়াইয়া আছে—ঠাকুর, বাবুর্চি, মালী, উদ্ধব আর নেপালী দারোয়ানটা; কেরানিদের মধ্যে কেহই নাই। জাহ্নবী কিছু না বলিয়া ওপরে নিজের অফিসে চলিয়া গেল।

টেবিলের ওপর একখানা পোস্ট আফিসের রেজেস্ট্রি খাম। অন্যমনস্কভাবে হাতে তুলিয়া লইয়া সোফায় এলাইয়া পড়িল। কিছু করিতে ইচ্ছা হইতেছে না, একটা অদ্ভুত শূন্যতা আর অবসাদের মধ্যে নিজের অস্তিত্বই যেন অনুভব করিতে পারিতেছে না।...নিশ্চয় দরকারী চিঠি—রেজিস্ট্রি যখন, হয়তো দাদুর মেয়ের সম্বন্ধে কোন নতুন খবর, কিন্তু ক্লান্তভাবে পাশে ফেলিয়া রাখিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল জাহ্নবী।...আবার কখন যে তুলিয়া লইয়াছে, কখন যে খুলিয়াছে খামটা হুঁস নাই।...অণিমার চিঠি, সঙ্গে একটা ফটো; অণিমা একটা চেয়ারে বসিয়া আছে, কোলে একটি হৃষ্টপুষ্ট শিশু, চেয়ারের ডানদিকে দাঁড়াইয়া কিরণময়। দুইজনেরই পরিধানে খদ্দরের শাড়ি আর ধুতি, শিশুটির ফ্রকও যেন খদ্দরেরই বলিয়া মনে হইল। তিনজনের মুখেই হাসি—শিশুটিকেও কি করিয়া ঠিক মুহূর্ত্তটিতে হাসাইয়া দিয়াছে। ফটোর নিচে লেখা 'স্নেহের জাহ্নবীকে,' তাহার তলায় যুগ্ম দস্তখৎ। কিরণময় নিজের নামের একটা অক্ষর বোধ হয় দুষ্টামি করিয়াই অনিমার নামের সঙ্গে একটু জড়াইয়া দিয়াছে।

জাহ্নবী অনাসক্তভাবে চাহিয়া থাকিয়া চিঠিটা তুলিয়া লইল। বেশ বড় চিঠিই, কিন্তু লাইনের ওপর দিয়া শুধু চোখ দুইটাই গড়াইয়া চলিয়াছে, মাথায় কিছু ঢুকিতেছে না জাহ্নবীর। গড়াইয়াই চলিল দৃষ্টি, তাহার পর

প্রায় শেষের দিকে আসিয়া গোটা কয়েক লাইনে অবরুদ্ধ হইয়া গেল—"মেয়েদের ভালবাসা যে সর্বজয়ী জাহ্নবী—আমরা বিরাগী শঙ্করকেও তাঁর শুষ্ক তপস্যা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সংসারী করে ছেড়েছি, উচ্ছৃঙ্খলকে শৃঙ্খলিত করা, এ আর বেশি কথা কি? তেমনি আবার, এই জন্যেই আমাদের যারা চায়—অবশ্য চাইবার মতন করে, পূর্ণ কল্যাণে—তাদের বঞ্চিত করার মতন নিষ্ঠুর বঞ্চনাও নেই জগতে..."

পরিশিষ্ট

মাসখানেক পরের কথা।

রায় শোনান হবার পর মজুমদার মশাই অশ্রুসিক্ত নয়নে আগাইয়া গেল, বলিল—"আপনি ভয় পাবেন না স্যার—আপীলে এ-কেস টেঁকবে না —জজের ওখানে, নয়তো হাইকোর্টে তো নিশ্চয়। আমি সব ব্যবস্থা করেছি।"

ব্রজলাল স্থিরভাবে শুনিতেছিল, একটু হাসিয়া বলিল—"আপীল করব নাতো মজুমদার মশাই।"

"সেকি! আমি পরামর্শ নিয়েছি, পনের আনা চান্স্...ফাইনাল আপীল পর্যন্ত তো নিশ্চয়ই..."

"বাকি এক আনাটাকেও বাদ দেওয়া যায় না তো..."

"তবু চেষ্টা করতে হবে সুনাম বজায় রাখবার জন্যে।"

ব্রজলাল একটু ম্লান হাসিয়া বলিল..."যেটা অর্জন করাই হয়নি, সেটা বজায় রাখবার কথা তো ওঠে না মজুমদার মশাই।...অন্তত আপনার তো জানবার কথা।"

তাহার পর আগাইয়া গিয়া কাঁধে হাত দিয়া বলিল—"তা নয়, আমার সময় নেই মজুমদার মশাই। মাঝখান থেকে, আপীল করা—সে হয়তো বাঁচার আশায় মরার যন্ত্রণাটা টেনে বাড়ানোই সার হবে।...থাক্ সে কথা, আপনি জাহ্নবী দেবীর সঙ্গে একটু দেখা করবার বন্দোবস্ত করুন আমার—

কাল পরশু যত শীগগির হয়। আর আমার সেফের মধ্যে একটা রেজেস্টারি করা দলিল আছে, অন্য একটা দলিলের কপির সঙ্গে পিন-করা, খানাতল্লাসের সময় নেপালীর হাতে সরিয়ে দিয়েছিলাম—সেটা আমার চাই।"

দেখা করার ব্যবস্থা হইল দিন দুই পরেই। টাকার জোরে একটু ভদ্র পরিবেশের মধ্যে মজুমদার মশাই ব্যবস্থাটা করাইল।

জাহ্নবী কোনরকমে সামলাইয়া রাখিয়াছিল নিজেকে, সামনে আসিতেই একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। হাতের আঁজলায় মুখ ঢাকিয়া অনেক্ষণই অশ্রু বিসর্জন করিল, তাহার পর কোন রকমে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল "আমায় ক্ষমা—ক্ষমা পাবার কী উপায় আছে আমার?"

ব্রজলাল দুই-পা আগাইয়া গেল ডান হাতটাও ধীরে ধীরে একটু তুলিল, কিন্তু তখনই নামাইয়া লইল, স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল—"ক্ষমার কোন কথাই উঠে না তো জাহ্নবী দেবী—"

"আপনি জানেন না কি আমার ভুল, কত অপরাধ আমার, তাই বলছেন ও-কথা।—কিন্তু আমার জীবনটা দেখুন—ছেলেবেলা থেকেই যে একটা দিকই আমার চোখে পড়ল—বিষের চোখ দিয়ে আমি অমৃত চিনি কি করে?—যবে জ্ঞান হয়েছে, দেখে আসছি মায়ের অপমান—এমন একজনও কেউ এসে দাঁড়াল না এত বড় সংসারে যে—উঃ!—তারপর মানুষের ভয়ে জঙ্গলে—পশুর মতন—উঃ!"

ডোরাকে যাহা বলিল সেদিন, সেই কথাগুলো বলিতে চায়, আরও সবিস্তারে; ক্ষমার যে ওর দরকার। কিন্তু আর অগ্রসর হইতে পারিল না। হাতে আঁচল গুটাইয়া গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল!

ব্রজলাল আগাইয়া গিয়া এবার স্নেহভরে ডান হাতটা কাঁধের ওপর রাখিল, বলিল—"আমি নিজের অপরাধের সাজাই বইছি জাহ্নবী দেবী। এতে আমার একটুও সন্দেহ নেই। যা নিয়ে মেতে ছিলাম, সেটা থেকে ভগবানের বিধানেই আলাদা হয়ে আজ আমি সেটার আসল রূপ দেখতে পাচ্ছি, তার পাশে নিজেরও আসল রূপ। লোভ আমাদের উচ্ছৃঙ্খল করে দেয়। শক্তি আমাদের

অন্ধ করে তোলে। ভোগের আমরা মর্যাদা রক্ষা করতে পারি না।···কত বলব ?—আমার এ-দিককার জীবনটার তো সবই দেখছেন আপনি, এই খানেই কি নিয়ে আসবার ধারা নয় ?···আমার শোক নেই এর জন্ত, এটার দরকার ছিল আমার জীবনে। শুধু একটা সন্দেহ নিয়ে যাচ্ছি আমি—সবচেয়ে লুব্ধ হয়ে যা চেয়ে ছিলাম, মনে-প্রাণে—সেটা পেলে আর সব লালসাই কি ফিকে হয়ে যেতনা আমার কাছে ? আমি কি বেঁচে যেতাম না ?"

জাহ্নবী একবার দৃষ্টি তুলিয়া চাহিল, আবার তখনই জলভারেই সেটা যেন নত হইয়া পড়িল।

যে-দিকটার বেদনা এত নিবিড়, সে দিকটা—যেন অগ্রসর হইতে না পারিয়াই ছাড়িয়া দিল ব্রজলাল। দুইটা পিন-করা কাগজ বাহির করিয়া বলিল—"একটা কথা আপনার মন থেকে সরে যাওয়া দরকার ;—বাড়িটা আমি গাজুরি দখল করে ছিলাম না। হয়তো সত্যিই আপনি অতটা অবিশ্বাস করেন না, তবু যদি একটু সন্দেহ লেগে থাকে, তো কাছারি থেকে আমার স্বত্বের এই যে নকলটা নিয়েছিলাম, সেটা দেখলেই কেটে যাবে।···আগে বলিনি, তার কারণ, পাকা রকম জানলে আপনারা হয়তো চলে যেতেন বাড়ি ছেড়ে। আর একটা যা কাগজ সেটা আপনার নামে বাড়ি-বাগান সব লেখা আছে ; নকলটা নেবার মাসখানেক পরেই রেজেস্ট্রারি করি, প্রায় বছরখানেক হোল, তারপর আর বদলাই নি।···না, রাখুন আপনি জাহ্নবী দেবী, আমার অনুরোধ, আমার বোঝা হিসেবেও তো বইতে হবে।

আর একটা কথা, সেই সঙ্গে একটা শেষ অনুরোধ। আমি আপনাকে বুঝেছি, তার মানে আপনার ঘেন্নাকে আমি চিনেছি ; হয়তো মাঝে একটু সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু এখন ভালোভাবেই চিনেছি তার স্বরূপ। ঘেন্না জিনিসটা হচ্ছে আদর্শের উল্টোদিক—পুরুষ সম্বন্ধে মেয়েদের একটা উঁচু আদর্শ গড়া আছে বলেই যেখানে অভাব দেখে, সেখানে অবজ্ঞা এসে দাঁড়ায় তার মনে। মেয়েদের প্রশংসার মতন এও তো পুরুষের জীবনের আলোই, এই আলোর পথ ধরেই মেয়েদের আদর্শে পৌঁছুতে হবে বলেই তো যুগ-যুগ ধরে পুরুষ একটু একটু করে এতটা হয়েছে ; এখনও কিন্তু কতো বাকি !

এই দুটো বছর জীবনের পক্ষে এমন কিছু বেশি নয়, কিন্তু জীবন গড়ার পক্ষে বোধ হয় কমও নয় নিতান্ত। আমি সেই চেষ্টাই করব জাহ্নবী দেবী; আমি আপিল করলাম না, আমার নষ্ট করবার আর সময় নেই বলে। মনে করবেন আমি আপনার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করছি, তপস্যা করছি; আমার শেষ অনুরোধ আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবেন।"

সমাপ্ত